দত্তভিলায় এক আগন্তুক

অভ্র রায়

করুণা প্রকাশনী। কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি—১৯৫৯

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ শিল্পী
সুধীর মৈত্র

মুদ্রাকর
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রিণ্টার্স
১৩৮, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০ ০০৪

তুতুস
ও
পার্থকে

লেখকের অন্যান্য বই

হৃদয়ের শব্দ
চন্দ্রকিরণে এক আততায়ী
পেরিয়ার অরণ্যের যাত্রী
আর এক জীবনে
শ্যামখোল
গল্প সমগ্র (১ম)

১

একটু আগেই দত্তবাড়িতে একটা নাটক হয়ে গেল।

পুরনো আমলের বনেদি পরিবার। এককালে কলকাতার বিখ্যাত বিখ্যাত সব রইস আদমিদের পায়ের ধুলো পড়েছে এখানে। সায়েবসুবোরাও আসতেন। ধনে-মানে-বিলাসিতায় জমজমাট পরিবেশ তখন। দত্তভিলা বললে, এক ডাকে চিনত লোকে।

এখন দিনকাল পাল্টেছে। দত্তদের জমিজমা সম্পত্তির সামান্যই আর অবশিষ্ট আছে। দুর্গের মতো বিশাল ফটকওয়ালা সেই বাড়িটার তাক লাগাবার মতো জৌলুস আর নেই। ঘোড়াশালে ঘোড়া নেই, পায়রাদের বকম বকম বক বকম নেই। বাইজিদের নাচগান নেই। গভীর রাতে কর্তাবাবুদের ল্যান্ডো, ব্রুহাম ঝন ঝনিয়ে দরজায় এসে আর দাঁড়ায় না। এখন কোথায় কী! চোখের সামনে দেখতে দেখতে সব বদলে গেল।

ছোট কর্তাদের অংশটা তো ঝাঁঝরা হতে হতে প্রায় হানাবাড়ির চেহারা এখন। একমাত্র উত্তরাধিকারী সুধাকান্ত বহুদিন হল নিরুদ্দেশ। একটা পাগল এসে আশ্রয় নেয় মাঝে মাঝে। চুল দাড়িঅলা কিম্ভূত চেহারা, দেখলে ভয় করে দিনের বেলায়। অবশ্য কখনও কারও দিকে চোখ তুলে তাকায় না লোকটা। ঘরভরা ইঁদুর বাদুড় আর চামচিকেদের সঙ্গে রাতভর আপন মনে বকর বকর করে। থিয়েটারি সংলাপ শোনায়। ভোর হলেই আর সাড়া নেই। প্রেক্ষাগৃহ ফাঁকা ফেলে বুধু পাগলা তখন কোথায় চলে যায়। কেউ জানে না।

বড়কর্তার ছেলেরাই যা চেষ্টা করে ঠাঁটবাট কিছু বজায় রাখতে। পুরনো হয়ে গেলেও তাদের মহলটা টিকে আছে।

বাড়ির কর্তা পন্নগভূষণ দত্তের বয়েস সত্তর হল প্রায়। চোখের নজর কমে এসেছে। কিন্তু শিরদাঁড়া এখনো টান টান। চুনোট করা ধাক্কা পাড়ের ধুতি আর গিলে করা ফিনফিনে পাঞ্জাবি চাপিয়ে সাজগোজ করে ছড়ি হাতে যখন সোজা হয়ে হাঁটতে হাঁটতে বেড়াতে বেরোন, লোকে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দাঁড়ায়। চোখ তুলে তাকিয়ে দেখে দত্তভিলার মালিককে।

বড় ছেলে পরিক্ষিৎ দত্তও ডাকাবুকো বাবু একজন। পঁয়তাল্লিশে পা দিয়েও ভরা বয়েসের জোয়ান। সায়েবি মেজাজ, সায়েবি পোশাক। পুরনো আমলের মোটর হাঁকিয়ে সকাল বিকেল চারিদিকে সাড়া ফেলে হু হু করে বেরিয়ে যান।

কিন্তু এ সবই ওপর ওপর। একটু নজর করলেই বোঝা যায় ভিত আলগা হয়ে গেছে। ভিতরে সে তেজ আর নেই। মান মর্যাদা আর আভিজাত্যও যেতে বসেছে।

নীচের তলায় একটা অংশে ভাড়া বসে গেছে। দত্তবাড়িতে যা কখনও ভাবা যেত না। হাতি ঘোড়া ঢোকার সিংদরজা হাট করে খুলে থলে হাতে দোকান বাজার নিয়ে যখন তখন ঢুকে পড়ছে ন্যালা খ্যাপা. কিছু লোক। এ বাড়ির তুলনায় নিতান্ত বেমানান আর ছা-পোষা একটা সংসার। সভ্যতা ভব্যতারও বালাই নেই কোনও। সারাদিন যত রাজ্যের বেকার বাউণ্ডুলেদের আড্ডা। আর তাদের নিয়ে ছেলে মেয়ে বউ সবাই মিলে চলছে কেবল হা-হা, হি-হি।

আব্রু আড়াল বলেও কিছু মানে না। নকুলবাবুর বউ ছুটকি রাস্তার কলে বসেই দিব্যি চানটান করে। পরে এক বালতি জল নিয়ে ভিজে কাপড়ে ডাগর শরীরটা নাচাতে নাচাতে সবার চোখের সামনেই স্বচ্ছন্দে হেঁটে আসে। দত্তবাবুদের বাড়িতে এমন একটা ঘটনার কথা আগের দিনে কল্পনাও করা যেত না কখনও।

আধবুড়ো নকুলবাবু লোকটা আবার খ্যাপাটে। আড়ালে কেউ বলে খ্যাপা নকুল। কেউ, ষণ্ডা নকুল। ভদ্রলোক যখন তখন চিৎকার করে উঠছেন ওপরের দিকে তাকিয়ে। অকথা কুকথা যা মুখে আসে বলে যাচ্ছেন। শালা ভদ্দরলোক! সব ফাঁস করে দেব আমি। ভেবেছিস আমি কিছু জানি না? ডুবে ডুবে জল খাওয়া? আমিও ছাড়ব না···

অবশ্য এর একটা কারণও আছে নেপথ্যে। দত্তদের বড় আর মেজ ছেলে অর্থাৎ পরিক্ষিৎবাবু আর পুরন্দরবাবুকে একেবারেই সহ্য করতে পারছেন না ভদ্রলোক। এঁদের কলকাঠি নাড়ার জন্যেই নাকি পুরনো ফার্মের ভাল চাকরিটা খোয়াতে হয়েছে তাই পরিক্ষিৎ আর পুরন্দরবাবুকে একটা শিক্ষা না দেওয়া পর্যন্ত ভাড়াটে নকুল আচার্যের মনে শান্তি নেই।

এমনিতে দেখা যায় চুপচাপ ঘাড় নিচু করে ঘুরছেন ভদ্রলোক। অল্পবয়েসি বউয়ের কাছে কেঁচো হয়ে থাকেন প্রায়। কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। একটা কিছু হেস্তনেস্ত করে ফেলতে চান। সেটা না পেরে জানলা লক্ষ করেই আপাতত হুমকি ছাড়েন, শালা! আমিও দেখে নেব। দুটো দিন যেতে দাও···

চেহারাটা ষণ্ডা পালোয়ানের মতো, গলাটা মেয়েলি, বাসনা অবিলম্বে একটা খুনখারাপি কাণ্ড করে ফেলবার—কিন্তু সেটা পুরণ হচ্ছে না বলেই নকুলবাবুর এই হম্বিতম্বি আর নাচানাচি।

ভঙ্গিটা বেশ দর্শনীয়ও বটে। একবার তাকিয়ে ছুটকি নিজেই হাসি চাপতে পারে না। এ হেন অবস্থার মধ্যেও হি-হি করে ওঠে। ষণ্ডা স্বামী কটমট করে চোখ পাকালেও সামলাতে পারে না। করবেই বা কী মেয়েটা। বয়সেও যেমন অনেক ছোট তাঁর চেয়ে, স্বভাবটাও তেমনি ছলবলে।

ঘটনাটা ফাঁক ফোকর দিয়ে দত্তবাবুর বাড়ির মেয়েরাও না দেখে এমন নয়। দেখে চুপিচুপি মুখ টিপে হাসেও। রাগে শরীর রি রি করলেও ষণ্ডার নাচ দেখে হাসি এসে যায়। অবশ্য এক আধবার তাকিয়েই টান টান করে টেনে দেয় জানলার ভারী

পর্দাগুলো। আর গিন্নিমা সুবর্ণময়ীর সাড়া পেলে পাল্লাগুলো সবই বন্ধ করে দিতে হয় ঝটপট।

এক আধদিন অন্ধকার থেকে বুধু পাগলাও ধমক দিয়ে দিয়ে ওঠে তাঁর চেঁচামেচি শুনে,

—অ্যাই চোপ্। চোপ্ বলছি।

তাই নিয়ে কী ধুন্ধুমার কাণ্ড আবার। নকুলবাবুর মেয়েলি গলাটা আরও নাকি হয়ে ওঠে,

—এই পাগলা। একদম বাজে কথা বলবি না।

—পান্তুয়া খাবি, পান্তুয়া?

—খুন করে ফেলব শালা। পাগল সেজে পার পেয়ে যাবি ভেবেছিস।

—তুই পাগল, শালা। তোর বাপ পাগল।

—দেখবি তুই? দেখাচ্ছি—

একখণ্ড আধলা ইঁট ছুঁড়ে মারেন অন্ধকারে ভাঙা ঘরটা লক্ষ করে।

ছুটকি এসে তাড়াতাড়ি হাতটা চেপে ধরে, না না এটা কোরো না, এটা কোরো না গো।

বাধা পেয়ে বিক্রমটা যেন আরও বেড়ে ওঠে নকুলবাবুর,

—ছাড়ো, ও সব স্যায়না পাগল। দেব আমি ওকে একদিন শেষ করে। চালাকি করার জায়গা পায়নি?

—হাঃ-হাঃ-হাঃ! অন্ধকার ঘর থেকে অট্টহাসির শব্দ, গোলাম হোসেন। এযে পলাশির প্রান্তর।

—দাঁড়া শয়তান। জন্মের শোধ নাটক করা বার করব আমি তোর।

—এ তো বড় দুঃসংবাদ, দারা।

—তোর মুণ্ডু। লাশ ফেলে দেব একদিন।

—ধিক! ধিক তোরে পাষণ্ড! পামর!

—চোপরাও স্কাউণ্ড্রেল, ভ্যাগাবণ্ড, রাসকেল…

ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় পরিক্ষিৎ দত্তের। সবে একটা লার্জ পেগ নিয়ে বসেছিলেন। তুড়ি মেরে সিগারেটের ছাই ফেলে উঠে দাঁড়ান। মেজভাই পুরন্দরকে ডেকে পাঠান সরকার মশাইকে দিয়ে।

এমনিতে বেশ মেজাজি আর দিলদরিয়া মানুষ পরিক্ষিৎবাবু। কিন্তু ভালর ভাল, মন্দের যম। ভাই কাছে আসতেই দাঁতে দাঁত চেপে বলেন, কিক্ দ্যাট বাস্টার্ড আউট। অনেক সহ্য করেছি পুরো, আর নয়।

—ওসব ইতরদের কথায় কান দাও কেন তুমি?

—বাড়ির মধ্যে দিনের পর দিন, এই সব চলবে? বলিস কি!

পুরোবাবু সহসা ধৈর্য হারান না কোনও ব্যাপারে। এটাই স্বভাব। প্যাঁচ পয়জারও খুব ভাল খেলে মাথায়।

বললেন, ভেবো না, ব্যবস্থা একটা হচ্ছে শিগগিরি।

—দেখিস। মামলা মকদ্দমার মধ্যে জড়াস না আবার।

—খেপেছ নাকি!

ভাড়াটেদের অংশটা বাড়ির পশ্চিম দিকে। পিছনে দরজা খুললেই বাগান। ফলে ফুলে ভরে থাকত এক সময়। এখন অযত্নে অবহেলায় ঘন আগাছার জঙ্গলে ভরা। বাগানটা উত্তর দিকেও ছড়িয়ে আছে। ছোট কর্তা শৈলভূষণেরই গাছপালার শখ ছিল বেশি। বেছে বেছে নানা ধরনের দেশি বিদেশি দুর্লভ জাতের গাছ লাগাতেন তাঁর বাগানে। যত্নও ছিল খুব। বলতে গেলে বিপত্নীক শৈলভূষণ এক সময় তাঁর বাগান পরিচর্যা নিয়েই আর সব কিছু ভুলে থাকতেন। মনটাও ছিল দার্শনিক ধরনের। কবিতা পড়তে ভালবাসতেন মাইকেলের। গানেরও গলা ছিল।

কিন্তু এখন সব হিসেব ওলট পালট হয়ে গেছে। তাঁর শখের সাজানো বাগান পুরোটাই একটা জংলি চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। অতীতের একমাত্র সাক্ষী তাঁর যে ভাঙাচোরা মহলটা, তাকেও যেন গ্রাস করতে এগিয়ে আসছে এক আদিম জন্তুর মতো। রাত্তির বেলায় ওদিকে পা দিতেই গা ছম্‌ছম্‌ করে। একদল হনুমান এসে জুটেছে সম্প্রতি। অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ আসে ভিতর থেকে। একমাত্র বুধু পাগলারই হুঁশ নেই কোনও।

বাড়ির দক্ষিণ দিকের একতলায় কোনও লোক থাকে না। অনেকদিন ধরেই ফাঁকা। মেরামতও হয়নি বহুকাল। পুরোটাই এখন বন্ধ থাকে। পুরনো আমলের মরচে ধরা বিশাল বিশাল তালা ঝুলছে ঘরে ঘরে। তোশাখানা, বাতিঘর, জলসাঘর, আরও সব পাশাপাশি। গুম্‌ঘরও একটা ছিল হয়তো। যেমন থাকে এ সব পরিবারে। দেখলেই মনে হয় হয়তো সেকালের অনেক কিছু গোপন রহস্য জমে আছে এখানে। একবার খুললেই চিচিং ফাঁ-ক-এর মতো অদ্ভুত সব দৃশ্য বেরিয়ে পড়বে।

একদিন সরকার মশাইকে প্রকাণ্ড চাবি হাতে সিন্দুকের তালা খোলার মতো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটা ঘর খুলতে দেখেছিল ছুটকি। সঙ্গে সুবর্ণময়ী। সরকার মশাই ঝুঁকে পড়ে কট্‌ কট্‌ করে চাবি ঘোরাচ্ছেন। সুবর্ণময়ীর হাতে বড় এক চাবির গোছা। হলুদ রেশমি কাপড়ের কী একটা বাণ্ডিল।

থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছুটকি জুলজুলে চোখে নজর রাখছিল। ভীষণ কৌতূহল হচ্ছিল তার। দম বন্ধ হয়ে আসছিল যেন।

হঠাৎ ক্যাঁ-অ্যা-চ্‌-ক্যাঁ-অ্যা-চ্‌ করা ভুতুড়ে আর্তনাদ তুলতে তুলতে ফাঁক হয়ে যায় পাল্লা দুটো। সঙ্গে সঙ্গেই কী একটা উগ্র চিমসে গন্ধ বাতাসে। ভিতরে অন্ধকার। ছুটকি মুখ বাড়িয়ে দিল সামনে।

কিন্তু তাকে দেখতে পেয়েই সরকার মশাইকে নিয়ে তাড়াতাড়ি দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলেন সুবর্ণময়ী। ভিতরে কি আলো আছে? না অন্ধকার? তাও বোঝা যায় না বাইরে থেকে। ছুটকি খানিক এদিক ওদিক ঘুরঘুর করে সরে পড়ে।

বাড়িটার সামনের দিকে দাঁড়ালে অবশ্য একেবারে অন্য চেহারা। পুবমুখো টানা লম্বা সেকালের ঝুল বারান্দা। আব্রু রাখার জন্যে ওপরে দামি কাঠের জাফরি। তার ওপরে কার্নিশের গা ঘেঁসে সুদৃশ্য পাথরের মধ্যে ইংরেজি অক্ষরে খোদাই; দত্তভিলা। দুপাশ থেকে দুটো উড়ন্ত পরী ঘিরে আছে। পুরোটাই সেকেলে নকশা।

বারান্দা জুড়ে মোটা মোটা থামের মাথাগুলোতেও নানা ধরনের সুদৃশ্য কারুকাজ। রঙিন নকশা কাটা ঢালাই গ্রিলের রেলিং। এখনও বেশ সুন্দর আর সম্ভ্রমপূর্ণ চেহারা। বোঝাই যায় এই অংশটার যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা আছে।

নীচে দুপাশে ঘাসের লন। পর পর দুখানা গ্যারাজ। ঘোড়ার গাড়িও আছে একখানা। পুরনো আর অব্যবহার্য।

বিশাল ফটক দিয়ে ঢুকলেই বাঁ দিকে কর্তাদের পুরনো আমলের বৈঠকখানার ঘর। ডান দিকে ওপর মহলে উঠবার চওড়া আর প্রশস্ত সিঁড়ি।

বৈঠকখানা ঘরে এখনও সেকেলে চেহারাই বজায় আছে। ঘরজোড়া সেই বিরাট ফরাস পাতা। বিশেষ বিশেষ দিনে আলাদা জাজিম বার হয় তোশাখানা থেকে। ওপরে এখনও সেকালের দামি ঝাড়লণ্ঠন। দেয়ালে দেয়ালে দেয়ালগিরি। পুরনো আমলের স্মৃতিতে সবই যেন নিস্তব্ধ আর নিঝুম হয়ে আছে।

সচরাচর বন্ধই থাকে ঘরটা। কিন্তু আজ সকালে দেখা যাচ্ছে খোলা। ভিতরে বসে আছেন কালো চশমা পরা একজন মধ্যবয়েসি ভদ্রলোক। নাম মথুরামোহন বর্ধন। অন্ধ। পেশায় সঙ্গীত শিক্ষক। সঙ্গে তাঁর তবলচি এবং চলাফেরায় সাহায্যকারী প্রৌঢ় নিকুঞ্জবাবু। দুজনে পাশাপাশি চুপচাপ বসে আছেন। মথুরাবাবুর মুখটা হাসি হাসি। কিন্তু কেউ কোনও কথা বলছেন না।

অপেক্ষা করছেন পরবর্তী নির্দেশের জন্যে।

বাইরে থেকে কে যেন একজন উঁকি দিলেন ভিতরে। একবার চোখ বুলিয়েই সরে গেলেন নিঃশব্দে। ওপরেই উঠে গেলেন নিশ্চয়। দুদিকের ঘটনাটা ঠিক মতো মিলিয়ে নেবার জন্যে। এটাই ওঁর স্বভাব।

ইনিই হচ্ছেন এ বাড়ির বিখ্যাত সরকার মশাই। পুরনো আমলের বিশ্বস্ত লোক। হিসেবপত্তর রাখা, ইংরেজি-বাংলায় চিঠিপত্র লেখা, কর্তাদের এটা ওটা হুকুম তামিল করা—সব কিছুতেই সিদ্ধহস্ত। ছায়ার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন মহলের সর্বত্র। দত্তবাড়ির সব কিছুই প্রায় তাঁর নখদর্পণে।

বৈঠকখানায় একটা পিয়ানো এনেও রাখা হয়েছে। সদ্য আনা আজ সকালে। কালো চকচকে বার্নিশ। মথুরাবাবুর সঙ্গেই আমদানি। আপাতত তাঁর সামনেই দেয়াল ঘেঁসে বসানো। তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। এটিও তাঁর মতো ওপরে উঠবার অপেক্ষায়।

অবশ্য সবই নির্ভর করছে সুখেন্দুবাবুর ওপর। আজকের নাটকের সবচেয়ে প্রধান চরিত্র যিনি।

পুরো নাম সুখেন্দুশেখর বসু। খিদিরপুরের নামজাদা ধনী ব্যবসায়ী। তিন পুরুষ ধরে জাহাজ কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসায় অগাধ সম্পত্তির মালিক। নিজের চেষ্টায় সেটাকে আরও বহুমুখী করে তুলেছেন।

বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি। কলপ লাগানো চুলের মাঝখানে সিঁথিকাটা। পরিষ্কার করে কামানো গৌরবর্ণ, প্রায় লালচে মুখমণ্ডল। প্রথম দর্শনেই মনে হবে ভদ্রলোক অত্যন্ত শৌখিন বিলাসী। চালচলনে পোশাকে-আশাকে পুরো উনিশ শতকি বাবু।

এবং ব্যাপারটাও ঠিক তাই। ভোগ বিলাসিতায় বা টাকা ওড়ানোয় এখনও তিনি সেই বাবুদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে থাকেন।

দত্তবাড়ির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা অনেকদিনের। বলতে গেলে এখন তিনি এই পরিবারেরই একজন। বিপদে আপদে সব সময় পাশে আছেন। আগে ছিলেন শুধু পরীক্ষিৎবাবুর ক্লাবের, রেসের মাঠের, সুখেন্দুদা। এখন তিনি সবার সুখেন্দুদা এ-বাড়ির। তাঁকে না হলে আর চলে না। বিশেষত কোনও জটিল সমস্যা দেখা দিলে বাড়িতে। যেমন আজকের ঘটনাটা।

সমস্যাটা হল কর্তাবাবুর ছোট মেয়ে পল্লবীকে নিয়ে। শিক্ষিতা সুন্দরী এবং বড় কোমল স্বভাবের একটি মেয়ে। টানা টানা গভীর চোখ দুটোর দিকে তাকালেই সেটা বোঝা যায়। যে কোনও ছেলের বুক গুরগুর করে উঠবে হঠাৎ। বয়েস তেইশ থেকে ছাব্বিশ-সাতাশের মধ্যে।

সম্প্রতি সে একটা অ্যাফেয়ারে জড়িয়ে পড়েছে। তার গান শেখানোর মাস্টার-মশাইয়ের সঙ্গে। দুজনে মিলে রেজিস্ট্রি করবে বলেও ঠিকঠাক। দুজনেই অ্যাডাল্ট। ইয়াং—এটা হতেই পারে। কিন্তু দত্তবাড়ির পক্ষে এ এক মহা কেলেঙ্কারির ব্যাপার। একেবারেই অসম্ভব।

খুন চেপে গেছে কর্তাবাবুদের মাথায়। পারলে এখনই গলা টিপে মারেন ছেলেটাকে।

ছেলেটি দেখতে শুনতে অবশ্য মন্দ নয়। লেখাপড়া বেশিদূর করতে পারেনি। কিন্তু খুবই বলিষ্ঠ আর স্বাস্থ্যবান এক যুবক। নাম রাজেশ ঠাকুর। ইউ পির লোক হলেও তিন পুরুষ ধরে কলকাতায় থেকে এখন বাঙালিই হয়ে গেছে। গানের স্কুল

চালায় একটা সুরেন ব্যানার্জি রোডে। ইচ্ছে, একদিন সিনেমায় প্লে ব্যাক করবে।

কিন্তু দত্তবাড়ির পক্ষে এমন একটা বংশ মর্যাদাহীন, অশিক্ষিত, আধা বাঙালি ছেলেকে মেনে নেওয়া কল্পনাই করা যায় না।

পরিক্ষিৎবাবু মাথা গরম করে একেবারে বন্দুকটাই বার করতে চান, বামন হয়ে চাঁদে হাত? ব্লাডি ফুল, ও ভেবেছেটা কি? আয়াল শুট হিম।

—ধীরে ক্ষিতি, ধীরে। সুখেন্দুবাবু পিঠে হাত রাখেন। মাথা গরমে কোনও লাভ হবে না এখন। বরং তাতে আরও বিপদ—।

পুরোবাবু হান্টার দেখিয়ে বলেন, আমার হাতে ছেড়ে দিন সুখেন্দুদা। বিশ মিনিটে শুইয়ে দেব আমি।

—পাগল হয়েছে তোমরা? লাবির কথাটা একবার ভাবছ না? তাকে কী বোঝাবে তোমরা?

মুশকিল হয়েছে, রাজেশকে সুখেন্দুবাবুই ঠিক করে দিয়েছিলেন। আধা বাঙালি ছেলেটা যে শেষে এতদূর এগিয়ে যাবে, ভাবতে পারেননি। কিন্তু ওকে ঢিট করাটা এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। আসল সমস্যা হল পল্লবীকে নিয়ে। এখন এমন একটা কিছু করা দরকার, যাতে সাপও মরে, লাঠিও ভাঙে না। তাই নিয়েই ভাবনা।

সবার আগে পল্লবীর মনটাকে আস্তে আস্তে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে। এই তো প্রথম নয়। লাবির তো এর আগেও একটা ঘটনা ঘটে গেছে। ব্যাপারটা সামলাতে সেবারও অনেক কাণ্ড করতে হয়েছিল। তবে? কত কান্নাকাটি তাই নিয়ে। আসলে বয়েস হলেও লাবির মনটা যে বড় নরম। কোনও ব্যাপারেই কঠিন হতে জানে না। বেচারি।

পল্লবীর জন্যেই নতুন পিয়ানোটা নিয়ে এসেছেন সুখেন্দু। তার জন্মদিনের আগাম উপহার। লা মার্টস-এর একজন মিসকেও ঠিক করেছেন। সপ্তাহে দুদিন এসে বাজনা শিখিয়ে যাবে।

আর লাবির জন্যে আজ তাঁর দ্বিতীয় উপহার মথুরামোহনবাবু। অনেক ভেবে চিন্তেই তাঁকে জোগাড় করে এনেছেন। ভদ্রলোক চোখে দেখতে পান না। কিন্তু খুবই সুনাম তাঁর গায়ক এবং শিক্ষক হিসেবে।

পিয়ানোটাই প্রথম ওঠানো হল ওপরে ধরাধরি করে।

পরিক্ষিৎবাবুর স্ত্রী মৌলি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, ওঃ সুখেন্দুদা, দা—দারুণ! আমিও শিখব কিন্তু এবার।

—নিশ্চয়ই! শিখবে বই কি? আমি একজন মিস ঠিক করেছি।

পল্লবী মুখ নামিয়ে থাকে। চোখ দুটো ছলছলে।

—লাবি! তোমার পছন্দ তো? নরম সুরে বলেন সুখেন্দু।

—হ্যাঁ বাবা, খুব পছন্দ হয়েছে, এমন একটা সুন্দর জিনিস। সুবর্ণময়ী উত্তর দিলেন।

সুখেন্দু হাসলেন, মাসিমা, একজন নতুন মাস্টারমশাইকেও এনেছি লাবির জন্যে। একবার গান শুনুন। চমৎকার গলা। আর তেমনি ওস্তাদ লোক এই লাইনের।

একটু পরেই গানের আসর বসে গেল। ধরে ধরে তোলা হল মথুরবাবুকে। হারমোনিয়াম দেওয়া হল সামনে। পাকা হাতে তবলা বাগিয়ে ধরেছেন নিকুঞ্জবাবু। শ্রোতারা সবাই প্রস্তুত।

হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে গান ধরলেন মথুরাবাবু। কী অপূর্ব সুরেলা গলা! এতটা যেন আশাই করেনি কেউ;

মুরলী কাঁদে রাধে রাধে বলে
শ্যাম সুন্দর হায় ভাসে নয়নের জলে···

মুহূর্তে যেন পরিবেশ পাল্টে যায়। মন্ত্রমুগ্ধের মতো পন্নগভূষণ দুলছেন তালে তালে। অতুলপ্রসাদী। আশাবরীর সঙ্গে ভৈরবীর মিশ্রণে কী অপূর্ব রাগভঙ্গিমা। অনেকদিন পরে এস্রাজটা টেনে নিতে ইচ্ছে করছে আজ।

পল্লবীর ভিতরটা যেন মুচড়ে ওঠে সুরের ঝঙ্কারে। আজকের এই মুহূর্তে এমন একটা গান! চোখের জল যেন আর বাধা মানে না তাঁর।

ওপর তলায় যখন সুরের প্রবাহ, নীচের তলায় তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পরিবেশ।

বন্ধ চাপা ঘরে রাজেশ গোঁজ হয়ে বসে আছে।

ক্ষিতিবাবু টাকার বাণ্ডিলটা ফেলে বললেন, এক মাসের টাকা বেশি দিচ্ছি, নিয়ে চলে যাও। আর কখনও আসবে না এদিকে।

—কেন আসব না, ওসুবিধা কী আছে।

—সেকথা তোমাকে বলতে বাধ্য নই আমি।

—তাহলে আপনার সিস্টারকে ডাকুন, তার সঙ্গে কথা বলব।

—শাট আপ! ইউ ইডিয়েট।

—উসব ভয় দেখাবেন না। আমি ভালবাসি পল্লবীকে। তাকে আমি—।

—জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলব শুয়ার, আর একটা কথা যদি বলেছিস।

তড়াক করে হাত বাড়িয়ে চাবুকটা টেনে নেন পরিক্ষিৎ। পুরন্দর তাঁকে সামলান, না-না, ওসব কোরো না।

ছোকরা বুক ফুলিয়ে কটমট করে সবার দিকে তাকায়। রাগে গর গর করে কাঁপছে যেন। টাকার বাণ্ডিলটা ছুঁড়ে দিয়ে বলল, আমিও দেখে নিব। একটা

দুটো মার্ডার করতে রাজেশ ঠাকুর ভয় পায় না। এই লাস্ট ওয়ার্নিং দিয়ে যাচ্ছি আমি।

বলেই ক্ষিতিবাবুকে ধাক্কা দিয়ে এক লাফে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। পরক্ষণেই শোনা গেল তার বাইকের শব্দ। হিংস্র গর্জনে পাড়া কাঁপিয়ে ছুটে যাচ্ছে।

ওদিকে মথুরাবাবু তখন আশাবরী ছেড়ে গৌড়মল্লারে পৌঁছেছেন; ডাকে কোয়েলা বারে বারে···

অপূর্ব কাজ গলায় ভদ্রলোকের। কিন্তু নীচের তলায় সেদিকে কারও কান নেই আপাতত।

ক্ষিতিবাবু বললেন, ছেলেটা আবার সুরেন ব্যানার্জি রোডের মাস্তান।

পুরোবাবু বললেন, কটা দিন এখন একটু সাবধানেই থাকা উচিত। লাবির দিকেও নজর রাখতে হবে। একদম বাড়ির বাইরে যেতে দেওয়া যাবে না।

সুখেন্দু মাথা নাড়লেন, ঠিকই। সমস্যাটা যে বড় ইমোশানাল, হঠাৎ একটা কিছু করে ফেলা অসম্ভবও নয়।

সত্যিই কি হতে পারে তেমন কিছু? চাপা উদ্বেগ আর আশঙ্কা নিয়ে বন্ধ ঘরে চুপচাপ বসে আছেন তিনজন।

বাইরে তখন আকুল সুরে গানের কথাগুলো আছড়ে পড়ছে মথুরাবাবুর: এসো বঁধুয়া নিকুঞ্জদুয়ারে······

কিন্তু সেদিকে কারও কোনও হুঁশ নেই। অন্য একটি কথাই কানের মধ্যে ঘুরছে এখন; একটা দুটো মার্ডার করতে রাজেশ ঠাকুর কোনও ভয় খায় না···এই লাস্ট ওয়ার্নিং···

২

জুঁই স্কুলে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল। সে ক্লাশ টেন-এ উঠল এবার।

মৌলি বললেন, জুঁই আজ কিন্তু একা যাবে না। সরকার মশাইকে সঙ্গে নিয়ে যাবে।

সুন্দর ফুলের মতো নাকটা জুঁই মৃদু কুঁচকোয় একবার, কেন মা, সরকার মশাইকে কেন?

—বাবু বলে গেছেন। এখন থেকে কয়েকটা দিন কোথাও আর একলা বেরোনো চলবে না। সরকার মশাই থাকবেন।

—বাবা তাই বলেছে! ও গড! আমাদের যে শনিবার অ্যানুয়াল ফাংশান। ফিরতে রাত্তির হবে।

—তাহলে তো আরও দরকার। সরকার মশাই গিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন।

—ও মা। তুমি না ইম্পসিবল! কিছুই বোঝ না। সবাই টিজ করবে না আমায়?

—করলেই হল? তুমি জান না, বাড়িতে একটা কী কাণ্ড হয়ে গেল! সবাই কত ভাবছে। ছেলেটা ভীষণ পাজি। আবার থ্রেট্ করে গেছে বাবুদের।

এতক্ষণে জুঁই ধরতে পারে ব্যাপারটা। সে তো এ সব অনেকদিন আগে থেকেই জানে। মা বোঝে না। সে এখন বড় হয়ে গেছে।

অবাক চোখে মায়ের দিকে তাকিয়ে রইল একটু। তারপর বলল, পাজি বলছ কেন মা? তোমরা মেনে নিতে পারছ না সেটা আলাদা ব্যাপার। তাই বলে—

—আঃ জুঁই—! বলেছি না বড়দের ব্যাপারে একদম পাকা কথা বলবে না! আমি যা বলছি তাই শোনো এখন—।

—শুনব মাম্মি! কিন্তু সরকার মশাইকে নয়, প্লিজ! রামদয়াল তো থাকছেই গাড়িতে। আবার আর একজন কেন?

—কেন সরকার মশাই থাকলে ক্ষতি কী তোমার?

—এমন শেয়াল পণ্ডিতের মতো তাকিয়ে থাকে না, সরকার দাদু, আমার অস্বস্তি হয়। হিয়াও বলছিল একদিন, হুজ দ্যাট স্লাই ফক্স, জুঁই?

—ছিঃ ছিঃ! খুব অসভ্য হয়েছ তো। গুরুজনদের সম্বন্ধে এ রকম কথা বলে কখনো? বাবু শুনলে ভীষণ রাগ করবেন।

—সরি মাম্, সরি। জিভ কেটে দুই কান ধরে নিজের, আর হবে না।

মৌলি মৃদু হাসেন মেয়ের দিকে তাকিয়ে। সুন্দর ঝকঝকে দাঁতের ঝিলিক এক সারি। সঙ্গে হিরের নাকছাবিও যেন ঝলমল করে। বলেন, তুই এখন বড় হয়েছিস না?

—কই আর হতে দিচ্ছ তোমরা? জুঁই ভ্রুভঙ্গি করে। তারপর আবদার করে বলে, তুমিই চলো তাহলে আজ—। কতদিন তুমি যাওনি আমার সঙ্গে। সেই গত ফাইন্যাল পরীক্ষার সময় লাস্ট গিয়েছিলে, মনে আছে?

—আমি! একটু আমতা আমতা করেন মৌলি, আমি এখন কী করে যাব?

—ওহ্ হো! হঠাৎ হেসে ফেলল জুঁই, তোমাকেও তো কিডন্যাপ করতে পারে, তাই না?

—দারুণ ফাজিল হয়েছিস তো! মারব টেনে এক চড়।

মুখটা ফুলিয়ে মেয়ের ওপর রাগতে গিয়েও পুরো রাগতে পারেন না মৌলি। ফরসা মুখে আরক্ত ভাব ফোটে একটা।

—ও মাম্ ডিয়ার! রাগলে কী সুইট লাগে না তোমাকে।

হঠাৎ মাকে জড়িয়ে ধরে সে। আদর করে দু গালে চুমু খায়। একবার নয়, পর পর দুবার একেবারে সেই ছেলেবেলার মতো।

মাকে দেখতে এখনও কী ভীষণ ভাল! তার জন্যে মনে মনে গর্ব জুঁইয়ের। রূপ দেখেই নাকি দাদু তার মাকে নিতান্ত মধ্যবিত্ত ঘর থেকে বউ করে নিয়ে এসেছিলেন। শক্ত হাতে সে জড়িয়েই থাকে মাকে।

মৌলি রীতিমতো নাজেহাল এবার। রাগী মুখেও উপভোগ করেন মেয়ের আদরটা।

তারপর হাত ছাড়িয়ে বললেন, যাও চুলটা ঠিক করে নাও। আমি সরকার মশাইকে বলছি।

ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল জুঁই। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আবার নিজেকে দেখে। এপাশ ওপাশ ঘুরে, পিছন ফিরে, ঘাড় বেঁকিয়ে নানা রকম ভাবে দেখে। তবু আশ মেটে না। পনেরো বছরের শরীরে যৌবন তার সমস্ত উপহার দিয়ে যেন ভরে তুলছে তাকে। সে যেন নিজেই পাল্টে যাচ্ছে নিজের কাছে। নতুন মনে হয়। আজকাল প্রায়ই এমনি দেখতে ইচ্ছে করে নিজেকে। ভাল লাগে। কখনও কখনও আবার ভীষণ মন খারাপ লাগে। কেন, জানে না। বুঝতেও পাবে না।

শাড়িটা টেনে নেবার আগে, আর একবার ঘড়ির দিকে দেখল জুঁই। অনেক ফাস্ট যাচ্ছে দেয়াল ঘড়িটা। তার ঘড়ির থেকে প্রায় দশ মিনিট। খুব হালকা করে লিপস্টিকটা বুলিয়ে নিল ঠোঁটে। মুখটা ভিতরে টেনে ঠোঁটে ঠোঁট বুলিয়ে সমান করে মাখিয়ে নিল গোলাপি রংটা। নীচে বিভাসবাবু হেঁড়ে গলায় গান ধরেছেন—হায়, কী যে করি মন নিয়া···। অসহ্য!

শেষবারের মতো আর একবার চটপট পাউডারের পাফটা বোলাল জুঁই। গলায়, ঘাড়ে, ব্লাউজের ওপরে খোলা জায়গায়, স্তন সন্ধিতে। ঠিক তার পরই জামার নীচে মাথা উঁচু করে চুড়ো বেঁধে উন্মত্ত হয়ে উঠছে তার নতুন ব্যক্তিত্ব। নিজেরই চোখ দুটোই একবার আটকে যায় সহসা। শরীর জোড়া শিরশিরে অনুভূতি। আর লজ্জা!

তার এই গোপনীয় নতুন ব্যক্তিত্বই যেন আগে চোখ টানে সবার। সে ঠিক বুঝতে পারে। হয়তো কোথাও এক অদৃশ্য অ্যান্টেনা আছে তার। অনেক ভিড়ের মধ্যে দূরে দাঁড়িয়েও গোপনে কেউ এদিকে নজর করলে, ঠিক তার কাছে খবর পৌঁছে যায়। চটপট সামলে নিতে পারে নিজেকে। আশ্চর্য। বয়েস হয়েছে যাঁদের তাঁরাও কেন বাদ যান না!

এই তো সুখেন্দু জেঠুকেই তো দেখেছে কতবার। কেমন অদ্ভুত চাপা নজর এদিকে।···

—জুঁই, জুঁই তোর হল? বাইরে মা'র গলা।

—যাই মা। আর একটু—চমক ভেঙে নিজেকে সামলায় জুঁই।

তাড়াতাড়ি জামা কাপড় ঠিকঠাক করে, বইখাতা গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে।

সরকার মশাই আগে থেকেই একটা গলাবন্ধ কোট পরে দাঁড়িয়ে আছেন বারান্দায়। কোনও ভাবান্তর নেই চোখে মুখে। হাতে আবার একটা বেতের মোটা লাঠি। ঝাঁটার মতো গোঁফ জোড়া ঝুলে পড়েছে।

দেখে হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারে না জুঁই। শুধু একবার মৃদু নাক কুঁচকোয়।

তারপর মার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, বাই মাম্—

—খুব সাবধানে থাকবে কিন্তু—।

জুঁই উত্তর দিল না। ততক্ষণে দুরন্ত হরিণীর মতো তর তর করে লাফিয়ে নামতে নামতে নীচে পোঁছে গেছে সে।

ড্রাইভার রামদয়াল গাড়ি বার করে অপেক্ষা করছিল। দুজনে উঠতেই বেরিয়ে গেল পরক্ষণে।

সুখেন্দু ফোন করছিলেন ক্লাবে।

—হ্যালো সুরেশ, বোস স্পিকিং।

—ফরমাইয়ে হুজুর। ক্যা সেবা কর সকতা হুঁ ম্যায়?

—শোনো, যে গানের ছেলেটিকে দিয়েছিলে না? ওই যে রাজেশ—রাজেশ ঠাকুর?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—

—তার হয়ার অ্যাবউটস-এর ডিটেলস কিছু জান?

—মতলব?

—মানে কী করে, কোথায় যায়, স্বভাব-টবাব কেমন? কোনও ব্যাড এলিমেণ্টের সঙ্গে যোগাযোগ আছে কি না? এই সব আর কী।

—কিঁউ বোস সাব, এনি থিং রং? কোই গড়বড় তো নেহি কিয়া আপকা সাথ?

—না, তেমন কিছু নয়। তবে হয়েছে একটা ব্যাপার। দ্যাট আইল টেল য়ু লেটার, টেলিফোনে নয়।

—ও কে স্যার। আমি একটু কথা বলে দেখব, আমার সঙ্গে দেখা হতে পারে এই সপ্তাহে।

—নোও নেভার। এসব কথা কিছু একদম বলবে না। তুমি খালি ওর চাল চলনের ব্যাপারটা যা জান, তাই বলো আমাকে।

—আই সী! কিন্তু খুব একটা খবর তো আমি দিতে পারব না আপনাকে। ঘোড়া হলে বলতে পারতাম। তবে জানি, জলসায় গানটান করে, আমাদের ক্লাবের

ফাংশানেও গেয়েছে দু তিন বার। অফিস-ফাংশানেও কল পায়—ওর নাম আছে। চ্যাটার্জিবাবুই ওঁদের অফিস থেকে পিক আপ করে এনেছিলেন প্রথম।

—চ্যাটার্জিবাবু?

—হাঁ হাঁ, জে কে। তখনই আমার সঙ্গে চেনা পরিচয়।

—তুমি আগে একদম চিনতে না ওকে?

—নেহি সাব, কসম্‌সে।

—ও···। একটু ভাবলেন সুখেন্দু। পরে বললেন, আচ্ছা ওর সঙ্গে যে লোকগুলো থাকে, তারা কারা?

—পুরা তো মালুম নেহি। ব্যস্‌—ওর মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টস্‌-এর সঙ্গী সাথী। দোকান একটা যে আছে, তার কর্মচারী, চাচেরা ভাই একজন। চিৎপুর না বড়বাজারে কোথায় ওর এক চাচার একটা দোকানও আছে শুনেছি।

—লোকগুলো সব কেমন? তুমি দেখেছ তো কয়েকজনকে।

—একটা দুটো ব্যাড এলিমেন্ট আছে। এস এন ব্যানার্জি রোডে ব্যবসা করে, এ সব লাইনের যা দস্তুর। চাঁদনি মার্কেটের মাস্তান নবাব! ওর খুব পেয়ারের লোক শুনেছি।

—নবাব, নবাব? নামটা যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

—চিনবেন না কেন, ওয়াটগঞ্জেও তো ওর অ্যাকটিভিটি আছে। ধরা পড়েও ছাড়া পেয়ে যায়। পুলিশের সঙ্গে ভাল লাইন ওদের।

—আর সব যারা আছে?

—হ্যাঁ, ওই শিশির তাগড়া যে ছেলেটা, ওই যে ছেলেটা, ওই যে পাশে বসে ঝিঁক ঝাঁই ঝিঁক ঝাঁই করে কী যেন বাজায়—ম্যারাকাস। ও নাকি মার্ডার কেসের আসামি একজন। মুখ দেখলে কিন্তু মনে হয় না। পিপে পিপে মাল টানতে পারে জায়গায় বসে। ভুট্টা বলে ওর একজন সাকরেদও আছে। সেও নাকি কম যায় না।

—আই সী! নিশ্বাস পড়ে সুখেন্দুর।

—লেকিন, বাত কেয়া হ্যায়, বোস সাহাব? আপ্‌ কুছ পরেসান্‌ মালুম হোতা হ্যায়।

—নোও নো শাস্ত্রীজি। ন্যাথিং সো সিরিয়াস।

—তো এক কাজ করুন স্যার, কাল চলে আসুন ক্লাবে। সামনে বসে মনের কথা সব ফ্রিলি ডিসকাস্‌ করা যাবে।

—কাল? না হচ্ছে না, সুরেশ। অন্য প্রোগ্রাম আছে—।

—চলে আসুন না স্যার, একটু সময় করে। এখানেও একটা দারুণ প্রোগ্রাম কাল—এ রিয়েল সারপ্রাইজ!

—কেন হঠাৎ কী ব্যাপার?

—আলিপুরের নীনা মাথুর পার্টি দিচ্ছেন। নাচগান, ভ্যারাইটি প্রোগ্রাম, মুসায়েরা, অ্যান্ড অফকোর্স ড্রিংকস্। শী উইল পে ফর অল দা ড্রিংকস্।

—বা চমৎকার! হঠাৎ নীনা মাথুর এত দরাজ কেন? লটারি পেয়েছে নাকি?

সুরেশ শাস্ত্রী হাসল একটু শব্দ করে, প্রায় তাই স্যার। কেনেল ক্লাবের অ্যানুয়াল শো-তে না ওঁর ডগ নাকি প্রাইজ পেয়েছে। তাছাড়া ওঁর নিজের থার্টি সেভেনথ্ বার্থ ডে পড়ল না, এই শনিবার—সব মিলিয়ে একটা কম্বাইনড্ ইভেণ্ট।

—মাই গুডনেস্! শাস্ত্রী তোমরা পারোও বটে! একই সঙ্গে দ্য লেডি অ্যাণ্ড হার ডগ! ওয়াণ্ডারফুল! তো কাকে আগে উইশ করবে তোমরা?

শাস্ত্রী আবার হাসে খুক খুক করে, স্যার এটিকেট্ তো বলে লাভ দ্য ডগ ফাস্ট, দেন দ্য লেডি, হা-হা। আপনি আসছেন তো?

—না সুরেশ সরি। তাছাড়া তোমরা তো আমাকে ইনভিটেশানও পাঠাওনি।

—না, বোস সাব। ওটা কাউকেই পাঠানো হয়নি। আসলে এটা সারপ্রাইজ প্রোগ্রাম থ্রো করা হচ্ছে। যারা এসে পড়বে দে উইল জয়েন। কার্ড পাঠালে গ্যাদারিং ম্যানেজ করা যেত না স্যার, আমিই বলেছি।

—ও কে সুরেশ। দেন এনজয় ইয়োর প্রোগ্রাম। আমি পরে শুনব রিপোর্ট।

—কিন্তু স্যার, ও আসতেও পারে কাল—রাজেশ। নীনাজি গান গাইবার জন্যে হয়তো ওকেও খবর পাঠিয়েছেন। আপনি থাকলে সামনাসামনি একট ফয়সালা হয়ে যেত।

—নো সুরেশ, দ্যাট উইল বি এ ব্লাণ্ডার। কোনও মতেই আমি পিকচারে আসতে চাইছি না। তুমি আমার হয়ে একটু কাজ করো। ব্যাপারটা খুবই জরুরি। আশা করি আমার অনুরোধটা রাখবে তুমি।

—কী বলছেন বোস সাহাব, বান্দাকে হুকুম করুন। কাজটা কী?

—প্রথমে খেয়াল রাখবে কে কে আছে ওর সঙ্গে? তাদের সব হাবভাব—মুভমেণ্ট। হেভি ড্রিংক করাবে সবাইকে, নীনা মাথুরের স্টক না থাকলে, আমার অ্যাকাউণ্টে। অ্যাট এনি কস্ট মেক দেম ড্রাংক। তারপর মেজাজ বুঝে চেষ্টা করবে, কার পেট থেকে কতটা কথা বার করা যায়। রাইট? ওকে যে কাজটা ঠিক করে দিয়েছিলাম, সেটা আর নেই। তাড়িয়ে দিয়েছে অপমান করে। কিন্তু একটা কথা, দিস ইজ এ টপ সিক্রেট। তুমি আর আমি ছাড়া কেউ জানবে না।

—উরে বাপ্‌স। এতো পুরো গোয়েন্দার কাজ স্যার। আমাকে জাসুস হতে বলছেন?

—একজ্যাক্টলি! কেন, কাজটা পারবে না সুরেশ। ভয় পাচ্ছ নাকি?

—কী বলছেন, বোস সাব। সুরেশকে কোনও কাজে ভয় খেতে দেখেছেন কখনও?'

—সেইজন্যেই তো বলছি। অ্যান্ড ইউ উইল্ গেট ইয়োর রিওয়ার্ড।

রাইট স্যার। পার্টি এলে কাজটা হয়ে যাবে। সুরেশকে খালি একটু মনে রাখবেন।

—অফ কোর্স। থ্যাঙ্ক য়ু সুরেশ।

ফোন রেখে দিলেন সুখেন্দু।

পুরন্দর অফিস থেকে বেলাবেলিই বেরিয়ে পড়লেন। আজ দুদিন ধরেই এমন চলছে।

মাথায় অনেক চিন্তা এখন। কেবলি ঘুরপাক খাচ্ছে। ধর্মতলায় যাবার দরকার ছিল একবার। লাহা কোম্পানির একটা বড় অর্ডার আসার কথা। একবার ফোনও করেছিলেন। কেউ ধরল না। কাল দেখা যাবে। একবার যেতেও হবে ওদিকে। না, এখন আর এসব ভেবে লাভ নেই। কাল যা হবার হবে। এখন আগে সন্ধের মধ্যে বাড়ি ফেরা দরকার। আর দেরি করা ঠিক নয়।

অবশ্য এতটা ভয় পাবারও কোনও কারণ নেই। বিশেষত তাঁর মতো একজন ডাকাবুকো জোয়ান লোকের পক্ষে। কী এমন মুরোদ আছে ছোকরার! কোথাকার একটা ভ্যাগাবণ্ড। মুখেই যতো বারফাট্টাই!

তবু সাবধানের কোনও মার নেই। অন্তত কয়েকটা দিন তো কাটিয়ে দেওয়া যাক। তারপর আপনিই সব ঠিক হয়ে যাবে। ভাবতে ভাবতে পুরোবাবু ট্যাক্সির মধ্যে বসে এপাশ ওপাশ করতে থাকেন।

ট্যাক্সিটা শেষপর্যন্ত বাড়ির দরজায়ই নামাল তাঁকে। নেমেই দেখেন সামনে বড়কর্তা পন্নগভূষণ। আজও যথারীতি বেড়াতে বেরোচ্ছেন। সঙ্গে চাকর শ্রীমন্ত। একটা চাদর জড়িয়ে কর্তার পিছনে কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে।

কর্তার সাজগোজেরও কোনও কমতি নেই। একেবারে জমকালো পোশাকে ফিট বাবুটি হয়ে বেরিয়েছেন। রুপোর বাঁটঅলা ছড়ির ওপর তাঁর ফরসা হাতের আঙুলে বার্মিজ চুনির আঙটিটা ঝকমক করে জ্বলছে।

পুরন্দর বললেন, এ কি, বাবা। এখন কোথায় বেরুচ্ছ?

—কেন, রোজ যেখানে যাই। বেড়াতে—।

—না বাবা, এখন আর নাই বেরুলে।

—কেন, আমি বেরুব না কেন? শ্রীমন্তও যাচ্ছে সঙ্গে—

—আহা। বুঝছ না কেন বাবা। একটা গুণ্ডা ছেলে বাড়িতে দাঁড়িয়ে অমন মুখের ওপর থেটে করে গেল। কয়েকটা দিন নাই বা গেলে বেড়াতে সন্ধেবেলায়। ছাতের ওপরই একটু ঘোরো না কেন?

কর্তা চোখ তুলে তাকান একবার ছেলের দিকে। তারপর তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে

একটা শব্দ করে বলেন, হুস্‌। হাতি ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল। কোথাকার একটা লোফার ছোকরা, তার ভয়ে ঘরে বসে থাকব ? চল্‌ শ্রীমন্ত— ।

বলেই হাতের ছড়িটা একবার ঘুরিয়ে সটান হাঁটতে লাগলেন কর্তাবাবু। পুরোবাবু চুপচাপ একটু দাঁড়িয়ে থাকেন সেদিকে তাকিয়ে।

পার্কের মধ্যে অবশ্য লোকজন বেড়ায় এখন। কিন্তু সন্ধের পরই নির্জন হয়ে আসে। তাছাড়া পাশেই বিরাট জলা মাঠ। ঝিল বুজিয়ে এখন ভরাট হচ্ছে মাটি ফেলে। কোথাও আলো নেই। সন্ধের পর পুরো ফাঁকা। কেউ মাড়াতে চায় না ওদিকে। যত নেশাভাঙ করা ক্রিমিন্যালদের আড্ডা। কি করবেন পুরন্দর ? নাহ্‌ বাবাকে এ ভাবে ছেড়ে দেওয়াটা রিস্কি হচ্ছে।

অগত্যা পিছন পিছন তিনি অনুসরণ করেন কর্তাবাবুকে। পাড়ার মধ্যেই তো প্রায়। একটু পায়চারি করা যাক। সিগারেট ধরালেন একটা। তারপর খানিকটা দূরত্ব রেখেই হাঁটতে থাকেন ধীরে ধীরে।

প্রচণ্ড বেগে মাটির লরি বেরিয়ে গেল পর পর দুটো। থকথকে কাদার চাঁই পড়ল রাস্তায়। এমনিতেই আবর্জনা চারদিকে। তার ওপর আরও নোংরা। খোলা নর্দমা হাঁ করে আছে দু ধারে ! অবশ্য সবই ডেভেলাপ করবে নতুন স্কিমে। জলা মাঠের জমি আর ছোঁয়া যাবে না তখন। মল্লিকবাবুকে গোপনে বলে রেখেছেন পুরন্দর। অন্তত কাঠা দশেক ম্যানেজ করে দিতে।

দুটো লোক এসে সামনে দাঁড়ল হঠাৎ। দাড়িঅলা একজন বলল, একটু আগুন হবে দাদা।

পুরোবাবু সিগারেটটা সদ্য ফেলেছেন। পকেটে লাইটার।

তবুও বললেন, না। আগুন রাখি না।

—সরি দাদা। দাড়িঅলা ছেলেটা একটু হেসে সরে গেল।

পুরোবাবু চটপট হেঁটে গেট পেরিয়ে মাঠের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। কোনই অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। তবুও কেমন যেন সন্দেহ হয়।

কর্তাবাবুকে দেখলেন দিব্যি গল্প করতে করতে ঘুরছেন দলবল নিয়ে। ছড়িটা তুলে জলা মাঠের দিকে কী দেখাচ্ছেন আবার। একাই তিনি বক্তা। অন্যেরা অনুগতের মতো মাথা নেড়ে সায় দিচ্ছেন।

শ্রীমন্ত এক কোণে তার দেশোয়ালি বন্ধু জুটিয়ে পান গুণ্ডির থলে খুলে বসেছে। অন্য কোন দিকেই খেয়াল নেই।

পুরন্দর গাছের নীচে একটা বেঞ্চিতে চুপচাপ বসে পড়েন। কৃষ্ণপক্ষ। দেখতে দেখতেই অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে। পার্কের এক কোণে এখনও পুরনো আমলের একটা গ্যাসের বাতি জ্বলে। একটু আগেই কেউ জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। মৃদু জ্যোৎস্নার মতো আলোর আভা। ঝাঁকড়া দুটো শিরিষ গাছের মধ্যে দিয়ে অদ্ভুত লাগছে দেখতে।

পুরন্দর উঠে দাঁড়ালেন, না, আর নয়। কেবল হাবিজাবি চিন্তা ঘুরছে আজ মাথায়। কর্তাকে ডেকে বললেন, বাবা চলো এবার। রাত হয়ে এল।

—ও তুই বসে আছিস এখানে! কী আশ্চর্য। ঠিক আছে, চল্ তাহলে। আয় শ্রীমন্ত—

বন্ধুদের কাছে বিদায় নিয়ে ফিরতে থাকেন কর্তাবাবু।

পুরন্দর আগে আগেই এগিয়ে এসেছেন অনেকটা। কর্তাবাবু পিছনে। কার সঙ্গে দাঁড়িয়ে গল্প করছেন যেন। পুরোবাবু একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে আবার চলতে থাকেন। ভীষণ অন্যমনস্ক। খেলাঘর ক্লাবের পাশে কে যেন দাঁড়িয়ে। তাঁর দিকেই দেখছে। লোকটা কে? চেনা মনে হচ্ছে নাতো!

পিছনে আবার লরি আসছে একটা। গোঁ গোঁ করে প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসছে··· তাঁর দিকেই আসছে সোজা···কে যেন চেঁচিয়ে উঠল তাঁর নাম ধরে···পুরো···ও···

এক লাফে ছিটকে সরে যেতে চাইলেন পুরন্দর। পারলেন না। দারুণ ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়লেন নর্দমার মধ্যে।

কেউ কিছু বোঝার আগেই লরিটা ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল পাড়া ছেড়ে। পিছনে কুণ্ডলি পাকানো এক রাশ ধোঁয়া। ঘুরতে থাকে হাওয়ায়।

৩

দত্তভিলা জুড়ে কী আতঙ্ক গোটা রাত ধরে।

ডাক্তার বদ্যি, লোকজন। আসছে, যাচ্ছে। নানারকম চাপা কথার শব্দ, ফিসফাস। সুবর্ণময়ীর কান্না। কর্তাবাবুকে জোর করে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। পুরন্দর নীচের ঘরে। ধুইয়ে মুছিয়ে পরিষ্কার করা শরীর। ডাক্তার পরীক্ষা করছেন এখনও। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ। লাইজল, ডেটল, বেনজিন ও আরও হরেকরকম ওষুধ ও অ্যাণ্টি সেপটিকের মিশ্রিত গন্ধ বাতাসে।

পরিক্ষিৎ ঘরের মধ্যে হাত বন্ধ করে কেবল পায়চারি করছেন এদিক ওদিক। সুখেন্দু টেলিফোন পেয়েই চলে এসেছেন। খুবই উদ্বিগ্ন দুজনে। চুপি চুপি আলোচনা করছেন কিছু নিজেদের মধ্যে।

সুবর্ণময়ীর মুখ সাদা। কর্তাবাবুকে জোর করে ঘুম পাড়ানো হয়েছে। ডাক্তার এসে একবার তাঁরও নাড়ি দেখল, প্রেসার মাপল। সবই হাই। না মা, ভয়ের কিছু নেই, বলে সান্ত্বনা দিল তাঁকে। তারপর ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিল। এতেই নাকি সব ঠিক হয়ে যাবে।

—পুরো ? পুরোর কিছু হবে না তো ?

ডাক্তার মাথা নাড়ল, কিছু ঘাবড়াবেন না মা। আমরা সবাই মিলে তো দেখছি। সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনি শুয়ে পড়ুন একটু।

বলেই গটগট করে নীচে চলে গেলেন দত্তভিলার হাউস ফিজিশিয়ান বিনয় ব্যানার্জি। অনেককাল ধরেই তিনি এ বাড়ির চিকিৎসক। আপদে বিপদে সবার আগে ছুটে আসেন।

তবুও নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না সুবর্ণময়ী। কেবলই মনে হচ্ছে এ বাড়িতে বুঝি কিছু একটা অমঙ্গল ঘটতে চলেছে। উত্তরের দেয়ালে টিকটিকি ডাকে। ঠিক-ঠিক-ঠিক। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনের কথায় যেন সায় দেয়। ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে সুবর্ণময়ীর। অনেকক্ষণ ধরেই কাঁপতে থাকে।

মৌলি হাঁপাতে হাঁপাতে এবার ঘরের মধ্যে এসে বসলেন। অনেকক্ষণ ছোটাছুটি হয়েছে ওপর নীচে। বুকটা ধড়াস ধড়াস করছে।

জুঁইকে চুপি চুপি বললেন, দেখলি তো কী কাণ্ড হল। বলেছিলাম না। খুব সাবধান, এখন থেকে।

—তুমি একটু এখানে বোসো না মা।

—পাগল হয়েছিস! আমি শৈলীকে ডেকে দিচ্ছি এখানে। বলেই আবার উঠলেন, আমার তো ভীষণ ভয় করছে। উঃ রাতটা ভালয় ভালয় কাটলে বাঁচি—

জুঁই একা বসে থাকে ঘরের মধ্যে। চেষ্টা করেও খেতে পারেনি আজ। গা গুলিয়ে উঠেছিল। বসে বসে ভাবে নিজের মনে, এটা তো একটা অ্যাকসিডেন্ট। তার জন্যে অমন করছে কেন সবাই। যে কোনও সময় যে কোনও লোকেরই হতে পারে। যা র‍্যাশ ড্রাইভিং করে ট্রাক ড্রাইভাররা। অসাবধান হলেই হতে পারে।

আর কাকামণির তো তেমন সাংঘাতিক কিছু লেগেছে বলেও মনে হয় না। শুধু বিচ্ছিরি নোংরা পাঁকের মধ্যে পড়ে নাকানি চোবানি খেয়েছে। সেটাই আরও কষ্টের। ভেবে এখনও গা গুলিয়ে উঠছে, এঃ মা গো! চোখ বন্ধ করে থাকে জুঁই।

তারপর হঠাৎ মনে পড়ে, ইস্। বাবার সঙ্গে চিড়িয়াখানায় বেড়াতে যাওয়ার কথা ছিল কাল। তারপর হোটেলে খাওয়াদাওয়া। শৈলীমাসীও এসেছে। সে, শৈলীমাসি, মা বাবা, সুখেন্দু জেঠু—সবাই মিলে সারাদিনের মতো প্রোগ্রাম। কিন্তু সব ভেস্তে গেল।

বাবার মুখ গম্ভীর। একটার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে যাচ্ছে। শৈলীমাসির সঙ্গেও হেসে কথা বলছে না।

একতলায় নকুলবাবুর বাড়িতেও শোরগোল নেই আজ। সব চুপচাপ। নকুল-

বাবু বোধ হয় ঘরে ঢুকেই বসে আছেন। কিন্তু ছুটকিকে আটকাতে পারেননি। সে সমানে চরকির মতো ঘুরছে এদিক ওদিক। ঢুঁ মারছে জটলা দেখলেই। জানতে চাইছে, আসল ব্যাপারটা কী।

নকুলবাবুর ছোট, বিভাস, সুহাস দুই ভাই একবার দেখা করে এল সুবর্ণময়ীর সঙ্গে।

সব ছোট সুহাস বলল, মাসিমা কোনও দরকার পড়লে ডাকবেন আমাদের। আমরা আছি।

সুবর্ণময়ী কাঁদো কাঁদো মুখে আঁচল চাপা দিলেন, ঠিক আছে, বাবা।

ছুটকি একবার ওপরে যাবে ভেবেও গেল না। এখনও ধরতে পারছে না, কী করে এটা হল? ভয়ও করছে এক একবার। তাদের কোনও সন্দেহ করবে না তো কেউ? কী জানি।

বড় ননদ শুক্লাকে একবার বলল কথাটা।

শুক্লা চমকায়, পাগল হয়েছ বউদি। ওসব আজে বাজে চিন্তা করো না তো; ঘরে যাও।

ছোট ননদ শ্বেতা ঘরের মধ্যেই আছে। বইখাতা খুলে বসে ছিল স্কুলের। কিন্তু পড়ায় মন নেই। এক ভাবে বইয়ের পাতায় মুখ ডুবিয়ে আছে। অক্ষরগুলো যেন হিজিবিজি হয়ে নাচছে চোখের সামনে। কোনও কিছুই স্পষ্ট নয়। তবু তাকিয়ে আছে।

বুধু পাগলার ঘরে আচমকা তক্ষক ডেকে উঠল একটা। কেটে-কেটে তক্‌ক্ষ! তক্‌ক্ষ! তক্‌ক্ষ! নিস্তব্ধ পোড়ো বাড়ির মধ্যে অদ্ভুত প্রতিধ্বনি হয় শব্দটার। শুনতে শুনতে শ্বেতার বুকটা ছম্‌ছম্‌ করে ওঠে। সব কিছুই যেন অন্যরকম লাগছে আজ।

সুহাস পায়চারি করছিল অন্ধকার উঠোনের মধ্যে। অস্থির অস্থির লাগছিল হঠাৎ। চক মিলানো ভিলার চৌকো উঠোন। মাথার উপর তারা ভরা চৌকো আকাশ। ঝকঝক করে জ্বলছে কালপুরুষের তরবারি। নক্ষত্রের শরীর নিয়ে দাঁড়ানো আকাশের এক অতন্দ্র প্রহরী।

সুহাস একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার ঘুরতে থাকে। নীচে ব্যাডমিণ্টন খেলার কোর্ট। খড়ির দাগগুলো অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। তবু মোছেনি একেবারে। অনেকবার র‍্যাকেট হাতে আলোর মধ্যে সেও খেলেছে এখানে। এখন দুপাশে লাইট লাগানোর পোস্ট দুটো অন্ধকারে নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে। মাথায় অন্ধকারের মধ্যেও হালকা আলোর ভাব ফুটে উঠেছে। তারাভরা আকাশের ধবধবে আভা।

তার মধ্যেই চোখে পড়ে ওপরের জানলায় কে যেন দাঁড়িয়ে। জুঁই মনে হচ্ছে? হ্যাঁ সে-ই। শক্ত গ্রিলের ফ্রেমে মুখটা চেপে অন্ধকারে এক দুঃখীর মতো দাঁড়িয়ে আছে। এ বাড়ির সবচেয়ে হাসিখুশি উচ্ছল মেয়েটা।

একটু খারাপ লাগে সুহাসের। মন খারাপ লাগে।

দেখতে দেখতে রাত গভীর হয়ে আসে। নিস্তব্ধ দত্তভিলা। হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে একটা আর্তনাদ ভেসে উঠল—উ। উ—। আঁ—আঁ। বুধু পাগলার গলা। এ রকম কখনও করে না। কেউ যেন তেড়ে আসছে তাকে। খিক খিক করা এক রুক্ষ গলা। আবার সেই আঁ—আঁ করা ভুতুড়ে চিৎকার। সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে পাগলা। কাউকে আজ আর ঘুমোতে দেবে না বোধ হয়। গোটা বাড়িতে সাড়া পড়ে গেল যেন।

সুবর্ণময়ীর চোখ দুটো ঘুমে জড়িয়ে আসছিল। হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসলেন। বলতে লাগলেন, এ কি? এ কি হল?

পরিক্ষিৎ তড়াক করে ছুটে আসেন জানলার দিকে, এই চুপ করো বলছি। টুঁ শব্দটি করবে না। ফের যদি শুনেছি মুণ্ডুটা টেনে ছিঁড়ে ফেলব—

পাগলা তবুও থামে না। নাকি কান্নার সুরে আবার উঁ—উঁ করে চেঁচায়—উঁ উঁ—মাগো—

পরিক্ষিৎ রাগে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন যেন। জানলার ওপর রুলের বাড়ি মারেন, আই সে, ইউ স্টপ ইট স্কাউণ্ড্রেল—ভাল চাস তো এখনও চুপ কর বলছি।

ধীরে ধীরে পল্লবী উঠে এল এবার।

সে জেগেই শুয়ে ছিল। সারাক্ষণ একটাও কথা বলেনি কারও সঙ্গে। সুখেন্দু এসে একবার সান্ত্বনা দিতেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। মাথায় হাত রাখলেন সুখেন্দু, বোঝালেন অনেক করে। তারপর থেকেই চুপচাপ। মুখ নামিয়ে বাবার বিছানার পাশেই বসে ছিল। শেষে সুবর্ণময়ীই ধরে তার পাশে শোয়ালেন। কিন্তু ঘুম আর আসেনি।

এখন নিঃশব্দে উঠে এসে পোড়ো বাড়ির দিকে মুখ করে ডাকল,—বুধুদা—ও বুধুদা। কী হয়েছে তোমার? আমায় বলো—।

নরম মমতা ভরা গলা পল্লবীর। এবং তাতেই কাজ হয়। বুধু পাগলা চুপ করে যায়।

মাঝে মধ্যেই এ রকম কথা হয় তার বুধু পাগলার সঙ্গে। কেউ কারও মুখ দেখতে পায় না সচরাচর। কিন্তু কিছু বললে, পাগলা উত্তর দেয়। সেও প্রশ্ন করে হঠাৎ হঠাৎ পল্লবীর গলা পেলে। পল্লবী ছাড়া পাগলার আর যাকে পছন্দ এ বাড়িতে, সে হল জুঁই। সে কিছু বললেও শান্ত হয়ে সাড়া দেয়।

একটুক্ষণ চুপ করে আবার একটা মৃদু স্বর বার করে পাগলা। এবার গলাটা অনেক ক্ষীণ, এই-এই! উঁহু উঁহু--না, না—।

পল্লবী আবার বলে, বলো তুমি। তোমার কী হয়েছে?

—কী বলব। ওরা যে মারতে আসছে আমায়। ভয় দেখাচ্ছে—।

—কে মারতে আসছে, কারা ?

—ওই যে দুটো জাম্বুবান আর হনুমান। আমার ঘরের মধ্যে ঢুকে এসে বসেছে। দাঁত বার করে কামড়াতে আসছে।

—ও।

পল্লবী একটু ভাবে। কদিন ধরেই হনুমান দেখা যাচ্ছে ওদিকের বাগানে। উৎপাতও শুরু করেছে। হয়তো তাদেরই দুটো ঢুকে পড়েছে। কাছে এসে মেজাজ বিগড়ে দিয়েছে পাগলার।

ভেবে বলল আবার, শোনো, তুমি না একটু চুপ করে বসে থাকো। চোখ বুজে থাকো। ওরা আর কিছু বলবে না। দেখো, ঠিক চলে যাবে।

—আমি তো চুপ করেই আছি।

—জানি তো। তুমি খুব ভাল। এখন আরও চুপ করে থাকো।

—আচ্ছা।

—আমাদের মন ভাল নেই। কারও মন ভাল নেই আজ। তুমি আর ও রকম চেঁচিয়ো না। বুঝলে তো ?

—ঠিক আছে। আমি চোখ বুজে থাকব।

শেষ পর্যন্ত দেখা গেল বিপদ তেমন গুরুতর নয়। খুব জোর প্রাণে বেঁচে গেলেন পুরন্দর এ যাত্রা।

ডাক্তার ব্যানার্জি পরদিন আর একবার পরীক্ষা করলেন, ভাল করে। অর্থোপেডিক সার্জেন চৌধুরীও এলেন। এক্সরে রিপোর্টই দেখা হল। তেমন গুরুতর কিছু পাওয়া গেল না। পাঁজরার হাড়ে সামান্য একটা চিড় ধরেছে। একটু সাবধানে থাকলেই, নিয়ম মেনে, ভাবনার কিছু নেই।

হাঁটুর ওপর সামান্য জখম হয়েছে ডান পা-টা। লাগছে একটু হাঁটুতে। কিন্তু সেও দুচার দিনের ব্যাপার। বলিষ্ঠ শক্ত শরীর বলে চোটটা ভালই সামলে নিয়েছেন পুরন্দর।

সুবর্ণময়ীর মুখে হাসি ফুটল। বললেন, তুমি কর্তাবাবুকেও আর একবার দেখে যাও।

পন্নগভূষণ ভ্রূ কুঁচকে বললেন, কেন ? না না, আমি ঠিক আছি। তুমি পুরোকে ঠিক করে দেখ আগে।

—সব ঠিক আছে মেসোমশাই। ভাবনার কিছু নেই আপনাদের।

কর্তাবাবু নিশ্বাস ফেলে বললেন, কপাল ভাল, বেঁচে গেছে। না হলে যেভাবে ঘাড়ের ওপর চলে এসেছিল—।

বিজয়বাবু বললেন, আসলে ইমপ্যাক্টটা হবার আগেই উনি পড়ে গেছেন। সেটাই বাঁচোয়া।

—হ্যাঁ তাই। পিছন থেকে আমিও সেটা দেখেছি।

—আর পড়েছেন তো একেবারে থকথকে নরম জল কাদার মধ্যে। খারাপ ব্যাপার হলেও সেটাই হয়ে গেছে ওঁর পক্ষে আশীর্বাদের মতো।

—যা বলেছ ডাক্তার।

—ভাগ্যিস ভাঙা কাচটাচ বা লোহালক্কড় কিছু ছিল না ভিতরে।

সুবর্ণময়ী বললেন, কিন্তু চোখ-মুখের যা অবস্থা হয়েছিল, তাকানো যাচ্ছিল না। আর কী গন্ধ! উঃ! কী করে যে সহ্য করেছে ও, ভগবান জানেন।

বিজয়বাবু হাসলেন, ওঁর কি আর সে সব বোঝার অবস্থা ছিল, মা? ভালই হয়েছে বরং। কোনও শক্ত জায়গায় পড়লে বা ছিটকে বাড়ি ঘরে ধাক্কা খেলে প্রাণে বাঁচানো যেত কি না, সন্দেহ।

পুরন্দর এখন ফরসা পাজামা পাঞ্জাবি পরে ধবধবে বিছানায় শুয়ে। মাথার কাছে ফ্লাওয়ার ভাসে রজনীগন্ধার ঝাড়। মৌলি রেখে গেছেন সাজিয়ে। কিন্তু ফুলের গন্ধ ছাপিয়েও ওষুধের গন্ধ নাকে আসে আগে।

পুরন্দর এখন অনেক স্বাভাবিক। কথা বলছেন সবার সঙ্গেই। পুরো ঘটনার বিবরণ শোনালেন একবার নিজের মুখে সুখেন্দুদাকে। খানিক পরে পরিক্ষিৎও এসে বসলেন। জানতে চাইছিলেন, ঠিক কী রকম ছিল গাড়িটা, ড্রাইভারের মুখ দেখা গিয়েছিল কি···

কিন্তু ডাক্তার এসে বাধা দিলেন। না, এখন আর নয়। মনের ওপর চাপ পড়বে পেশেন্টের।

ঠাট্টা করে তিনি পরিস্থিতিটা হালকা করতে চাইলেন হয়তো। পুরন্দরকে বললেন, কি পুরোবাবু, এখনও কি সেই পাঁকের গন্ধ আছে, না গেছে এবার?

পুরন্দর হঠাৎ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন খানিক।

তারপর মুখ বিকৃত করে বললেন, ইস্ আর বলবেন না! ভাবলে পেটের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠেছে এখনও···উঃ কী যে হয়ে যাচ্ছিল আমার···

—না, না, এ সব চিন্তা আর একদম নয়। ফরগেট ইট টোটালি।

ডাক্তার একটু বসে আব একটা ইঞ্জেকশান পুশ করলেন। লোকজন সব সরিয়ে দেওয়া হল ঘর থেকে। একটু পরেই চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়লেন পুরন্দর।

পুলিশে একটা খবর দেওয়ার কথা উঠল। সুখেন্দুই কথাটা তুললেন।

—আমাদের বোধ হয় পুলিশকে ইনফর্ম করে রাখা উচিত একবার। আবার যদি কোনও অ্যাটেম্পট্ হয়, বলা তো যায় না।

পন্নগভূষণ বললেন, খেপেছ নাকি? পুলিশ এলেই নানারকম কথা উঠবে। কাকে সন্দেহ হয়, কেন সন্দেহ হয়, কী হয়েছিল? তাই নিয়ে টানাটানি করতে করতে শেষে ঘরের কথা দশকান করে ছাড়বে। না বাপু, ওর মধ্যে এখন না যাওয়াই ভাল।

পরিক্ষিৎ বললেন, কিন্তু বাবা যা হল, তার জন্যে কিছু অ্যাকশান তো নিতে হবে আমাদের। একটা কালপ্রিটকে এমনি এমনিই ছেড়ে দেবে?

—কী করবে তোমরা বলো? আর অ্যাকশান কিসের? র‍্যাশ ড্রাইভিং-এর জন্যে অ্যাকশান? ও তো সারা শহরময় রাতদিন পুলিশের নাকের ডগায়ই চলছে আমাদের। তারা দিব্যি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে, আর হাত পেতে পয়সা নিচ্ছে।

—সেটা নয় বাবা, র‍্যাশ ড্রাইভিং-এর চেয়েও বড় ব্যাপার হল, লোকটা ডেলিবারেট্‌লি চাপা দিতে চেয়েছিল পুরোকে—অ্যান অ্যাটেম্পট্‌ টু মার্ডার। এটা তো মার্ডার কেসের মতোই অফেন্স।

—কিন্তু তুমি সেটা প্রমাণ করবে কী করে, আর ধরবেই বা কাকে? লোকটাকে তো কেউ দেখেনি—।

—সেটা পুলিশের ব্যাপার। তুমি তোমার চোখের সামনে যেটুকু দেখেছ, তুমি তাই বলবে।

—কিন্তু আমিই বা কী বলব? গাড়ির নাম্বারটাও তো দেখতে পাইনি। এমন ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে অন্ধকারের মধ্যে হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেল!

—গাড়ির মডেলটা আর নাম্বারটা যদি একটু খেয়াল রাখতে পারতে···। কথাটা নিজের মনেই যেন বিড়বিড় করেন পরিক্ষিৎ। পন্নগবাবু মাথা নাড়লেন, নাহ্‌! কিন্তু নিজের চোখে যেটুকু দেখেছি তাতে দোষটা যে সম্পূর্ণ লরিঅলার, তাও মানতে পারছি না। পুরোও দায়ী এর জন্যে।

—কেন বল তো? একথা বলছ কেন?

পরিক্ষিৎ অবাক চোখে তাকান বাবার মুখের দিকে। সুখেন্দুশেখরের চোখেও এক অদ্ভুত কৌতূহল।

পন্নগভূষণ একটু চুপ করে থাকেন। পরে বলেন, কেন? ব্যাপারটা আমার নিজের কাছেও পরিষ্কার নয়। সত্যি বলতে কি পুরোর ধরনধারণটাই একটু অন্যরকম লাগছিল আমার। কেমন যেন বেহুঁশ হয়ে ও হেলতে দুলতে রাস্তায় হাঁটছিল। কী যে অত চিন্তা করছিল, তা ও-ই জানে।

—সে কী! কোনও নেশাটেশা করে এসেছিল নাকি? তখন তো সবে সন্ধেবেলা। আর পুরো তো সহজে বেচাল হয় না!

পন্নগবাবু মাথা নাড়েন, তা জানি না, বাপু। আমার থেকে অনেকটা দূরে দূরেই ছিল ও। তবে খুবই অন্যমনস্ক লাগছিল হাঁটা দেখে।

—বলছ। পরিক্ষিৎ চিন্তিত মুখে ভাবেন কিছু।

—হ্যাঁ। ফাঁকা রাস্তায় সন্ধেবেলা হু হু করে অত মাটির গাড়ি আসছে, যাচ্ছে, কিন্তু ওর সে সব কোনও খেয়াল ছিল বলে মনে হয় না···

সুখেন্দু হঠাৎ বললেন, কিন্তু পুরন্দর তো বলছে, লরিটা ওকে চাপা দিয়ে মেরে ফেলতেই চেয়েছিল—শিওর নাকি সে বিষয়ে ও। ডানদিকে অনেকটাই জায়গা ছিল বেরিয়ে যাবার, লরিটা ইচ্ছে করেই যায়নি।

সুখেন্দুর কথায় চুপ করে গেলেন পন্নগভূষণ। বেশ ঘাবড়েই গেছেন যেন। পরিক্ষিৎও অবাক চোখে তাকান। দুজনেই চিন্তিত মুখে বসে বসে ঘটনাটা ভাবেন একটু।

কর্তাবাবু মাথা নাড়লেন, কি জানি বাপু। আমি তো বুঝিনি সেরকম কিছু। মনেও হয়নি। হয়তো লরিটা আরও কাটাতে পারত—কিন্তু পুরোও সাবধান হয়নি। ভীষণ অন্যমনস্ক ছিল।

পরিক্ষিৎ চুপচাপ থেকে বললেন, তবুও বাবা পুলিশে ব্যাপারটা বোধ হয় একটু জানিয়ে রাখা ভাল। পরেও যদি আবার এ রকম কিছু ঘটনা ঘটে।

—তার জন্যে সতর্ক হয়ে থাকতে হবে তোমাদের। পরে এসে কি করবে? পুলিশ এলেই তো প্রথম প্রশ্ন উঠবে, কারও সঙ্গে শত্রুতা আছে তোমাদের? কোনও লোককে কি সন্দেহ হচ্ছে? সে কে? কী জবাবটা দেবে তখন?

পরিক্ষিৎ চুপ করে গেলেন। কিছু একটা বলতে গিয়েও বললেন না।

রাত্তিরে পরিক্ষিৎ আর সুখেন্দু একটু আলাদা বসেছিলেন। সামনে সাজানো দামি পানীয় ভরা গ্লাস। দুটো প্লেটভর্তি কাজুবাদাম, চিজ, পকোড়া। দক্ষিণের খোলা জানলার পাশে গ্লাস হাতে গল্প হচ্ছিল একান্তে। দুজনেরই চোখে হালকা নেশার আবেশ।

একটু আগে মৌলি আর শৈলীও ছিলেন। দুজনেই সঙ্গ দিচ্ছিলেন ওঁদের। হালকা রঙ্গরসিকতাও হচ্ছিল মাঝে মধ্যে।

মনের ভয়টা যেন কিছুতেই কাটছে না মৌলির। বিভীষিকার মতো লেগে আছে। হাসতে হাসতেই গম্ভীর হয়ে যাচ্ছেন।

হঠাৎ বললেন, কী হবে এবার সুখেন্দুদা!

সুখেন্দু হাসলেন, একটু খাওয়া দাওয়া, রাত্তিরে সুন্দর একটা ঘুম, তারপর আবার সেই সকাল হবে কাল। আর কী?

শৈলী হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠল। সেটা চাপা দিতেই যেন শরীরে ঢেউ তুলে গড়িয়ে গেল চেয়ারে। পরিক্ষিতের দিকে।

মৌলির চোখে কটাক্ষ, যাঃ আপনার সব কিছুতেই যেন ঠাট্টা। আমি কোথায় ভেবে ভেবে পাগল হয়ে যাচ্ছি···।

—প্লিজ, সেটা হয়ে আর কাজ নেই। তাতে কারও কোনও উপকার হবে না। রিল্যাক্স ম্যাডাম, রিল্যাক্স! তুমি তার চেয়ে বরং আর চারটে প্রন্ পকোড়ার ব্যবস্থা করো দেখি, আমাদের জন্যে।

শৈলী বলল, বসুন, আমি নিয়ে আসছি সুখেন্দুদা।

—আরে না না, অত ব্যস্ত হয়ে উঠতে হবে না। ইটস্ আ প্লেজার টু হ্যাভ ইয়োর কম্প্যানি।

শৈলী সুন্দর করে হাসল এক ঝলক।

পরিক্ষিৎ মৌলিকে বললেন, সুখেন্দুদা আজ আমাদের সঙ্গেই খেয়ে যাবে। কি বল?

—ও নিশ্চয়ই। খুব ভাল হবে সুখেন্দুদা।

একটু পরে মৌলি, শৈলী দুজনেই উঠে গেল। সুখেন্দু আর পরিক্ষিৎ দুজনের নিরিবিলিতে কিছু কথা হয় এবার।

—আমি খবর নিয়েছি ক্ষিতি, সুখেন্দু বলছিলেন, ওই রাজেশের দলে বেশ কিছু ব্যাড এলিমেন্ট আছে। তাদের মতলব কিন্তু খুব ভাল নয়। নিজেদের মধ্যে ওরা আলোচনাও করেছে একটা বদলা নেবার জন্যে।

—তুমি কোথায় খবর পেলে? অবাক চোখে তাকান পরিক্ষিৎ।

—আমাদের ক্লাবের সুরেশ। ওকেই বলেছিলাম, ড্রিঙ্কস নিয়ে দলটার সঙ্গে একটু ভাব জমাতে ক্লাবে। সে-ই শুনেছে দু-একটা কথা।

—কী করতে চায় ওরা?

—ঠিক বলা মুশকিল। আর, নেশার রঙে বলা আর কাজে সেটা করা, এক নয়। তবে আসল টার্গেট হল লাবি। আর সেখানে যখন পৌঁছোতে পারছে না, তখন আমরা যারা তার প্রতিবন্ধক—তারা। অর্থাৎ আমি, তুমি, পুরো· ·।

—আই সি! তোমার কি মনে হয় তাহলে, পুরোর ওপর ওরাই অ্যাটেম্পট করেছে? আর য়ু শিওর?

—অ্যাবসলিউটলি! পুরো পার্কে ঢুকছিল যখন, হঠাৎ দুটো অচেনা লোক এসে ওর রাস্তা আটকে দেশলাই চেয়েছিল, তুমি জান? পুরো নেই বলে পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছিল।

—কিন্তু তাতে কী প্রমাণ হয়?

—আসলে, আমি বুঝতে পারছি, ওদের লাগানো হয়েছিল টার্গেট চিনিয়ে দিতে। কাকে মারতে হবে। ড্রাইভার নিশ্চয়ই দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ রাখছিল। তারপর সময়মতো ফলো করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। একটা যেন নিখুঁত প্ল্যানিং-এর ছবি দেখতে পাচ্ছি এর মধ্যে।

লালচে ডিম্ লাইটের মধ্যে পরিক্ষিতের দৃষ্টিটা অদ্ভুত থমথমে দেখায়। ধীরে ধীরে গ্লাসটা নামিয়ে রেখে জানলার বাইরে তাকিয়ে রইলেন।

সুখেন্দু বললেন, তুমি রাজি থাকলে, একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভের সঙ্গে কথা বলতে পারি।

—কার সঙ্গে? পরিক্ষিৎ মুখ ফেরালেন।

—ডিটেকটিভ দেবদত্ত চ্যাটার্জি।

—ও, দ্যাট ফেমাস ইনভেস্টিগেটার?

—ইয়েস।

৪

জীবনে যত পূজা হল না সারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা···

মথুরামোহন গান শেখাতে বসেছেন। অদ্ভুত মগ্নতা তাঁর গলায়। সুরের ধারায় মনপ্রাণ ঢেলে যেন মূর্ত করে তুলছেন তাঁর সঙ্গীতকে। চোখে দেখতে পান না। তাই হয়তো সুরটি আরও আকুল আরও মধুর শোনায় তাঁর কন্ঠে। যেন গান নয়, এ তাঁরই এক আত্মগত নম্র নিবেদন।

পল্লবী কান পেতে শোনে। দীর্ঘ আয়ত চক্ষু। মুগ্ধ দৃষ্টিতে অন্ধ গুরুজির দিকে তাকিয়ে মনে মনে অনুসরণ করতে থাকে কথাগুলো। কী অপূর্ব তাঁর সুরবিস্তার। বুকের মধ্যে রিম ঝিম করে বাজে যেন। তারপর গুরুজীর নির্দেশে সে-ও গলা মেলায়।

যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে
যে নদী মরুপথে হারাল ধারা···

ভারী ধ্রুপদী গলার গাম্ভীর্যের সঙ্গে পল্লবীর চিকন সুরেলা গলার সম্মিলন। গুরু-শিষ্যার দ্বৈত কন্ঠে যেন নতুন প্রাণ পেয়ে আরও ঐশ্বর্যময় হয়ে উঠল কথাগুলো। আরও অর্থময়। প্রাচীন দত্তভিলার অন্ধিসন্ধিতে ছড়িয়ে পড়ছে তার অপূর্ব ঝঙ্কার।

জানি হে জানি তাও হয়নি হারা···

আপাতদৃষ্টিতে দত্তভিলা এখন তার স্বাভাবিকতায় ফিরে এসেছে। কর্তাবাবুরা মোটামুটি নির্ভয়েই চলাফেরা করছেন। রাত করেও বাড়ি ফিরছেন মাঝে মধ্যে। জুঁই সরকারদাদুকে নিয়ে স্কুলে যাওয়ার হাত থেকে রেহাই পেয়েছে সম্প্রতি। মধ্যে একদিন শৈলী আর মৌলিকে নিয়ে পরিক্ষিৎবাবু লাইটহাউসে নাইট শোর

সিনেমা দেখে এলেন। গ্রেগরি পেকের নাম করা ছবি। পল্লবীর গলায় আবার নিয়মিত গান শোনা যাচ্ছে। পিয়ানো লেসন দিতে মিস সাইনিও আসছেন সপ্তাহে দুদিন।

দত্তভিলার সেই থমথমে আতঙ্কের ঘোরটা যেন অনেকটাই কেটে গেছে। শুধু কথাটা মনে গেঁথে আছে।

ডিটেকটিভ দেবদত্ত চ্যাটার্জির সঙ্গে ইতিমধ্যে যোগাযোগ হয়ে গেছে। তার পরামর্শেই সাদা পোশাকের পুলিশ পোস্টিং চলল কয়েকদিন দত্তভিলার সামনে। এখনও রাতের দিকে মাঝেমধ্যে টহল দিয়ে যায় তারা। ব্যক্তিগতভাবে পরিক্ষিৎ, পুরন্দর এবং সুখেন্দু যথেষ্ট সজাগ এখন। নির্দেশগুলো মোটামুটি মেনেই চলেন নিরাপত্তার।

সুখেন্দুর অনুরোধে তাঁর প্রিয় ডিটেকটিভ দেবদত্ত চ্যাটার্জি নিজেই একদিন হাজির হল দত্তভিলায়।

সব দিক দেখে শুনে, ঘুরে বলল, এ তো দেখছি একটা দুর্গ আপনাদের। এখানে চট করে ঢুকে কোনও মেয়েকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাওয়া, খুব সহজ কাজ নয়।

—আসলে একরোখা গুণ্ডা প্রকৃতির ছেলে তো, মরিয়া হয়ে দলবল নিয়ে যদি হানা দেয়…।

সুখেন্দু আর একবার চেষ্টা করেন বোঝাতে পুরো ব্যাপারটা।

দেবদত্ত একটু ভাবুক চোখে তাকায়, বলছেন। লাঞ্ছিত ব্যর্থ প্রেমিক তার নায়িকাকে ফিরে পেতে জীবনপণ করতেও দ্বিধা করবে না। বিশেষত সে যদি হয় গুণ্ডা প্রকৃতির এক মাস্তান যুবক। ঠিকই। এ রকম পরিস্থিতিতে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, যে দলবলের কথা আপনি বলছেন, আমি খোঁজ নিয়েছি, এ রকম একটা কঠিন অপারেশন তাদের পক্ষে…বোধহয়, সম্ভব নয়। হ্যাঁ সম্ভব হত। যদি এ বাড়ির ভিতর থেকে একটি সাহায্যের হাত আসত…।

—না না, সে কী বলছেন। সে রকম কোনও সম্ভাবনা নেই। পন্নগভূষণ বাধা দিয়ে বলে উঠলেন। একটু যেন ক্ষুব্ধ তিনি।

—আমি তর্কের খাতিরে বলছি। দেবদত্ত মৃদু হাসে। কিন্তু আপনাদের বাড়ির কাজকর্মের লোকজন, নায়েব-গোমস্তা-মালি-ঠাকুর-ফরাস,—এদের সবাইকেই বিশ্বাস করেন তো?

—নিশ্চয়ই। আমাদের সব লোকই পুরনো আর বিশ্বস্ত। বহুদিন ধরে দত্তবাড়ির সুখে দুঃখে জড়িয়ে আছে। এদের কাউকেই কোনও সন্দেহের কারণ নেই।

—যাক নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। কিন্তু আপনাদের ওপাশের নীচে ভাড়া থাকেন যাঁরা?

পন্নগভূষণের কপালে ভাঁজ দেখা দেয়। ভেবে বলেন, ওই একটা লোকই খুব পাজি নিঃসন্দেহে। নকুলবাবু। ঘরের শত্তুর বলতেও পারেন। অদ্ভুতঅদ্ভুত কাণ্ড করে মাঝে মাঝে। কিন্তু ঠিক এই ধরনের একটা কাজও করতে পারে বলে বিশ্বাস নেই। তা ছাড়া বাড়িতে নিজের পরিবার রয়েছে, সেদিকেও তো ভয় আছে।

—কজন লোক আছে মোট ওই পরিবারে?

—ওই তো, তিন ছেলে, এক বউ, ওদের মা, আর দুটি মেয়ে।

—ছেলেরা সব কে কী করেন জানেন তো?

—পুরোপুরি সব জানা নেই। এমনি যা শুনি, বলতে পারি।

—তাই বলুন।

—বড়জন নকুলবাবু। আগে ছিলেন কোন অডিট ফার্মে, এখন নাকি আছেন বড়বাজারের এক মারোয়াড়ি গদিতে। এক নম্বরের খ্যাপাটে লোক। বেশি বয়েসে আবার অল্প বয়েসি একটি মেয়েকে বিয়ে করে এনেছেন। তার ও ধরনধারণ খুব সভ্যভব্য নয়। গা পিত্তি জ্বলে যাবে আপনার দেখলে। একটা ভদ্রবাড়ির মধ্যে…

পন্নগবাবু মনের রাগে আরও অনেক কিছুই বলতে চান। প্রাথমিক সংকোচটা যেন কেটে গেছে বৃদ্ধের। দেবদত্ত শান্তভাবে থামিয়ে দেয় তাঁকে।

—আর যে ছেলে দুটোর কথা বললেন, নকুলবাবুর ভাই, তাঁরা কে কী করেন?

—না, ওই ছেলেদুটি খুব খারাপ নয়। একজন পাশ করা ওভারসিয়ার, বিভাস নাম। ছোটটি সুহাস—লেখাপড়ায় ভাল বলে শুনেছি। এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ছে। তবে ইয়ারবন্ধু যেগুলো বাড়িতে আড্ডা জমায় এসে সেগুলো কিন্তু খুব সুবিধের নয়। আর হবেই তো, বাড়িতে যখন এ রকম সব ব্যাপার…

দেবদত্ত অন্য দিকে তাকিয়েও খুব মনোযোগ দিয়ে শোনে কথাগুলো। মনে মনে বোধ হয় একটা ছবি এঁকে নিতে চাইছিল চরিত্রগুলোর।

পাশে তার তরুণ সহকারী রাতুল সেন। হাতে একটা ডায়েরি। নিঃশব্দে কী সব নোট করে যায় মাঝে মাঝে।

দেবদত্ত বলল, আর, ওঁদের বোন দুটির পরিচয়?

—বড় জনের বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু বছর তিনেক বাদেই চলে এসেছে শ্বশুর-বাড়ি ছেড়ে। তারপর থেকেই এখানে। সে ছেলে নাকি ডিভোর্স করেছে।

—ও। কারণটা কিছু জানেন কি?

— না, না, ওসব ব্যাপার নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। কৌতূহলও প্রকাশ করি না কখনও। তবে বাড়ির মধ্যে এ রকম মেয়ে বউ থাকলে যে রকম উটকো লোকের আড্ডা জমে, হই হই হয়, তার ঠেলা সামলাই। বিরক্তিতে কর্তাবাবুর মুখ বিকৃত হয়ে ওঠে।

—আর ছোট মেয়েটি ?

—হ্যাঁ, ওকে দেখলে মোটামুটি শান্তশিষ্টই মনে হয়। শ্বেতা নাম। ক্লাশ এইট না নাইনে পড়ে।

—ও। তাহলে বলছেন, এরা যে যেমনই হোক, রাজেশ বা তার দলবলকে কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে, এমন আপনার মনে হয় না।

—না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে যদি মতলব থাকে কোনও, আমি জানি না।

—অন্তত সে রকম কোনও মোটিভ পাওয়া যাচ্ছে না। তাছাড়া, ওপরের তলায় কারও যাতায়াত নেই···মেলামেশা বা ঘনিষ্ঠ কোনও কথা বলারও সুযোগ নেই···

দেবদত্ত নিজের মনেই কথা বলতে বলতে যুক্তিগুলো যেন সাজিয়ে নিতে থাকে।

—কিন্তু দাদা, উত্তর দিকের ওই ভাঙাচোরা অংশটা ? রাতুল এতক্ষণ পরে কথা বলে হঠাৎ, ওখান থেকে বাড়ির মধ্যে সহজেই তো কেউ এণ্ট্রি নিতে পারে।

দেবদত্ত সমর্থন করে, য়্যু আর রাইট, রাতুল। একটা সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। *নির্জন পোড়ো বাড়ির মধ্যে লুকিয়ে থেকে সুযোগ বুঝে হঠাৎ বেরিয়ে পড়া—।* কী, তাই তো ?

পন্নগবাবু মাথা নাড়লেন, না না সেটা সম্ভব নয়। ওই ভাঙা বাড়ি থেকে আমাদের অংশে ঢুকে পড়বার কোনও উপায় নেই। ওখানে চট করে যাওয়াও সম্ভব নয়। সাপ ব্যাঙ ভরা ঘন জঙ্গলের মধ্যে পিছন দিক থেকে একটা সরু রাস্তা। সোজা হয়ে কেউ হাঁটতেও পারবে না। আর তাছাড়া কেউ ঢুকলেও এদিকে বেরোতে পারবে না। ভিতরে একটা মজবুত দেওয়াল দিয়ে আটকানো আছে।

—যদি কেউ ওপর থেকে লাফিয়ে নামে উঠোনে ? রাতুল প্রশ্ন করল।

—তাই কি সম্ভব নাকি ? পুরনো আমলের দোতলার অত উঁচু থেকে একটা লোক নীচেয় সিমেণ্টের মেঝের ওপর লাফ দেবে—তার কি প্রাণের মায়া নেই ? সবার আগে নকুলবাবুরাই তাহলে হই হই বাধিয়ে একটা তুলকালাম করে ছাড়বে।

সুখেন্দু বললেন, তাছাড়া রাত্তিরে ওই পোড়ো বাড়ির মধ্যে কারও পক্ষে নিঃশব্দে ঢুকে পড়া খুবই মুশকিল, মিঃ চ্যাটার্জি। প্রায় অসম্ভব।

—কেন ? অসম্ভব কেন ?

—সেই যে একটা পাগল লোকের কথা বলেছিলাম, বুধু পাগলা। ওটা যে তারই আস্তানা। কাউকে দখল নিতে দেবে না সহজে। রীতিমতো হই-চই ফেলে দেবে।

—আচ্ছা ! ইণ্টারেস্টিং !

—লোকটা ঘুমোয় বলেও মনে হয় না। সারারাত ওই বাড়ির ভাঙা ইট কাঠ লোহালক্কড় আর রাবিশের স্তূপের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়, কথা বলে নিজের মনে। নানা-রকম অসংলগ্ন কথা। আবার ভাঙা গলায় গানও জুড়ে দেয় কখনও। একটা অদ্ভুত চরিত্র !

—শুধু অদ্ভুত নয়, একটু গোলমেলেও মনে হচ্ছে যেন। আপনারা কোনও সন্দেহ করেন না ওকে ?

—না, মিঃ চ্যাটার্জি। বেশ কিছুদিন ধরেই এখানে আছে। অবশ্য রাতটাই কাটায়। এ বাড়ির সঙ্গে ওর যেন একটা সম্পর্কই হয়ে গেছে। এমনিতে খ্যাপা-পাগল হলেও, পল্লবীর কথা খুব শোনে। কিছু জিজ্ঞেস করলে শান্ত মেজাজে জবাব দেয়। গল্পও করে।

—তাহলে তো কাজ হাসিলের জন্যে এই পাগলাকেই হাত করতে পারে কেউ। এইটেই তো সহজ পথ।

সুখেন্দু হাসলেন, কী করে করবে ? পয়সা কড়ি, জিনিসপত্তর এসব কোনও কিছুরই যার চাহিদা নেই, দরদাম বোঝার মতো মনও নেই, তাকে হাত করা কি সম্ভব নাকি ? তাছাড়া কাছে গিয়ে ওরকম কোনও লোভ দেখাতে গেলে ক্ষিপ্ত হয়ে তেড়েই আসতে পারে। চিৎকার করে হয়তো তখন ডেকে ডেকে সবাইকে বলবে কথাটা।

—আই সি। তার মানে বেশ অ্যাগ্রেসিভ ক্যারেকটার। একে তো পাগলা গারদে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। কোনও সময় একটা অঘটন ঘটিয়েও ফেলতে পারে।

—না না, আপনি যে রকম ভাবছেন, সে রকম নয় কিন্তু। একদিন রাত্তিরে এখানে আসুন, বুঝতে পারবেন। যদি অবশ্য ও থাকে সেদিন। আমার তো বেশ পছন্দ হয়। মাঝে মাঝে ওকে আমার একজন জ্ঞানী ব্যক্তির মতোই লাগে। এমন এক একটা মন্তব্য করে ওঠে, যে শুনলে চমকে উঠতে হয়। নিতান্ত হালকা চালেই বলে। কিন্তু মনে হয় যেন কত গভীর কথাগুলো।

—তাই ? কোয়াইট ইন্টারেস্টিং ? দেবদত্ত অবাক হয়।

পরে পন্নগভূষণের দিকে বলল, কিন্তু মিঃ দত্ত বাড়িটা এমন জরাজীর্ণ পোড়ো অবস্থায় আপনারা ফেলে রেখেছেন কেন ? আপনাদের নিজেদের পক্ষেই তো বেশ রিস্কি।

কর্তাবাবু নিশ্বাস ফেলে বললেন, কী আর করব, বলুন। শরিকের সম্পত্তি, আমার একার ব্যাপার তো নয়। একমাত্র ওয়ারিশ আমার ভাইপো। যতদিন তার একটা খবর না পাচ্ছি, চট করে কিছু করতে পারি না।

—ও আচ্ছা ! কিন্তু তাঁর নিরুদ্দেশ হয়ে থাকার কারণটা কী ? কেনই বা চলে গেলেন বাড়ি ছেড়ে ?

—ভগবানই জানেন ! বদ নেশায় আর কুসংসর্গে একটা ফুলের মতো জীবন নষ্ট হয়ে গেল ! আমার ছোটভাই শৈলভূষণের বড় আদরের ছেলে। নাম রেখেছিল সুধাকান্ত !

—কতদিন আপনারা খবর পান না তাঁর ?

—তা প্রায় বারো বছর। আইনত এ সম্পত্তি হয়তো এখন আমাদেরই হয়। তবু অপেক্ষা করে আছি, আমি বেঁচে থাকতে যদি ফিরে আসে। ওর প্রাপ্য ওকেই বুঝিয়ে দিয়ে যাব। শৈলের একমাত্র ছেলে! ওর জন্যে এখনও মন কাঁদে আমার…

একটুক্ষণ চুপচাপ থেকে আবার দুঃখের কাহিনী শুরু করেন বৃদ্ধ। নিজের মনেই বলেন, একসময় অবশ্য শৈল আমার ছোট ছেলেকে দত্তক নেবে ভেবেছিল। কিন্তু সে পাঁচ বছর বয়সেই আমাদের ছেড়ে গেল। তখন ঠিক হ'ল, মেজ পুরন্দরকেই নেবে। আমি রাজি হলাম, সব ঠিকঠাক। পুরোই হবে তার উত্তরাধিকারী।

কিন্তু তখনই হঠাৎ বিয়ের দশ বছর পর সন্তানসম্ভবা হলেন আমাদের বউমণি। সেই ছেলেই সুধাকান্ত। কিন্তু জন্মের পরই ও ওর মাকে হারায়।

—আই সি! দেবদত্ত অবাক চোখে বৃদ্ধের মুখের দিকে দেখে। যেন অনেক ইতিহাস জমা আছে ওই মুখের ভাঁজে ভাঁজে।

—খুব আঘাত পেয়েছিল শৈল। তবু ছেলের মুখ দেখে সান্ত্বনা পায় একটু। ওর শাশুড়ির এক বিধবা বোন এসে মানুষ করতে লাগলেন ছেলেটিকে। আদরে আদরে ছেলেটিকে একেবারে বুকে আগলে রেখেছিলেন ভদ্রমহিলা। কিন্তু কপাল! মানুষ সে হল না। দিনের পর দিন শৈলও কেমন আধভোলা হয়ে যেতে থাকল। তারপর সে-ও একদিন চোখ বুজল…

আর জোয়ান ছেলে যেন হাতে স্বর্গ পেল তখন। আরও উদ্দাম হয়ে উঠল ইয়ার বন্ধুদের নিয়ে। তারপর একদিন হঠাৎ কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। আর খোঁজ পাওয়া যায় না। জানি না, সে বেঁচে আছে কি না!

বলতে বলতে কর্তাবাবুর গলাটা বুজে আসে প্রায়। চোখ ছলছলে।

দেবদত্ত চুপ। এই মুহূর্তে আর কোনও প্রশ্ন করা উচিত নয় বৃদ্ধকে। একটুক্ষণ বসেই সে উঠে পড়ে এবার। সুখেন্দুকে বলল, তেমন কিছু দেখলে, সঙ্গে সঙ্গেই খবর দেবেন। আমি আছি।

তারপর থেকেই দেখা যাচ্ছে এ বাড়িতে একটা স্বস্তির ভাব। দত্তভিলা আগের মতোই গানে বাজনায় গল্পে আনন্দে মুখর হয়ে উঠছে।

পল্লবীর মনেই হয়তো একটা ভার রয়ে গেছে এখনও। সত্যিই আছে কি? আজ সন্ধেয় বাড়িতে ঢুকে তার গান শুনতে শুনতে কথাটা মনে হল সুখেন্দুর। অপূর্ব দরদ দিয়ে গান গাইছে। সুরেলা গলার এই সুন্দর গান যেন অনেকদিন পরে শুনছেন। একবার ওর কাছে গিয়ে বসতে ইচ্ছে হল।

সিঁড়ির মুখেই সরকার মশাই। একগাল হেসে তটস্থ হয়ে আগে প্রণাম করেন মাথা নুইয়ে। তারপর এক এক করে খবর দেন বাড়ির; ক্ষিতিবাবুর ফিরতে দেরি হবে আজ। গাড়ি এসে শৈলী দিদিমণিকে নিয়ে গেছে। ক্লাবে যাবেন। পুরোবাবু

ফিরেছেন খুব তাড়াতাড়ি। এখুনি আবার বেরোবেন। কর্তাবাবু পার্কে। সঙ্গে সিংহাসন। আপনাকে কী দিতে বলব বাবু ?

এক নিশ্বাসে গড়গড় করে বলে গেলেন সরকার মশাই।

—ঠিক আছে। আমার জন্যে ভাবতে হবে না। সুখেন্দু হাসলেন।

ঘরের ভিতরে হাসির শব্দ। খিল খিল করে হেসে উঠছে মৌলি। আলো জ্বলছে ছোট পাওয়ারের। এক পাশের পর্দার ফাঁকে দেয়াল জোড়া আয়নাটা চোখে পড়ে যায়। মৌলির মুখ। হাসি আর কৌতুকে যেন উচ্ছ্বসিত। পুরন্দরের একটা গরম কোট গায়ে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে। পুরো ব্রাশ টেনে টেনে পরিষ্কার করছে কোটটা। একেবারে কাঁধের ওপর থেকে নিতম্বের নীচে পর্যন্ত। আর মৌলি থেকে থেকেই হেসে উঠছে।

ফাঁপানো চুলগুলোর জন্যে একটু বাধা পড়ছে।

—এই তোমার চুলগুলো বাঁধো। পুরন্দর বলল।

—তুমি বেঁধে দাওনা। মৌলি রহস্য করে বলল।

পুরন্দর মুঠো করে চুলগুলো পাকিয়ে এলো খোঁপা করে দিল। তারপর আরও চেপে চেপে টানে ব্রাশটা।

মৌলি মুখ টিপে হাসে। বলল—

—এই, তোমার সেই নয়নার কী খবর, ছোড়দা ?

—কিচ্ছু জানি না। পুরো মাথা নাড়ে।

—সে কী ! তোমার নয়না নয়ন ফিরিয়ে নিয়েছে ? সত্যি, কতকাল একটা মেয়েকে তুমি ঝুলিয়ে রাখবে বল তো ?

—দূর ! এখন ওসব চিন্তা আর ভাল লাগছে না। ফাইন্যান্স চাই—ফাইন্যান্স ! ব্যবসার অবস্থা ভাল নয়। এখনই লাখ খানেক টাকা চাই।

—ও বাবা, অত টাকা ! সুখেন্দুদাকে বল না।

—অলরেডি অনেক নিয়ে বসে আছি। আর চাওয়া যায় না।

ব্রাশটা এবার কোটের সামনের দিকে টানে পুরন্দর। মৌলি হেসে উঠে পিছিয়ে গেল। হাত আড়াল করে নিজেকে। চোখে কটাক্ষ।

—এই না। এদিকটা আমি টানছি, দাও—।

ব্রাশটা হাতে নিয়ে বলল, ব্যবসার ওঠানামা তো তোমাদের আছেই। তাই বলে কি তুমি বিয়ে করবে না ?

—না।

—কেন ?

—পছন্দমতো মেয়ে কই ?

—বাঃ, নয়না তোমার পছন্দ নয় ?

—মোটেই না।

—ও বাবা! তবে কী রকম পছন্দ শুনি?

—ঠিক এই-ই রকম!

হঠাৎ হাসতে হাসতে তার মুখ ধরে নাড়া দেয় পুরন্দর। মৌলির মুখটা লাল। হাসতে হাসতেই সে একটা চড় তোলে। পুরো মুখ ফিরিয়ে নেয়।

তখনই হঠাৎ যেন মনে হয় জানলার পাশ থেকে দুটো চোখ সরে গেল। কার চোখ? সরকার মশাই কি? পুরো বলল, কে ওখানে?

দরজা খুলে বাইরে এল। কেউ নেই। ভ্রূদুটো কুঁচকে ওঠে পুরন্দরের।

গুরুজির কাছ থেকে পল্লবী এবার নতুন গান তুলছে। ভজন। খুব দরদ দিয়ে গাইছে। মথুরাবাবু মাথা নেড়ে উৎসাহ যোগাচ্ছেন ছাত্রীকে। রাত হয়ে এসেছে। তবু এখনও রেওয়াজ চলে আজ। গুরুশিষ্যা দুজনেরই সমান উৎসাহ। দেখে বেশ ভাল লাগে সুখেন্দুর। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে শোনেন। তারপর চুপি চুপি একসময় পাশে এসে বসে পড়েন।

পল্লবী তাকাল চোখ তুলে। গানের ঝোঁকে আবেশভরা চোখে তাকিয়েই থাকে।

মথুরামোহন তাল থামিয়ে বললেন, কে? পল্লবীও থেমে যায়।

—আমি সুখেন্দু। দেখতে এলাম, আপনার ছাত্রী কেমন শিখছে।

—ও। খুব ভাল। বড় মিঠে গলাটা বাবু।

—আপনি তো দেখতে পান না মাস্টারমশাই, আপনার ছাত্রীর চেহারাটাও খুব সুন্দর! গানের গলার মতোই মিষ্টি আর নরম।

পল্লবীর চোখে চাপা কটাক্ষ। রাগ না অভিমান? বোঝা যায় না। সুখেন্দু হাসলেন।

মথুরামোহনের মুখে এক অনাবিল হাসি, পাই সুখেন্দুবাবু। মনে মনে আমিও যে সব দেখি।

কুঞ্জবাবু তবলায় ঢাকা পরিয়ে ফেললেন। রাত বেশ হল।

—আসি তাহলে সুখেন্দুবাবু। চলি দিদি। মথুরাবাবু উঠে পড়লেন।

—হ্যাঁ আসুন। ভেবেছিলাম একটা গান শুনব আপনার। কিন্তু আজ থাক। দেরি হয়ে গেছে অনেক।

—ঠিক আছে। আপনি যখন বলবেন ·

[ধরে ধরে তাঁকে নামিয়ে নিয়ে যান কুঞ্জবাবু।

সুখেন্দুর বেরোতে বেরোতে বেশ রাত হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত।

পল্লবীর সঙ্গে বসে বসে গল্প করলেন অনেকক্ষণ। প্ল্যান করলেন একদিন তাকে নিয়ে বেড়াতে যাবার। কিন্তু এখনই হচ্ছে না। আরও কয়েকদিন কাটুক ভালয়

ভালয়। মৌলিও এসে বসল একবার। চা আনল পর পর দুবার। সঙ্গে তার হাতের তৈরি নিমকি আর চন্দ্রপুলি। কিন্তু তবুও পরিক্ষিতের দেখা নেই। ক্লাবেই খাওয়া দাওয়া করবে হয়তো। পুরো বেরিয়েছে সেই সন্ধেবেলায়। তারও দেখা নেই। বেশি ডেসপারেট হয়ে উঠছে নাকি, ওরা? বড় বেশি ডেয়ারিং? কথাটা বলতে হবে কাল ক্ষিতিকে।

আর একটু বসে অবশেষে বেরিয়েই পড়লেন সুখেন্দু। বাইরে সুন্দর চাঁদ উঠেছে। কিন্তু কুয়াশায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে সব। কলকাতার শীতটা বোধহয় শেষ হয়ে এল এবার। কিন্তু হাওয়াটা বেশ ঠাণ্ডা লাগছে এখন। রাস্তাঘাট এর মধ্যেই ফাঁকা। ঝাপসা কুয়াশার ঘোর।

কিন্তু তাঁর গাড়িটা তো নেই? কোথায় গেল? একটু ভাবেন সুখেন্দু। হাওয়া নেবার কথা বলেছিল একবার ড্রাইভার। তাঁর দেরি দেখে সেখানেই গেল কি? চায়ের গ্লাস নিয়ে বসেও পড়তে পারে, গ্যারাজের ধাবায়।

শ্রীমন্তকে ডেকে খোঁজ নিতে পাঠালেন সুখেন্দু। পরে তিনি নিজেই পায়ে পায়ে হাঁটেন একটু। গরদের পাঞ্জাবির ওপর গরম জহর কোট। তবু যেন শীত শীত লাগছে। বাঁ দিকের গলিতে চোখ পড়ে হঠাৎ। ছায়া মূর্তির মতো একটা শরীর তাঁকে দেখে যেন দ্রুত সরে গেল। দত্তভিলার পিছন দিকের জঙ্গল থেকেই বেরোচ্ছিল। হঠাৎ তার মধ্যেই সর সর করে ফিরে গেল আবার।

পিছন পিছন সুখেন্দুও এগোলেন একটু। পরে থমকে দাঁড়ালেন। না, একা যাওয়া ঠিক হবে না।

দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেন। কিন্তু লোকটা কে? কেনই বা পালাল তাঁকে দেখে? তবে কি দেবদত্তর অনুমানই ফলতে চলেছে? হাত করতে চাইছে কেউ পাগলাকে?

সামনে নিস্তব্ধ কুয়াশা মাখা জঙ্গল। বুধু পাগলার নাটক শুরু হয়ে গেছে: পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?

চমক লাগে সুখেন্দুর। কিন্তু ততক্ষণে ড্রাইভার হর্ন দিচ্ছে পিছনে। গাড়িতে উঠে অনেকক্ষণ চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন সুখেন্দু। বুধু পাগলার গলাটা ভাসছে কানে, পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ?

দেবদত্ত চ্যাটার্জিকে একবার খবরটা দেবার কথা ভাবেন।

অনেক রাত অবধি ঘুম আসে না পল্লবীর চোখে। কেন, সে জানে না। জানলায় মুখ রেখে নিস্তব্ধ বাড়িতে সে একা দাঁড়িয়ে। জঙ্গলের ওপারে আস্তে আস্তে চাঁদটা ডুবে যাচ্ছে। হঠাৎ বুধু পাগলার সাড়া পাওয়া যায়। ভাঙা গলায় গুনগুন করে গেয়ে উঠল, একা মোর গানের তরী···ভাসিয়াছিলাম নয়ন জলে···

বড় মন উদাস করা সুর। কিন্তু দু লাইন গেয়েই বুধু থেমে গেল। একেবারে চুপ।

একটু অপেক্ষা করে পল্লবী বলল, ও বুধুদা থামলে কেন? গানটা শোনাও আমাকে। আমি শুনছি যে—

বুধু আর সাড়া দেয় না। তারপর হঠাৎ গেয়ে উঠল।

—ঝুম ঝুম ঝুম···ঝুম ঝুম ঝুম··

—এটা কেন? আগে যেটা গাইছিলে।

—ওটা ভাল না, দুঃখের গান।

—তাতে কী হয়েছে?

—তোমার কোনও দুঃখ নেই?

পল্লবী চুপ। বুকের ভেতরটা যেন ছমছম করে কাঁপে। এ কি প্রশ্ন পাগলার মুখে! মাথা নামিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ।

কিন্তু আর কোনও কথা বলে না পাগল। সাড়াও দেয় না।

সামনে নিস্তব্ধ জমাট অন্ধকার। এক গভীর দুঃখের মতোই যেন জড়িয়ে ধরছে পল্লবীকে চারদিক থেকে।

৫

সমস্ত রাস্তাটাই গভীর চিন্তায় ডুবে থাকেন সুখেন্দু।

গাড়ি চলেছে হু হু করে। ফাঁকা রাস্তা। ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা ঢুকছে দু পাশ থেকে। কোনও খেয়াল নেই। আঙুলে ধরা জ্বলন্ত বিদেশি সিগারেটটাও পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। টানতে ভুলে যাচ্ছেন।

রাস্তার আলোগুলো কুয়াশার মধ্যে মুখ ডুবিয়ে কেমন এক রহস্যময় চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে। পাগলার গলাটা মনে আসে; পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ? হঠাৎ যেন নাড়া দেয় কথাটা মনের মধ্যে। হয়তো কিছুই ভেবে বলে না সে। তবু কেমন যেন মনে হয়।

জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়া লোকটা কি শেষ পর্যন্ত পাগলার কথা শুনেই সতর্ক হয়ে পালিয়ে গেল? নাকি অন্য কোনও কারণ?

ফাঁকা মাঠের পাশ দিয়ে চলেছে গাড়ি। মাঠভরা কুয়াশার ঘোর। একটুখানি গিয়েই দৃষ্টিটা আটকে যায়। দূরের রাস্তাগুলোও ঢেকে যাচ্ছে ক্রমশ। ফগ লাইটটা জেলে দিতে হয়। সুখেন্দুর মনের মধ্যেও এমনি এক কুয়াশাভরা চিন্তার

স্রোত। কিছুই ভাবতে পারছিলেন না ঠিকঠাক। ছাড়া ছাড়া এক একটা গোপন দৃশ্য। পাগলের প্রলাপের মতো অসংলগ্ন। একই সঙ্গে চাপা এক আতঙ্ক আর কণ্ঠ। অনিশ্চয়তা। সব মিলিয়ে অদ্ভুত এক অনুভূতি।

ভাবলেন, ফিরে গিয়েই একবার দেবদত্তের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলবেন। একটা অ্যাপয়েন্টমেণ্ট চাইবেন, যদি সম্ভব হয়। কথাটা খুবই জরুরি। মুখোমুখি বসেই বোধ হয় একবার আলোচনা দরকার।

খাওয়া দাওয়ার পর দেবদত্ত একখানা বিদেশি চিত্রকলার বই নিয়ে পাতা ওল্টাচ্ছিল। সুন্দর একগুচ্ছ পেইন্টিং-এর সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করে। বিশ্বজোড়া নাম এর এক একটি ছবির। ছাত্রজীবন থেকেই শুনে আসছে। খুব মনোযোগ দিয়ে সে দেখছিল, এখন এর খুঁটিনাটিগুলো। চিত্রকরের নাম, ছবির ক্যাপশন, কোন পরিস্থিতিতে এবং কীভাবে রচিত হয়ে উঠেছিল এই অমূল্য শিল্প। পিকাসোর অদ্ভুত রেখার ব্যবহারের সঙ্গে মাতিসের রং ও মেজাজের কী পার্থক্য। আদিম প্রবৃত্তির তাড়নায় কীভাবে উদ্দাম হয়ে ওঠে পিকাসোর শরীর, ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় যেন কী এক চাপা নিষ্ঠুরতায় পিকাসোর নারী…

এমন সময় হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল।

দেবদত্ত বইটা মুড়ে রিসিভার তুললেন।

—হেলো।

—দেবদত্ত চ্যাটার্জি ?

—কথা বলছি।

—আমি সুখেন্দু বোস।

—ও ! গুড ইভনিং মিঃ বোস। কী খবর। এত রাতে ? নতুন কিছু ঘটল নাকি আবার ?

—হ্যাঁ মিঃ চ্যাটার্জি। একটা অদ্ভুত কাণ্ড হয়েছে।

—বলুন, বলুন। ব্যাপারটা কী ?

—দত্তভিলার পিছনে একটা লোক দেখা গেছে আজ। জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল আমাকে দেখে।

—তারপর ? আর কোনও ট্রেস পাওয়া যায়নি ?

—না।

—আপনার সঙ্গে আর কে ছিল ?

—কেউ না। আমি একাই দেখেছি।

—লোকটাকে চিনতে পারলেন ?

—না, মুখ দেখিনি। অন্ধকারে কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেল। মাথায় মনে হয় টুপি ছিল একটা। কান মুখ গলা সবই ঢাকা লাগছিল।

—সেই পাগল লোকটা ছিল না আজ ?

—ছিল। একটু পরই তার কথা শোনা গেছে।

—তাড়া করল না, আগন্তুককে ?

—না। অন্ধকারের মধ্যে শুধু শোনা গেল ; পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ ? কিন্তু কাকে বলল, কেন বলল, কিছুই বোঝা গেল না।

—স্ট্রেঞ্জ ! ভেরি স্ট্রেঞ্জ।

—দেবদত্ত মনে মনে ভাবে একটু ছবিটা। সতর্কবাণী ? উপহাস ? না নিতান্তই স্বগতোক্তি !

পরে বলল, রাত কটা হবে তখন মিঃ বোস ?

—ঘড়ি দেখিনি। তা আন্দাজ দশটা হবে।

—এত রাতে আপনি ওই জঙ্গলের কাছে কেন গিয়েছিলেন মিঃ বোস ? ডোনট টেক ইট আদারওয়াইজ প্লিজ, ইনভেস্টিগেশানের জন্যে এটা কিন্তু আমার জানা দরকার।

—ও হ্যাঁ নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আমি সব কিছুই খুলে বলব আপনাকে। কিন্তু সব কথা টেলিফোনে হওয়া সম্ভব নয়। তার জন্যেই আপনার একটা অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট চাইছি, কাল।

—কাল ?

—হ্যাঁ কাল সকালের দিকে। ধরুন এই নটা নাগাদ।

একটু ভাবল দেবদত্ত। ডায়েরিটা একটু দেখা দরকার। রাতুলের নোটবুকটাও। বলল, একটু ধরুন, ডায়েরিটা দেখি আগে।

চটপট উল্টে দেখে পাতাগুলো। রাতুলের আঁকিবুকি করা খাতাটাকে। না, সকাল দশটা সাড়ে দশটা পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে টাইম দেওয়া যায়।

বলল, ঠিক আছে, চলে আসুন।

—ধন্যবাদ মিঃ চ্যাটার্জি। আইল বি কামিং শার্প অ্যাট নাইন ও ক্লক্। গুড নাইট—

—গুড নাইট।

টেলিফোন রেখে দিল দেবদত্ত।

রাত বারোটা বাজতে আর মিনিট কুড়ি মাত্র বাকি। দেবদত্তর এখন ঘুমিয়ে পড়ারই কথা। কিন্তু হঠাৎ যেন গোলমাল হয়ে গেল। টেলিফোনটা এসে পড়েই সব ওলটপালট করে দিল। নতুন এক চিন্তা এসে ঘুরতে থাকে মাথার মধ্যে। এত তাড়াতাড়ি হঠকারীর মতো কেউ এভাবে এসে চেষ্টা করবে ? ঠিক ভাবতে পারে না।

ঘুমোবার আগে ছবির বইটাই টেনে নিল আবার। একটা পাতা ওল্টাতেই ভাঙা

চোরা এক নগ্ন নারীর শরীর। যেন নিঃশব্দে আর্তনাদ করে উঠছে সমস্ত সত্তা জুড়ে। তীব্র উন্দাম এক আর্তনাদ। দেখতে দেখতে তার চোখের সামনে রেখাগুলো ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। আলাদা হয়ে অন্যরকম এক একটা আদল নিতে থাকে মুখের··· পল্লবী···রাজেশ। ঘুরতে ঘুরতে আবার পাল্টে গেল। সুখেন্দু···লম্বাটে উদ্ধত নাক।···ছায়া ঘন অন্ধকারের ওপরে রহস্যময় এক নারী মূর্তি···

···এপারে পরিক্ষিৎ সুগোল, চাপা অহঙ্কার। পুরন্দর ভাবলেশহীন, ভরাট মুখ। কর্তাবাবু···চশমার আড়ালে চোখ দুটো আড়াল করে নিজেকে। পাগলা··· অন্ধকারে অবয়বহীন। জঙ্গলের আগন্তুক ? ছায়ামূর্তি ? মাথায় টুপি, কান গলা মুখ ঢাকা···

ভেঙেচুরে তালগোল পাকিয়ে ঘুরতে থাকে মুখগুলো যেন চোখের সামনে। সব মিলিয়ে এক জটিলতম আদিম ছবি। কিন্তু জট পাকানো এই নকশার মূল সূত্রটি কোথায় ? কোথায় ? কোনটা কার আসল মুখ ?

কোনটা কার আসল পরিচয় ? জানতে হবে···

ছবির কথাটা কল্পনা করতে করতেই অবশেষে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে দেবদত্ত।

সুখেন্দুবাবুর সময়জ্ঞান কিন্তু প্রশংসা করবার মতো। ঠিক নটা বাজতে না বাজতেই ডোর বেল বেজে উঠল নীচে।

—অ্যান্ড দেয়ার হি কামস্। বলে উঠল দেবদত্ত।

সে আর রাতুল তৈরি হয়ে অপেক্ষাই করছিল এর জন্যে। দুজনে মিলে নিজেদের মধ্যে খানিক আলোচনাও করে নিয়েছে ইতিমধ্যে।

রাতুল নীচে গিয়ে অতিথিকে অভ্যর্থনা করে ওপরে নিয়ে আসে।

—আসুন, আসুন মিঃ বোস, আমরা আপনার জন্যেই বসে আছি। দেবদত্ত উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়াল।

—থ্যাঙ্ক য়ু মিঃ চ্যাটার্জি, থ্যাঙ্ক য়ু ভেরি মাচ।

—য়ু আর মোস্ট ওয়েলকাম। বলুন কী চলবে আপনার, চা না কফি ?

—আপনাদের যা পছন্দ। সুখেন্দুবাবুকে যেন একটু বিমর্ষ দেখায় আজ।

—সনাতন— চা। দেবদত্ত হাঁক দিল পাশের ঘরের দিকে তাকিয়ে।

রাতুল তার ডায়েরিটা খুলে নিয়ে বসল যথারীতি।

দেবদত্ত বলল, মিঃ বোস, আপনি খুব ঘাবড়ে গেছেন মনে হচ্ছে। এত ভাববেন না। ইট্স্ অল ইন এ গেম। এটা এমন কোনও ব্যাপার নয়।

—সেইজন্যেই আপনার কাছে আসা মিঃ চ্যাটার্জি। সত্যি বলতে আমি কাল থেকে একটুও স্বস্তি পাচ্ছি না মনে।

—ঠিক আছে, আমি বুঝতে পারছি। আপনি আমাকে এবার খুলে বলুন তো

পুরো ব্যাপারটা। যা যা ঘটেছিল কাল। কতক্ষণ আপনি ওখানে ছিলেন, কী কী দেখেছেন—অল ইন ডিটেইলস্। কিছু বাদ দেবেন না কিন্তু।

—না না। আমি সব বলছি আপনাকে।

কথার মধ্যেই চা এসে গেল।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বর্ণনাটা শুরু করেন সুখেন্দু। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সব কথাই বলেন। কোথাও কোনোও অস্বাভাবিকতা দেখেন নি। শুধু পোড়ো বাড়ির পিছনে ওই লোকটি ছাড়া। সরাসরি দেখেছেন তাও নয়। হঠাৎ খেয়াল হল, তাকে দেখেই সে মিলিয়ে গেল অন্ধকার জঙ্গলে। সঙ্গে কাউকে পেলে অবশ্য তিনিও ধাওয়া করতেন। কিন্তু ক্ষিতি, পুরো ওরা কেউ নেই। সরকার মশাই বা শ্রীমন্তকে ঠিক ভরসা করা যায় না এ কাজে···পন্নগবাবু বুড়ো মানুষ···

—আচ্ছা, আপনি ও বাড়িতে গিয়েছিলেন ঠিক কখন? দেবদত্ত যেন থামিয়ে দিল বর্ণনাটা।

সুখেন্দু বললেন, তা ধরুন সাড়ে পাঁচটা ছটা।

—তার মানে প্রায় চার ঘণ্টা। বেশ অনেকক্ষণই ছিলেন।

সুখেন্দু যেন অপ্রস্তুত একটু। বললেন, পল্লবীর গান শুনলাম বসে বসে। সেই ঘটনার পর এই প্রথম শুনলাম ও মনপ্রাণ দিয়ে গান করছে। বেশ ভাল লাগছিল। স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল ওকে। মথুরাবাবু চলে গেলে ওর সঙ্গেই বসে গল্প করলাম অনেকক্ষণ। চা-টা খাওয়া হল। ক্ষিতির স্ত্রী মৌলিও এসে বসল খানিক। লাবি একটু তার নতুন পিয়ানো বাজনা শোনাল। আসলে ক্ষিতির জন্যেই আরও অপেক্ষা করছিলাম।

—তার মানে, আপনি আর একটু আগে উঠে পড়লে, লোকটার সঙ্গে আপনার দেখা নাও হতে পারত··· দেবদত্ত নিজের মনেই বলে, মোটামুটি একটা আদল চোখে পড়েছে তো নিশ্চয়ই চেহারাটার?

—হ্যাঁ, তা বলতে পারেন।

—যদি একজনকে দেখেন এখন, কাছাকাছি চেহারার, ধরতে পারবেন এর সঙ্গে আদলটা মেলে কি না?

—খুবই গোলমেলে ব্যাপার। কুয়াশার মধ্যে এমন মিলিয়ে গেল···। তবু কাঠামোটা মনে আছে। চওড়া কাঁধের চেহারায় কিছু বিশেষত্ব ছিল যেন।

—গুড, ভেরি গুড। তাহলে শুনন, রাতুলের খবর অনুযায়ী, ভুট্টা বলে রাজেশের দলে কে একজন আছে, সেই নাকি ভার নিয়েছে দত্তভিলা অপারেশনের।

—ভুট্টা! নামটা শুনেছি আমি সুরেশের কাছে। ভুট্টা আর শিশির এই দুটো রাফ এলিমেণ্ট আছে ওর ট্রুপে। ইয়েস, আই রিমেম্বার।

—এক কাজ করুন না। সেই আগের মতোই শাস্ত্রীকে দিয়ে দলটাকে একটা পার্টিতে বসান না। খুব খাওয়া দাওয়া হোক। তাহলেই কাজটা হয়ে যায়।

—কী হবে ?

সোজাসুজি ভুট্টাকে নিজের চোখে দেখবেন সামনে বসে। আর আমরাও এই সুযোগে মুখোমুখি অবজার্ভ করে নেব দলটাকে।

—আপনার কি মনে হয় ভুট্টাই গিয়েছিল ওখানে ?

—এখন সবই অনুমান। কোনও কিছুই নিশ্চিত নয়। তাছাড়া এও জানি, পাগলার কাছে যে কোনও লোকের পক্ষেই যাওয়া রিস্কি।

—তবু হয়তো চেষ্টা করে দেখছে, এই পথেই যদি খবর টবর কিছু পাঠানো যায় ভেতরে। রাতুল বলল হঠাৎ।

—আশ্চর্য নয়। তবে আমি নিজেই একবার পাগলার সঙ্গে কথা বলতে যাব ভাবছি। যে কোনও দিন। দেবদত্ত মন্তব্য করে।

—সে কি! আপনি যাবেন ওখানে ? সুখেন্দুর প্রশ্ন।

—হ্যাঁ, গেলে মন্দ কি ? কিন্তু তার আগে আপনি রাজেশের দলটাকে একবার ম্যানেজ করার চেষ্টা করুন দেখি। টেলিফোন করে দেখুন না একবার শাস্ত্রীকে। হাত দিয়ে টেলিফোনটা দেখায় দেবদত্ত।

সুখেন্দু টেলিফোন করেন সুরেশকে। খুবই অনুগত আর বিশ্বস্ত লোক তাঁর। একটু পরেই গলা পাওয়া গেল ফোনে।

—সুরেশ ; বোস স্পিকিং দিস সাইড।

—কহিয়ে মালিক। অর কোই কাম ?

—হ্যাঁ সুরেশ। আই ওয়াণ্ট য়ু টু ডু দ্য সেম থিং, ওয়ান্স্ এগেইন!

—মতলব ?

—ওই দলটাকে তুমি আর একবার বসাও পার্টিতে। ভুট্টা, শিশির সব— পুরা ট্রুপ ধরে। প্রাণভরে মদ গেলাবে সবাইকে। টাকার জন্য কোনও চিন্তা করবে না। অ্যাণ্ড অফকোর্স ইউ উইল গেট ইয়োর শেয়ার। আণ্ডারস্ট্যাণ্ড ?

—ফির ওহি জাসুসি কা কাম। ক্যা হো গিয়া আপকো সাব ?

—শোনো ব্যাপারটা খুবই আরজেণ্ট। তুমি ইচ্ছে করলেই কিন্তু পারবে।

—ঠিক হ্যায়, কোশিস করেঙ্গে হাম। লেকিন, কোই আচ্ছা বাহানা তো ঢুঁড়নে হোগা।

—ফিল্মের লোক সাজাও না কাউকে, বম্বে ফিল্মের নতুন এক প্রোডিউসার। যে, মিউজিক্যাল হ্যাণ্ডস, প্লে ব্যাক সিঙ্গার— এ সবের জন্য ফ্রেশ টিম খুঁজছে একটা। খালি অ্যাকটিং করতে হবে একজন হবু প্রোডিউসারের— টলি ক্লাবের ভিনায়ককে বলো না। খুব ভাল পারবে।

—আয়, হ্যায়! আপকো কোই জবাব নেহি বোস সাহাব। হো জায়েগা। লেকিন আমাদের ক্লাবে তো ওসুবিধা হবে।

—এক কাজ করো, গ্র্যান্ডে নিয়ে এস। শেরাজাদি ক্লাবে। ডান্সিং ফ্লোরের পশ্চিম দিকে বসবে তোমরা। আমি আমার বন্ধুর সঙ্গে বার কাউণ্টারের দিকে থাকব।

—ওরা রাজি হবে, তব না ?

—হবে সুরেশ। বম্বে ফিল্মের লোক শুনলে ওরা ল্যাং ল্যাং করে ছুটে আসবে। তুমি মিলিয়ে নিয়ো আমার কথা। এখনই একবার ফোন করে দেখ না, রাজেশকে পেয়ে যাবে।

—ঠিক হ্যায়, সাব।

—হ্যাঁ, আর শোনো, অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করেই রিং ব্যাক করো আমায়— এই নাম্বারে। নাম্বারটা নোট করে নাও একটু।

দেবদত্তর নাম্বারটা লিখিয়ে দিয়ে হাসিমুখে আবার এসে বসলেন সুখেন্দু।

—ওয়াণ্ডারফুল মিঃ বোস! আপনার উপস্থিত বুদ্ধির তারিফ না করে পারছি না।

সুখেন্দু হাসেন আত্মতৃপ্তিতে। পকেট থেকে দামি বিদেশি সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে ধরলেন সামনে। লাইটার জেবলে ধরিয়েও দিলেন। পরে সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে ঠাট্টা করে বললেন —আপনার পাশে আছি বলেই হয়তো মাথাটা খুলে গেল।

—কিন্তু আমার মাথাটাই যে ঘুরিয়ে দিয়েছেন। রিয়েলি য়ু হ্যাভ ডান ইট ভেরি ওয়েল। দেবদত্ত হাসতে হাসতে বলে।

ফোন বেজে উঠল একটুক্ষণ পরেই। সুখেন্দুই ধরলেন উঠে। দু চারটে কথার পরই দেবদত্তর দিকে ফিরে বললেন, যা অনুমান করেছিলাম! পার্টি রেডি। আজই বসতে চায় সন্ধেবেলায়।

—ভিনায়ককে আমিই তুলে নেব। কী বলব এখন ?

—ঠিক আছে রাজি হয়ে যান। আজকেই হবে। দেবদত্ত বলল।

সুখেন্দু বললেন ফোনে কথাটা সুরেশকে।

—ফাইন্যাল সুরেশ। সেভেন ওক্লক আট শেরাজাদি। ও কে ?

—ও কে স্যার।

প্রথম বসন্তের হাওয়া দিয়েছে আজ কলকাতায়। শেরাজাদি ক্লাব পানবিলাসীদের ভিড়ে জমজমাট এখন।

নাচ শুরু হয়ে গেছে। লাল ফোকাস পড়েছে ফ্লোর জুড়ো মাঝখানে বিকিনি পরা দুই বিদেশিনী নাচতে নাচতে গান গাইছে। মখমলের মতো সবুজ বিস্তৃত লন চারদিকে। হালকা-আলোর মধ্যে ছোট ছোট টেবিল চেয়ার পাতা। মাঝে মধ্যে ছোট ছোট ঝাঁকড়া গাছের ঝোপ। রঙিন টুনি বালব দিয়ে মোড়া। রঙিন জলের

ফোয়ারা। দু পাশে দুটো শ্বেত পাথরের জলপরী। হালকা হলুদ আভার মধ্যে সব মিলিয়ে যেন স্বপ্নের মতো মনে হয় পরিবেশটাকে। সুসজ্জিত নারী পুরুষের দল। তাদের গুঞ্জন, চাপা হাসির শব্দ, সবই যেন স্বপ্নের মতো অবাস্তব।

সুখেন্দুবাবুরা এ পাশে বার কাউন্টারের দিকে। একটু অন্ধকারের মধ্যে। আর ওদিকে ডান্সিং ফ্লোর ঘেঁসে ওরা আলোর মধ্যে। একটা ঝোপের পাশে। শাস্ত্রী আর ভিনায়কের সঙ্গে পুরো দলটা। পরিষ্কার নজরে আসছে।

খুব জোর গল্প আর হাসি ঠাট্টায় মেতে আছে সবাই। ঘন ঘন স্কচের বোতল উপুড় করে যাচ্ছে তকমা আঁটা বেয়ারা। অর্ডারের পর অর্ডার যাচ্ছে খাবারের। হিমসিম খেয়ে উঠছে যেন লোকগুলো।

নীল জ্যাকেট পরা রাজেশ বসেছে ভিনায়কের পাশে। হিন্দী সিনেমার নায়কের মতোই দেখাচ্ছে যেন। পোশাকটা সুন্দর মানিয়েছে এই পরিবেশে। হাতে গ্লাস নিয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে খুব ভারিক্কি চালে কথা বলে যাচ্ছে। হাসছে হা-হা করে।

অনেকক্ষণ পর সুরেশ একবার উঠে এল এদিকে। টয়লেটে যাবার পথেই যেন চেনা লোক দেখে দাঁড়িয়ে গেল। সুখেন্দুর দিকে চোখ টিপে দুপাশের দাড়িতে হাত বোলাল একবার। চুপি চুপি ইঙ্গিতে বলল, ভুট্টা। তারপর দুপাশে হাত ফুলিয়ে শরীরের আয়তনটা দেখিয়ে, দুই জুলপিতে হাত টানল, এবার বোঝাল, শিশির। অর্থাৎ মোটা জুলপিঅলা ওই ছেলেটা, শিশির। আর দাড়িওলার নামই ভুট্টা। ইঙ্গিতটা করেই সে টয়লেটের দিকে চলে গেল।

দেবদত্ত কানের কাছে মুখ এনে বলে, মিঃ বোস এবার দেখুন তো মিলিয়ে।

সোজাসুজি দেখতে থাকেন সুখেন্দু। চাপ দাড়িঅলা একজনই আছে—ভুট্টা। কিন্তু এ যে রোগা ডিগডিগে চেহারা। না, এর সঙ্গে কোথাও মেলে না। আর জুলপিঅলা তাগড়া শিশির—খুবই বেঁটে। হরলিক্সের শিশি প্রায়। না না, এও হতে পারে না।

দেবদত্তও তাকিয়ে আছে প্রখর দৃষ্টিতে। একবার বলল, এদের কাউকে কি মনে হচ্ছে আপনার?

—যতদূর মনে হচ্ছে, না। কোনও মিল পাচ্ছি না।

—আই সি। দেবদত্ত ভাবে একবার কথাটা।

হঠাৎ রাজেশ ঠাকুর একসময় উঠে পড়ল টেবিল ছেড়ে। টয়লেটে যাবার জন্যেই হয়তো। কিন্তু যেতে যেতে সোজাই এগিয়ে এল এদিকে। পা দুটো টলছে বেশ। তার মধ্যেই ঠিক দেখে ফেলেছে সুখেন্দুকে।

সামনে এসে কোমরে হাত দিয়ে নায়কের মতো দাঁড়াল, কী খবর বোস সাহাব? কাজটা কিন্তু ভাল করলেন না, আমার সঙ্গে—। আমি বলে দিচ্ছি, পস্তাতে হবে এর জন্যে পরে—। শালা পুলিশ, কতদিন বাঁচাবে আপনাদের...

দেবদত্ত হঠাৎ গলা চড়িয়ে উঠে দাঁড়ায় এবার, স্টপ ইট, আই সে। ডোনট ডিসটার্ব আস, প্লিজ মুভ অন—।

একজন উর্দিপরা পালোয়ান বেয়ারা এসে ধরে নেয় রাজেশকে। রাজেশ চলে যায়।

কিন্তু একটু গিয়েই টলতে টলতে আবার ফিরে আসে। বুক চাপড়ে জড়ানো গলায় বলে, আমাকে মেজাজ দেখাবেন না। ম্যায় ঠাকুর হুঁ।

বলতে বলতেই আচমকা জ্যাকেটের ভেতর থেকে রিভলভার টেনে বার করে। বার করেই গুলি ছুঁড়ল। কেউ কিছু বোঝার আগেই ঘটনাটা ঘটে গেল। পর পর দুবার গুলির শব্দ। লোক পালাতে থাকে দুপাশ থেকে। চিৎকার চেঁচামেচি, হল্লা।

কিন্তু নিশানা ঠিক নেই ঠাকুরের। একেবারে বেহেড মাতাল। কাউন্টারের বোতলগুলোই ভাঙল হুড়মুড় করে। তীব্র আলকোহলের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে বাতাসে। চারদিকে প্রচণ্ড হইহট্টগোল। সিকিউরিটির লোক এসে পড়েছে। দুদিক থেকে রাজেশকে জাপ্টে ধরেছে। পুলিশও এসে গেল গুলির শব্দ পেয়ে গেট থেকে।

ফ্লাড লাইট জ্বলে উঠেছে মাথার ওপর? ভিনায়ক আর শাস্ত্রী নেই। ভুট্টা ঘুর ঘুর করছে ভিড়ের মধ্যে।

দেবদত্ত টেবিল ছেড়ে সবাইকে নিয়ে লাউঞ্জের দিকে। সুখেন্দু এখনও হতবাক। শরীরটা কাঁপছে থর থর করে। এখনই যেন এক দুঃস্বপ্ন দেখে উঠলেন।

দেবদত্ত সাহস দেয়, নার্ভাস হবেন না মিঃ বোস। এটা ভালই হল। পুলিশ এসে পড়েছে। অ্যান্ড দে উইল টেক চার্জ অব দ্য হোল গ্যাঙ, নাউ। আমাদের আর মাথা ঘামাতে হবে না কিছুদিন।

সুখেন্দু তবু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকেন। বললেন, শাস্ত্রী?

—শাস্ত্রী আর ভিনায়ক আগেই সরে পড়েছে। আপনাকে দাঁড়াতে হবে না। উঠে পড়ুন গাড়িতে এবার।

তার আগেই রাতুল বসে পড়েছে ভিতরে।

—আপনি কোথায় যাবেন? সুখেন্দু বললেন।

—আপনার সঙ্গে যাব।

দেবদত্ত মাথা নাড়ল, আমি বলেছি মিঃ বোস। ও আজ আপনার সঙ্গে যাবে। ভয়ের কোনও কারণ নেই। তবু একজনের সঙ্গে গল্প করতে করতে যান। অ্যান্ড নো টেনশন প্লিজ।

সুখেন্দু কোনও উত্তর দেন না।

—হ্যাঁ, পারলে কাল বিকেলে একবার আসুন না। কথা হবে।

—কাল? ঠিক আছে। আটটা নাগাদ আসব। সুখেন্দু বললেন।

—তবে, প্লিজ দত্তভিলায় এই ঘটনাটা যেন বলবেন না। খামোকা আতঙ্ক ছড়াবেন না আর।

—না। গাড়ি স্টার্ট নিয়ে বেরিয়ে গেল সুখেন্দুর।

দেবদত্ত একা একাই ভিতরে ঢুকল আবার।

৬

নীল জ্যাকেটের ভিতর থেকে হঠাৎ রিভলভার টেনে বার করে রাজেশ তার দিকে তাক করছে ·· পর পর দুটো গুলি ছুটে এল ··

দৃশ্যটা যেন কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না সুখেন্দু। এখনও যেন চোখের সামনে ভাসছে। আচ্ছন্নের মতো চুপচাপ বসে থাকেন গাড়ির মধ্যে।

রাতুল এক নাগাড়ে কথা বলে যাচ্ছে পাশেঃ এইবার দলটা কীভাবে জব্দ হবে পুলিশের হাতে। দাদা রয়ে গেছে। ক্লাব ম্যানেজারকে দিয়ে ঠিক কেসটা সাজিয়ে দেবে পুলিশের কাছে। মাস্তানি করা যখন তখন বাবুদের, এবার ঘুচে যাবে বেশ কিছুদিনের মতো···

সুখেন্দু কোনও জবাব দেন না। মাঝে মধ্যে শুধু হুঁ হাঁ করে সায় দিয়ে যাচ্ছেন রাতুলের কথায়।

গাড়ি চলেছে ময়দানের পাশ দিয়ে। সুন্দর হাওয়া উঠেছে আজ বাইরে। এখনও ভিড় করে ঘুরছে প্রমোদভ্রমণকারীর দল। তাঁর গাড়ির সামনে দিয়েই হাত ধরাধরি করে রাস্তা পেরিয়ে গেল এক প্রেমিক-প্রেমিকা যুগল। ফুলের মালা হাতে এসে দাঁড়াল একজন, ট্র্যাফিক সিগন্যালের কাছে। রাতুল হুট করে এক তোড়া গোলাপ কিনল কি খেয়ালে।

সুখেন্দুর কোনও হুঁশ নেই। ভাবছেন সব কিছু কেমন আকস্মিক আর অবিশ্বাস্য ভাবে হয়ে গেল পরপর। একটা সাঙ্ঘাতিক কোনও অঘটনও ঘটে যেতে পারত। ভাগিস, সেটা হয়নি। দেবদত্ত চ্যাটার্জি খুবই তৎপর সেদিকে। সময়মতো ঠিক ভিড় কাটিয়ে বার করে আনলেন তাঁকে।

কিন্তু শাস্ত্রী? ভিনায়ক? ওরা দুজন ঠিক মতো পৌঁছোল কি? পেছনে ধাওয়া করবে না তো, আবার ওদের!

সুখেন্দু সিগারেট ধরালেন একটা। পরে রাতুলের দিকে ফিরে বললেন, ডু য়ু স্মোক?

রাতুল হাসিমুখে একটু ইতস্তত করে। ফুলের তোড়াটা রেখে দেয় পিছনে।

—ওহ্ কাম অন ইয়াং ম্যান। হ্যাভ ওয়ান—।

দামি সিগারেটের প্যাকেট খুলে বাড়িয়ে ধরলেন সুখেন্দু। রাতুল হাত দিয়ে একটা আস্তে করে টেনে নিল লাজুক মুখে।

বলল, উইথ ইয়োর পারমিশান, দাদা।

—ও ইয়েস। উইথ প্লেজার। লাইটার জেবলে সামনে ধরলেন সুখেন্দু।

সিগারেটে টান দিয়ে রাতুল হঠাৎ বলল, আচ্ছা দাদা। একটা কথা বলব ?

সুখেন্দু হাসলেন, বলতে আমার পারমিশান লাগবে এখন ? এতক্ষণ যে বললেন সেগুলো ?

—না না, একটা, ব্যক্তিগত প্রশ্ন ?

—ব্যক্তিগত প্রশ্ন ? সুখেন্দু ভুরু কোঁচকালেন। তারপর বললেন, সেটা আবার কী ? শুনি—।

—আচ্ছা, সত্যিই কি আপনি খুব ভয় পেয়েছেন ? দাদা আপনাকে একা ছাড়তে সাহস করল না কিছুতেই ?

—আপনার কী মনে হয় ?

—আমার তো একটু খটকা লাগছে। সেইজন্যেই তো প্রশ্ন।

সুখেন্দু হাসলেন, য়ু আর টু ইন্টেলিজেন্ট রাতুল। আই অ্যাপ্রিশিয়েট ইট। তোমাকে মিঃ চ্যাটার্জি, আয়াম সরি, আপনাকে চ্যাটার্জি—

—তুমি বলুন না, প্লিজ। আমার ভাল লাগবে তাহলে।

—হ্যাঁ, বেশ তাই হবে, তোমাকে যে জন্য আমার সঙ্গে পাঠানো হয়েছে, আই মিন মিঃ চ্যাটার্জি যে অ্যাসাইনমেণ্ট তোমাকে দিয়েছেন, তা আমি বেশ বুঝতে পারছি।

—সেটা কী ? রাতুল অবাক হয়ে বলে।

—আর কিছুই নয়। আমাকে তোমার মতোই হালকা আর খুশি মেজাজে রাখা। কিছুতেই যেন সুখেন্দু বোস টেনশানের পাথরটা মাথায় চাপিয়ে হাঁড়িমুখ করে না বসে থাকে। ক্রমশ সব কিছু সহজ আর স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারে। এই তো ?

রাতুল হা-হা করে হেসে ওঠে।

—এ কী বলছেন আপনি !

—বোধ হয় ঠিকই বলছি। এবং তুমি তোমার কাজে নিশ্চই খুব সাকসেসফুল। এক, তোমার সঙ্গে মুখ বুজে কারও পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। কিছু না কিছু কথা বলতেই হবে।

দুই, অ্যাজ এ কম্প্যানিয়ান য়ু আর অলসো একসেলেণ্ট। মেজাজটা ঠিক বুঝে নিতে পার সঙ্গীর। সেইমতো আলাপটাও সুন্দর চালিয়ে যেতে পার। যেমন শুরু করেছ এখন আমার সঙ্গে।

রাতুল খোলা গলায় হো হো করে হাসে এবার। হাসতে হাসতে বলে, সুখেন্দুদা,

জীবনে এত সুন্দর সার্টিফিকেট কারও কছে কখনও পাইনি। আপনি যদি একটু লিখে দিতেন, আমি বাঁধিয়ে রোজ দাদাকে দেখতাম। যাতে যখন তখন 'ইডিয়েট' শব্দটা মুখ দিয়ে আর বার করতে না পারে।

সুখেন্দুও হাসতে থাকেন এবার রাতুলের বলার ভঙ্গিতে। পরে একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, ঘটনাটা সত্যিই কিন্তু খুব সিরিয়াস হতে যাচ্ছিল। আমি ভয় পেলাম কি পেলাম না, সেটা বড় কথা নয়। ধরো, এই তোমার যদি একটা কিছু হয়ে যেত?

—খেপেছেন? ওই আনাড়ি রাজেশের গুলিতে কথাটা বলতে গিয়ে রাতুল হঠাৎ থমকায়। পাগড়ি বাঁধা গম্ভীর মুখ ড্রাইভারের দিকে চোখ পড়ে।

হঠাৎ সুর পাল্টে নিজের মনে বিড়বিড় করেঃ শুড উই ওপেনলি ডিসকাস দ্য ম্যাটার হিয়ার?

সুখেন্দু বললেন, ইয়েস। হোয়াই নট? হি ইজ ফেথফুল লাইক আ মেশিন।

রাতুল হাঁফ ছাড়ল, যাক। একটা অস্বস্তির হাত থেকে বাঁচা গেল।

সুখেন্দু বললেন, কেন, অস্বস্তি কিসের?

—না এমনিই। আপনার যদি কোনও অসুবিধা থাকে।

—ও নো, নট অ্যাট অল। তুমি স্বচ্ছন্দে বলতে পারো।

—তাহলে যা বলছিলাম দাদা, রাজেশ তো সিম্পলি হিরো সাজার জন্যে ফায়ার করে দেখাল একবার।

—তবু ফায়ারটা তো করল।

—ও সবটাই শো। ম্যায় অমুক হুঁ, ম্যায় তমুক হুঁ, বলে বুক ঠুকে লম্ফ-ঝম্ফ করে যে গুলি চালায়—তার দ্বারা কোনও কাজ হয় না।

—গুলিটা লাগলেই হয়ে যেত। লাগেনি বলেই এখন বলতে পারছ।

—না দাদা, তা নয়। রিভলভার ফায়ারিংটা আমি জানি। অনেক যত্ন করেই শিখেছি। তার কিছু কায়দাকানুন আছে টার্গেট হিট করবার। ব্যাপারটা নিতান্ত ছেলেখেলা নয়।

সুখেন্দু বাইরের দিকে তাকিয়ে কথাটা ভাবতে চেষ্টা করেন। গাড়ি রেসকোর্সের পাশ দিয়ে চলছে এখন। ভিজে চাঁদের আলোয় ভরা শুনশান নির্জন মাঠ। কোথাও কোনও উত্তেজনা নেই, উৎকণ্ঠা নেই। নিস্তব্ধ ঝিম ধরা প্রান্তর।

রাতুল বলেই চলেছে. আসলে কী জানেন সুখেন্দুদা, ইংরেজি কাউবয় মার্কা ছবি দেখে দেখে মগজটা বিগড়ে গেছে ওদের। ভাবে, ট্রিগার টানলেই বুঝি পর পর লাশ পড়ে যাবে। তার আগে যে নিশানা ঠিক করে লাইনে চোখ আনতে হয়, নিশ্বাসটা কন্ট্রোল করতে হয়, তবেই না'

—তা ঠিক। সুখেন্দু মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

তাঁর মনে পড়ে গেল সেই ঘোড়াটার কথা—'কাউবয়'। তিনি আর পরিক্ষিৎ

দুজনে একসঙ্গেই খেলেছিলাম এখানে। দারুণ আপসেট রেজাল্ট হয়েছিল, কেউ কল্পনাই করতে পারেননি। টিপসটা ছিল অশ্বিনীবাবুর···

—তাছাড়া, কি জানেন দাদা, নিশানা ওর এমনিতেই ঠিক থাকত না। একটা বেহেড মাতাল, পা দুটো টলছে, দৃষ্টি ঝাপসা ও কী করবে আমাদের? তার ওপর বম্বে সিনেমার টোপ ফেলে মুণ্ডুটা তো আপনি আগেই ঘুরিয়ে দিয়েছেন—বলুন?

সুখেন্দু মাথা নাড়লেন, হবে হয়তো। শাস্ত্রী আরও ভাল বলতে পারবে। ভিনায়ককে দেখিয়ে কত গল্প বানিয়েছে—কে জানে।

—একজ্যাক্টলি। আমিও তাই বলছি। রাজেশ ঠাকুর তখন বম্বের 'রাজেশকুমার বনে গিয়েছিল। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে কথা বলার কায়দাটা দেখলেন না? রিভলভার টেনেই ঠাঁ-ঠাঁ ফায়ারের ভঙ্গিটা?

সুখেন্দু চুপচাপ বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকেন। পরিষ্কার জ্যোৎস্না রাত। হালকা কুয়াশা জমতে শুরু হয়েছে এবার একটু একটু করে। মনে মনে শাস্ত্রীর কথা ভাবেন। শাস্ত্রী ভিনায়ক দুজনেরই কথা। ওরা ঠিকমতো বাড়ি পৌঁছোল কি?

—গাড়িটা এবার বাড়ির সীমানায় ঢুকে পড়ল সুখেন্দুর। খোলামেলা পরিবেশের মধ্যে বিশাল একটা তিনতলা বাড়ি। চাঁদের আলোয় ধবধব করছে সাদা রঙটা। দুদিকে ফুলের বাগান। সবুজ ঘাসের লন। বাইরে থেকে ভাবাই যায় না, এখানে এমন সুন্দর আর শৌখিন একটা বাড়ির কথা।

গাড়িটা লন পেরিয়ে একেবারে পোর্টিকোয় এনে পার্ক করাল ড্রাইভার। ইঞ্জিন বন্ধ করে বাইরে এসে দরজা খুলে দাঁড়াল সাহেবের। সেলাম ঠুকল সামরিক ভঙ্গিতে। সুখেন্দু মাথা ঝুঁকিয়ে নামলেন ধীরে ধীরে।

একটা সুন্দর কফি কালারের আইরিশ সেটার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসে কোথা থেকে। মনিবের সাড়া পেয়েই এল। দারুণ গর্জাস দেখতে কুকুরটা। ঝাঁপিয়ে পড়ে কুঁই কুঁই শব্দে আদর শুরু করে তাঁকে।

সুখেন্দু ঝুঁটি ধরে নাড়া দিলেন, ও কে, ইটস অল রাইট জিম। ঠিক আছে। এবার যাও। আপস্টেয়ার্স—কুইক!

রাতুলের দিকে ফিরে বললেন, এসো রাতুল, একটু বসবে চলো—।

রাতুল হাত জোড় করল, আজ আর হচ্ছে না সুখেন্দুদা। আর একদিন—।

—সে কী! আর একটুও কম্প্যানি দেবে না আমাকে?

—ডিউটি শেষ। রাতুল হাসল, আর পারমিশান নেই। এখনই ফিরতে হবে দাদার কাছে।

—কিন্তু প্রথম আমার বাড়িতে এলে, একটু বসে না গেলে···

—সরি, ভেরি সরি সুখেন্দুদা। একটু বসলে তো মন ভরবে না। আর একদিন

ভাল করে বসা যাবে বরং। এখনই দাদার খোঁজে যেতে হবে আগে। হয় গ্র্যান্ডে না হয় থানায়, আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে দাদা।

—আই সি! গাড়িটা তাহলে ছেড়ে দিয়ে আসুক তোমাকে।

—না। আমাকে ট্যাক্সি নিয়েই ফিরতে হবে। অর্ডার—।

সুখেন্দু হাসলেন, বেশ। তবে এসো ভাই। গুডনাইট—

—গুডনাইট দাদা। রাতুল পিছন ফিরল।

একটু যেতেই সুখেন্দু ডাকলেন পিছন থেকে—আরে, তোমার ফুলের তোড়াটা যে রয়ে গেল গাড়িতে, দাঁড়াও, দাঁড়াও—

রাতুল হাত নাড়ল মুখ ফিরিয়ে, ওটা আপনার গাড়িকেই দিলাম।

সুখেন্দু হাসলেন, মাই গুডনেস! কোনও যুবক একটা মোটরগাড়িকে কখনও গোলাপ উপহার দেয় নাকি?

রাতুলও হেসে উঠল শব্দ করে, ঠিক আছে সুখেন্দুদা, তাহলে এই গাড়িতে প্রথম যে নারী উঠবে, আমার হয়ে ওটা আপনিই তাকে উপহার দিয়ে দেবেন। নামটাও বলে দেবেন প্লিজ।

বলেই হাসতে হাসতে সে গেটের বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল। সুখেন্দু তাকিয়ে থাকেন। সুদর্শন সপ্রতিভ ছেলেটিকে খুব মনে ধরে তাঁর।

সুখেন্দু রাত্তিরে আর একবার ফোন করলেন শাস্ত্রীকে। বাড়িতে ফিরে দুবার করেছেন এর আগে। কিন্তু সুরেশকে পাননি! একটু চিন্তাই হচ্ছিল মনে মনে। এবার হঠাৎ সাড়া পাওয়া গেল।

—হ্যালো বোস সাব! হাঁ, হাঁ। নেহি, হাম শোচভি নেহি সকা।

—আয়াম সরি সুরেশ। আমিও ভাবতে পারিনি, এমন একটা কাণ্ড করে বসবে ও।

—আপকা কেয়া কসুর হ্যায় ইসমে। ক্লাব পার্টিমে অ্যায়সা তো হোতাই হ্যায়। হামারা হিঁয়া ভি তো একদফে হুয়া—ইয়াদ হ্যায় না আপকো?

—মনে আছে সুরেশ। কিন্তু আজ যে আমার জন্যেই তোমরা জড়িয়ে পড়লে।

—নেহি হুজুর, অ্যায়সা মাত শোচিয়ে। আপ লোগ সব ঠিকঠাক তো হ্যায়? কিসিকো চোট তো নেহি পোঁছা?

—না না, আমরা সবাই বহাল তবিয়তে আছি। তোমাদের জন্যেই চিন্তা করছিলাম। পর পর দুবার ফোন করেছি তোমাকে বাড়িতে এসে।

—ওহ্ হো। আমি ভিনায়কজির বাড়িতে ছিলাম, স্যার।

—ভিনায়ক ঠিক আছে তো?

—বিলকুল শাহি সালামত। লেকিন ডরে হুয়ে হ্যায় বহত। একদম নার্ভাস পার্টি। বলছেন, ম্যায় ফাঁস গিয়া। ফাঁস গিয়া—

—কেন এত ভয় কীসের ?

—বলছেন, এখন নাকি সবাই, খোঁজ করবে, কাঁহা গিয়া উও প্রোডিউসার ? কাঁহা ভাগা—

—পাগল নাকি ! ঠিক আছে সুরেশ, আমি কাল দেখা করব ওর সঙ্গে। ভয়ের কিছুই নেই।

—তো হামারা কাম ক্যায়সা রহা সাব ? জাসুসি কা কাম ?

—একসেলেণ্ট !

—থ্যাঙ্ক য়ু স্যার। আপনি তো আমাকে একদম পাক্কা জাসুস বানিয়ে দিলেন।

—এটা তো তোমার লাইনেরই কাজ সুরেশ, নয় ? ভাল সিকিউরিটি অফিসার হতে গেলে, তোমাকে জাসুসিও তো করতে হবে।

—বিলকুল শাহি বাত হুজুর।

—তবে ? তোমার উপকারই করেছি।

—থ্যাঙ্ক য়ু সার। অ্যান্ড গুডনাইট। ভিনায়কজিকো পাশ যাইয়ে গা একবার।

—ও শিওর। থ্যাঙ্ক য়ু সুরেশ। গুডনাইট।

পরদিন দেবদত্ত আর রাতুল দুজনেই অপেক্ষা করছিল। ঘড়িতে প্রায় আটটা বাজে রাত্তির। সুখেন্দুবাবুর এসে পড়বার কথা।

ভুট্টা, রাজেশের দল এখন পুলিশ লক আপে। পরে হয়তো কোর্টে জামিন পেয়ে যাবে। কিন্তু তাহলেও কেসটা চলবে বেশ কয়েক মাস। কি বছরও ঘুরে যেতে পারে। পুলিশের নজরে থেকে চট করে আর নতুন কোনও অ্যাকশানে ওরা যাবে বলে মনে হয় না। ঝামেলা টামেলা এখন এড়িয়েই থাকবে কিছুদিন।

সুখবরটা পেলে নিশ্চয়ই খুশি হবেন সুখেন্দুবাবু। আপাতত রাজেশের দলবলের পক্ষে পল্লবী দত্তকে কিডন্যাপ করে নিয়ে আসা বোধ হয় আর সম্ভব হচ্ছে না। দত্তবাড়ির কর্তারা বা সুখেন্দুবাবুও এখন অনেক নিশ্চিন্ত মনে চলাফেরা করতে পারবেন। অন্তত কিছুদিনের জন্যে তো বটেই।

রাতুল একবার বলল, সুখেন্দুদা লোকটা কিন্তু বেশ অদ্ভুত।

দেবদত্ত মাথা নাড়ল, অদ্ভুত এক ট্র্যাজেডির নায়ক, না ?

—কেন, ট্র্যাজেডির নায়ক কেন ?

—এমনিই মনে হল, তাই বললাম। দেবদত্ত ভাবুকের মতো তাকায়।

রাতুল ভাবে একটুক্ষণ।

পরে বলল, কিন্তু ওই লোকটা কে তাহলে ? সুখেন্দুদা যাকে জঙ্গলে দেখলেন।

—ধরতে পারছি না ঠিকঠাক। হিসেব এখনও মিলছে না রাতুল।

—লোকটা রাজেশ নিজে নয় তো ?

—অসম্ভব নয়। কিন্তু তাহলে সেটা তো সুখেন্দুবাবুরই মনে হবার কথা আগে। তাঁর তো মনে হচ্ছে না...।

—আমার কি মনে হয় দাদা, সুখেন্দুবাবু যেন একটু কনফিউজড।

—তার মানে বলছ, বুঝেও ধরতে পারছেন না।

—না দাদা। মানুষটাই অন্যরকম। একদিকে দারুণ বুদ্ধিমান, সাহসী, এফিসিয়েণ্ট। আর একদিকে যেন মনে মনে গুটিয়ে থাকা আর মুষড়ে পড়া একটি চরিত্র। ঠিক মেলানো যায় না যেন।

—বাহ্ রাতুল। চমৎকার ধরেছ তো চরিত্রটা। তোমার অ্যাসেসমেণ্ট অনেকটাই ঠিক। আমি একমত। এখন বার করতে হবে এর কারণটা কী ?

—সেইটেই তো পরিষ্কার হচ্ছে না। খুবই জটিল ব্যাপার মনে হচ্ছে।

দেবদত্ত হাসল, হবে। আস্তে আস্তে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

রাতুল ভাবতে থাকে কথাটা। কিন্তু ট্র্যাজেডির নায়ক কেন ? এর তাৎপর্য কী ? কীসের ট্র্যাজেডি ?

একটু পরেই ডোর বেলের আওয়াজ নীচে।

দেবদত্ত বলল, তোমার জটিল চরিত্রটি বোধহয় এসে পড়েছেন। যাও, সমাদর করে নিয়ে এস ওপরে।

—শিয়োর। তাড়াতাড়ি উঠে যায় রাতুল।

দরজা খুলেই সৌম্য অভিজাত সুখেন্দুর মুখ। দেখে একগাল হাসল রাতুল—আসুন সুখেন্দুদা। এতক্ষণ আপনার কথাই হচ্ছিল।

—রিয়েলি ! থ্যাঙ্ক য়ু। কালপ্রিটদের খবর কী ?

—সব লক আপে। এখনও জামিন হয়নি।

—থ্যাঙ্ক য়ু রাতুল। এইটেই সবচেয়ে ভাল খবর।

—এটা আপনাকে দেবার জন্যেই তো আমরা বসে আছি।

—আয়াম গ্রেটফুল টু য়ু। তাহলে তোমাকেও একটা ভাল খবর শোনাই।

—আমাকে ? বলুন—। রাতুল অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

সুখেন্দুবাবুর মুখে মৃদু হাসি।

বললেন, তোমার গোলাপের তোড়াটা এখন এক সুন্দরী কিশোরীর হাতে শোভা পাচ্ছে। তোমার নাম করেই তুলে দিয়ে এলাম।

—মাই গুডনেস ! কাকে দিলেন ? আমি তো মজা করে কথাটা বলেছিলাম আপনাকে আর আপনি সত্যি সত্যি...ছি ছি।

—নাথিং রং ইন ইট। আমি তো মনে মনে তারিফ করছি তোমার সুন্দর আইডিয়াটার।

বলে হাসতে হাসতেই ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন সুখেন্দু।

দেবদত্ত অবাক হয়ে বলে, কী ব্যাপার সুখেন্দুবাবু? কী হল?

সুখেন্দু ঘটনাটা এবারে পুরো খুলে বলেন। রাতুল চোখ টিপে একবার বাধা দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না।

দেবদত্ত হা হা করে হেসে উঠল সব শুনে।

বলল, তোমার তো তুলনা নেই রাতুলবাবু। এমন অভিনব একটি রোমান্টিক কল্পনা বোধ হয় আর কারও মাথায় খেলত না। তবে প্ল্যানিংটার মধ্যে একটু ঝুঁকিও ছিল বোধ হয়। তাই না?

সুখেন্দু বললেন, না। শেষপর্যন্ত রিস্কি হয়নি ব্যাপারটা—ভালই হয়েছে। অ্যান্ড এ ভেরি চার্মিং ফিনিশ টু।

—তাই নাকি? কাকে দিলেন আপনি, কে সেই মেয়েটি? দেবদত্ত প্রশ্ন করে।

—ফুলের মতো সুন্দর এক কিশোরীকে। জুঁই। পরিক্ষিতের মেয়ে।

—বাঃ চমৎকার। দেবদত্ত মাথা নাড়ল।

রাহুল অপ্রস্তুত হয়ে তাকিয়ে থাকে অন্যদিকে।

—আসার পথে জুঁইকে ওর এক বন্ধুর বাড়িতে ড্রপ করতে হল। তখনই তোড়াটা দিলাম। ড্রাইভার জল ছিটিয়ে বেশ তাজাই রেখেছিল কিন্তু তোমায় ফুলগুলো।

—দারুণ সাংঘাতিক লোক তো আপনি। আমি কোথায় একটু মজা করলাম আপনার সঙ্গে—

—আমিও তো তাই করলাম। জুঁই খুব অবাক হয়ে তাকাল আমার দিকে। ওকে বললাম, দিস ইজ ফ্রম রাতুল সেন—অ্যান ইয়াং ম্যান উইথ একস্ট্রা অর্ডিনারি কোয়ালিটিস, অ্যান্ড এ ভেরি গুড সেন্স অব হিউমার।

—ইস! ছি ছি কী সব কাণ্ড করলেন বলুন তো।

—জুঁই কিন্তু খুব মজা পেয়েছে ঘটনাটা শুনে। হাসতে হাসতে আরও বলল, হাউ ইন্টারেস্টিং! থ্যাঙ্ক য়ু অল, ফর দিস লটারি গিফট্ জেঠু।

দেবদত্ত বলল, এ যে রীতিমতো একটা নাটক হয়ে গেল। কী বল রাতুলবাবু।

রাতুল যেন বেশ লজ্জা পায়। মুখ নামিয়ে চুপচাপ বসে থাকে।

সনাতন চা দিয়ে গেল। সঙ্গে নানা ধরনের রকমারি বিস্কুট। চা খেতে খেতে আলোচনাটা নতুন পথে মোড় নিল। দেবদত্ত ও সুখেন্দু দুজনের মুখেই সিগারেট। সিগারেট টানতে টানতেই কথা হয়। পুরনো প্রসঙ্গগুলোই ওঠে এক এক করে। দেবদত্তর মুখটা গম্ভীর। সুখেন্দুও ভাবছেন। হালকা মজার পরিবেশটাই কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল মুহূর্তে।

জঙ্গলের সেই ছায়ামূর্তিটার কথাই উঠল ঘুরেফিরে। দেবদত্ত রাতুলের দিকে তাকাল।

রাতুল বলল, আচ্ছা সুখেন্দুদা, ওই লোকটা রাজেশ নিজে হতে পারে না?

—না না, মাথা নাড়লেন সুখেন্দু, রাজেশের চলার 'গেট'—মানে ওর হাঁটার ভঙ্গিটা আমার চেনা।

—তবে কি, এদের দলের বাইরের কোনও নতুন লোক··· ?

—তোমার সন্দেহই ঠিক রাতুল। দেবদত্ত বলল, হয়তো এ সম্পূর্ণ অন্য কেউ।

—কিন্তু অন্য একটা লোক কেন ঢুকে পড়বে? তার একটা কারণ চাই তো!

দেবদত্ত স্বগতোক্তি করে, ইয়েস রাতুল! ইয়েস! সেইটেই তো এখন জানতে চাই আমরা। হু ইজ হি?

সুখেন্দু বললেন, একটা কথা কিন্তু জানতে পেরেছি।

—কী কথা?

—সেদিন পার্কের সামনে দেশলাই চেয়ে পুরন্দরের রাস্তা আটকেছিল যে ছেলেটা —সে ভুট্টাই ছিল।

—কী করে জানলেন আপনি।

—পুরোর কাছে আজ আর একবার বর্ণনাটা শুনলাম ভাল করে। পরে বুঝলাম দাড়িঅলা সেই ছেলেটা ভুট্টা ছাড়া আর কেউই নয়।

—আপনি কি কাল ক্লাবের ঘটনাটাও বলেছেন ওখানে?

—না। কাউকেই না। কিন্তু সরকার মশাই একটা অদ্ভুত কথা শোনালেন।

—কী কথা?

—সেদিন জঙ্গলের কাছে আমি যখন দাঁড়িয়েছিলাম, উনিও নাকি ছিলেন আমার পিছনে। গাড়িটা নেই দেখে পল্লবীই দেখতে পাঠিয়েছিল। কিন্তু আমি কিছুই জানি না। গাড়ি আসতেই কোনও দিকে না তাকিয়ে ভাবতে ভাবতে উঠে পড়েছি···

—তারপর?

—কিন্তু সরকার মশাই আজ বললেন, 'কই আমি তো কাউকে দেখলাম না, জঙ্গলের দিকে।' এখন মনে হচ্ছে, তাহলে কি আমার চোখের ভুল? হ্যালুসিনেশান দেখলাম কি একটা আমি?

দেবদত্ত গম্ভীর গলায় বলে, না। আমার তা মনে হয় না। কথাটা আপনি আলোচনা করবেন না আর কারও সঙ্গে।

—আমিও তাই ভাবছি। এরকম তো কখনও হয়নি আমার।

দেবদত্তর চোখের দৃষ্টিটা যেন তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

বলল, ভাববেন না। এবার আমি নিজেই একবার রাত্তিরে হানা দেব আপনাদের

ওই পোড়ো বাড়ির জঙ্গলে। মুখোমুখি হতে চাই একবার সেই অদৃশ্য অতিথির সঙ্গে।

৭

বুধু পাগলা গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসেছিল সিঁড়িতে। সবে ভোর হয়েছে। এখনও ভাল করে দিনের আলো ফোটেনি। জঙ্গলের মধ্যে পাখিরা ডেকে উঠছে একটা দুটো করে। বুনো ফুলের গন্ধ ভরা ভোরের বাতাস। তার মধ্যে পাগলা এক দৃষ্টিতে কী যেন দেখছিল সামনে।

পোড়ো বাড়ির কার্নিশ ফাটিয়ে লকলক করে মাথা তুলছে নতুন একটা নিমগাছ। সদ্য পাতা ছাড়তে আরম্ভ করেছে গাছটা। মাথা ভর্তি টুকটুকে তামাটে লাল কচিপাতা। দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়। সেখানেই একটা সুন্দর সোনালি পাখি এসে ডাকছিল।

হানাবাড়িতেও বসন্ত এসে গেল এবার। পাখিটা তার খবর নিয়েই এসেছে যেন। চনমনে গলায় ডেকেই চলেছে মনের আনন্দে ; 'কিউ-কুক-কিউ-কুক-কিউ-কুক'। চমক লাগে ডাকটা শুনলে। মনে হয় পাখিটা যেন কিছু বলতে চায় তাকে।

পাগলা ঝোলা কাঁধে সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে থেমে দাঁড়াল। দেখল একবার মুখ ফিরিয়ে। এখন তার চলে যাবার সময়। আলো ফোটার আগেই সে বেরিয়ে যায়। কিন্তু আজ কী খেয়ালে ভাবুকের মতো বসে পড়ল। কত কথা যেন ভিড় করে আসতে চায় তার মনে। মাথাটা দপ্ দপ্ করে ক্রমাগত।

ঝোলাটা। তার চকচকে বেতের লাঠিটা। হাঁ করা সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এর ফোকরে দুটো ধেড়ে ইঁদুর। পিটপিট করে তাকাচ্ছে তার দিকে। বাদুড় ছানারা ককিয়ে কেঁদে উঠল একেবারে ভিতর থেকে। কিন্তু কোনও দিকেই কোনও খেয়াল করে না পাগল।

তার শরীরটাই আজ ভাল নেই হয়তো। দেখলে তাই-ই মনে হয়। মুখভর্তি কাঁচাপাকা গোঁফদাড়ির মধ্যে অদ্ভুত টকটকে লাল দুটো চোখ। মাথায় আবার দড়ি বাঁধা। শক্ত করে একটা পাড় বেঁধেছে চারদিকে ঘুরিয়ে। সেই অবস্থায়ই বসে পড়ে ফ্যাল ফ্যাল করে দেখছে। চোখে পলক নেই যেন।

পাখিটা আবার ডেকে উঠল-কিউ কুক্-কুক্ …

নাচতে নাচতে ঘন সবুজ পাতার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে। তার দিকেই ডাকছে মুখ করে। দেখতে দেখতে পাগল হাসে। যেন কতদিন পরে খুব চেনা

একটা লোকের সঙ্গে দেখা হল। এইবার জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করা হবে। কী, কেমন আজ? আজকাল আর দেখতে পাই না চিনতে পারছ তো আমায়?

কিন্তু পাখির বদলে জবাবটা দিল নীচে থেকে অন্য আর একজন।

বলল, ও পাগলা, ওখানে তুমি কী দেখছ গো?

নীচের দিকটা এখনও ঝাপসা অন্ধকার। তবু তার মধ্যেও চেনা যায় মুখটা। সে ছুটকি। জুল জুল চোখে তাকিয়ে আছে ওপরে।

রাত ফরসা হতে না হতেই ঠিক ঘুরঘুর করছে। ভয় ডর বলেও কিছু নেই। পিছনের দরজা খুলেই সবার আগে বেরিয়ে পড়েছে। পশ্চিম দিকের বাগান থেকে ঘুরঘুর করতে করতে এখন এই জঙ্গলে। পোড়ো বাড়ির চারদিকে দাপিয়ে ওঠা ঝাঁকড়া গাছপালার নীচে।

ছুটকি ভোর হলেই এখন এমনি বেরিয়ে পড়ছে রোজ। কোথায় কচি আম, বুনো আমড়া, কুল, কাঁচা তেতুল, তার খোঁজে ঘুর ঘুর করে ঘুরে বেড়ায়। দত্তবাড়ির বাগান, ঘোষেদের পুকুরপাড়, দে বাবুদের পাঁচিলের আশপাশ—অন্ধকারের মধ্যেই সবার আগে টই টই করে টহল দেয়। তলায় কুড়িয়ে না পেলে চুপি চুপি গাছ থেকেই পেড়ে নেয় এটা ওটা। ভীষণ টক খাবার লোভ বেড়েছে তার এদানি। শুধু টক।

পোড়ো বাড়ির পিছনে ঢুকে পড়েছে আজ কচি নিমপাতা দেখে। দূর থেকেই চোখে পড়েছে। সদ্য ছাড়া টুকটুকে লাল পাতাগুলো। ভোরের হাওয়ায় কাঁপছে তিরতির করে। অত ওপরে, প্রায় হানাবাড়ির মাথায় না উঠলে, পাতাগুলোর নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়। তবু চলে এসেছে। ঝিলমিল করা পাতাগুলোর টানেই যেন চলে এসেছে।

আর তখনই চোখ পড়ে বুধু পাগলাকে। এত সামনাসামনি দিনের আলোয় আগে কখনও দেখেনি। আশ্চর্য! এই সেই অদৃশ্য খ্যাপা লোকটা!

চেহারাটা দেখে অবশ্য প্রথমে ঘাবড়েই যায় খুব। অন্ধকারের মধ্যে একা দাঁড়িয়ে ভয় ভয় লাগে। তারপর আস্তে আস্তে সাহস আসে। কী আর করবে! সে রকম বেচাল কিছু দেখলেই না হয় এক ছুটে পালাবে। কিন্তু না, পাগল সেরকম কিছুই করে না। লাল চোখ মেলে লাল পাতার জঙ্গলে ভাবুকের মতো কী দেখছে। দাড়িগোঁফের জঙ্গলে ঢাকা মুখে আবার হাসিও ফোটে একটু।

ছুটকি আর একবার বলে উঠল, এই যে—ও পাগলা; তুমি কী দেখছ ওখানে?

পাগলা চমক ভেঙে তাকায় ছুটকির দিকে। তারপর বলে,

—সোনাবউ দেখছি।

—সোনাবউ? সে আবার কি গো?

—পাখি। তুমি চেন না?

—না তো। কোথায় দেখি—।

—ওই তো, নিমগাছের ডালে। পাগলা হাত দিয়ে দেখায়।

তখনও ডেকে চলেছে পাখিটা—কিউ, কিউ-কুক্—

ছুটকি ছিপছিপে শরীরটা নিয়ে ডিঙি মেরে এদিক ওদিক তাকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করে। কিছুই দেখতে পায় না। পরে মুখ টিপে হেসে একটু ঠাট্টা করে পাগলাকে,

—ওটাই তোমার বউ বুঝি?

পাগল বিরক্ত হয়ে তাকাল ছুটকির দিকে। বিড়বিড় করে কী গালাগাল দিয়ে বলল, তোমার বউ। তোমার—

ছুটকি হি হি করে হেসে ওঠে। বলল, আমার আবার বউ কি গো? আমি তো নিজেই বউ।

বলেই পট করে মাথায় ঘোমটা টেনে দেখায়, এই দ্যাখ, ভাল না?

পাগল গম্ভীর মুখে বলে, না। বউ তো, তুমি এখানে এসেছ কেন? যাও—যাও এখান থেকে।

—কেন, এখানে এলে কী হয়?

—তোমাকে মারবে। তুমি পালাও বউ, পালাও।

—এঃ মারলেই হল। কে মারবে, কেন মারবে?

—বলছি, তুমি চলে যাও এখান থেকে—। ভীষণ মারবে—

পাগল কটমট করে তাকায় তার দিকে। চোখ দুটো যেন জ্বলে। দু হাতে বনমানুষের মতো লম্বা লম্বা নখ। সমানে টানছে রুক্ষ চুলের মধ্যে মাথায়। কপালের ফেট্টির ওপর। বিড়বিড় করে কী বলছেও নিজের মনে।

ছুটকির গা-টা এবার ছমছম করে ওঠে। তবুও নড়ে না। একভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে ভাল করে দেখতে থাকে লোকটাকে। হঠাৎ হঠাৎ মাথা ঝাঁকিয়ে উঠছে। কোথাও কি কোনো কষ্ট হচ্ছে ওর? কৌতূহলটা কিছুতেই মিটছিল না ছুটকির।

পাগল ঝোলা কাঁধে উঠে দাঁড়াল এবার।

ছুটকি বলল, তুমি চলে যাচ্ছ? আমায় দুটো নিমপাতা দাও না।

পাগল সাড়া দেয় না।

—ওই তো, তুমি একটু লাঠি দিয়ে ডালটা ধরলেই পাবে। দাও না, গো!

পাগলা একবার গাছটার দিকে দেখে। পরে বলল, না। সোনা বউ পালিয়ে যাবে।

—ও আবার আসবে। আমাকে দিলে আরও আসবে, দেখো—।

পাগল হাসে, তুমিই উঠে এসো না—।

—আমার ভয় করছে, যদি পড়ে যাই।

—পড়বে কেন? দেখে দেখে উঠে এসো? এসো—

পাগল হাত বাড়িয়ে তাকে ডাকে। দীর্ঘ প্রশস্ত দেহ। খোলা বুক। লাল চোখে ভরা এক অদ্ভুত সম্মোহন। কেমন ভয় ভয় করে ছুটকির। তবু অভিভূতের মতো সে পা বাড়ায়।

কয়েকটা মাত্র ধাপ ভেঙেই থেমে দাঁড়াল। আর পারে না। সিঁড়িটা দুভাগ হয়ে ঝুলছে সামনে। ভিতরে ঘন ঘাস-লতার জঙ্গলে কোঁ-কোঁ করে কী ডাকে। ভয়ে পা দুটো কাঁপছে ছুটকির।

—উঃ মাগো, আমি পড়ে যাব, পড়ে যাব—

হা হা করে হেসে উঠল পাগল। তারপর হাত বাড়িয়ে ধরল তাকে, কেন পড়বে? আমার হাত ধরে উঠে এসো তুমি—

আর সঙ্গে সঙ্গেই ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল ছুটকি। উঃ বাবারে! আমাকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও—

বলেই একটানে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে নেমে যায়। নেমেও চেঁচাতে থাকে, পাগলা আমাকে ধরতে আসছে গো। বাঁচাও, বাঁচাও—।

এক দৌড়ে জঙ্গল ভেঙে রাস্তা পেরিয়ে বাড়ির মধ্যে দাঁড়াল এসে।

নকুলবাবু ঘুমোচ্ছিলেন তখনও। ছুটকির চিৎকারে ঘুম ভেঙে তড়াক করে এক লাফে বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

—কী? কী হয়েছে গো? ঘুম চোখেই দু হাতে বউয়ের কাঁধ চেপে ধরেলেন।

ছুটকি ঝরঝর করে কাঁদে আর পাগলের কথাটা বলে। একটু বাড়িয়েই বলে।

—অ্যাঁ? এত বড় আস্পদ্দা শালার! রাগে আগুন হয়ে পোড়ো বাড়ির দিকে তাকান, আজ দেখাচ্ছি তোমায়। তোকে শেষ করে তবে ছাড়ব আমি।

অগত্যা ঘরের কোণে পড়ে থাকা কাটারিটা নিয়েই তিনি ছুটলেন।

বিভাস, সুহাস বিছানা ছাড়েনি তখনও। মা এঁটো বাসনের পাঁজা নিয়ে সবে বসেছেন পুকুরঘাটে। শ্বেতা কলঘরে। তাদের কেউ কিছু বোঝবার আগেই লুঙির গিঁট কষতে কষতে ছুটলেন ষণ্ডাবাবু।

জঙ্গলে ঢুকেই কাটারি ঘুরিয়ে নাকি সুরে হাঁক দিলেন, কই শালা, বেরিয়ে আয় দেখি।

ওপরে উঠতে একটু ভয় ভয়ও করে। একদম একা চলে এসেছেন ঝোঁকের মাথায়। তাই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে যতটা সম্ভব দাপাদাপি করেন, বেরো শালা একবার। আজ পাগলামি ঘুচিয়ে ছাড়ব তোর জন্মের মতো—

কিন্তু কেউ বেরিয়ে আসে না। সাড়াও দেয় না তাঁর আস্ফালনের। পাগলা তখন কোথায়! প্রেক্ষাগৃহ ফাঁকা ফেলে রাতের অভিনেতা তখন কোথায় প্রস্থান করেছে! কেউ জানে না। শুধু বাদুড়ছানারা আর চামচিকের দল চিক্ চিক্ করে সাড়া দেয় চিৎকারটা শুনে।

পুরন্দর ভোরবেলায ছাতের ওপর একটা কার্পেট পেতে স্কিপিং করছিলেন। সকালবেলায় এই ধরনের নানারকম ফ্রি হ্যান্ড এক্সসারসাইজ করার অভ্যেস তাঁর। ডিপ ব্রিদিং, বেণ্ডিং, স্ট্রেচিং, স্পট জগিং, স্কিপিং—এই রকম সব শরীর চর্চা প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে চলে।

খেলাধুলো ছাড়ার পর থেকেই এগুলো আরও বেড়ে উঠেছে। একসময় পালোয়ানের কাছে কুস্তিও শিখেছিলেন অল্প বয়েসে। শরীরটাকে মজবুত আর ফিট রাখার দিকে বরাবরই তাঁর লক্ষ্য। তাঁর হাতের বা পায়ের গুলি বা চওড়া বুকের গড়ন দেখলে সহজে তা অনুমান করা যায়। বয়েসের তুলনায় অনেক জোয়ান দেখায় তাঁকে।

এখনও সন্ধেবেলায় কোঁচানো ধুতি আর গিলে করা গরদের পাঞ্জাবি চড়িয়ে আতর-টাতর মেখে যখন মাঝেমধ্যে একটু আমোদ আহ্লাদের জন্যে বেরোন ছোটবাবু—হ্যাঁ, তখন তাকিযে দেখতে হয় বটে। ঠিক যেন একজন সুপুরুষ বর চলেছে বিয়ের।

পুরোবাবু লাফিয়েই চলেছেন দড়ির ওপর। দরদর করে ঘামছেন এখন। তবু আরও দশটা বাকি। সংখ্যাটা গুনতে গুনতেই লাফাচ্ছেন। আর দশটা হলেই আজকের কোটা শেষ।

সামনেই টুলের ওপর একটা ঘড়ি। সবুজ তোয়ালে, মেরুন রঙের একটা গাউন। ঘড়ির দিকে চোখটা রেখেই রোজ পি টি করেন তিনি। তারপর ঘামটাম মুছে ছাতের ওপর একইু পায়চারি করে নীচে নামেন।

কিন্তু আজ হঠাৎ তার আগেই থেমে দাঁড়ালেন। কোথাও একটা গোলমাল হচ্ছে যেন! নকুলবাবুর গলা। বাগানের দিকে প্রচণ্ড হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে তার। হাঁটতে হাঁটতে কার্নিশের ধারে এগিয়ে আসেন পুরোবাবু।

—এই যে ছোড়দা! মৌলি তড়বড় করে উঠে আসছে ওপরে। কপালের ওপর ভেঙে পড়া এলোমেলো চুল। হাতের ট্রেতে ঢাকা দেওয়া এক গ্লাস বাদামের শরবত। হাঁফাচ্ছে।

বলল, ষণ্ডা নকুল না, আজ দারুণ খেপেছে।

—কেন, হল কী?

—ওঃ সে এক কেলেঙ্কারি কাণ্ড! মৌলি কুলকুল করে হাসতে হাসতে ঝুঁকে পড়ে সামনে।

ছোট শর্টস পরা, খালি গা পুরোবাবুর। লোমশ বুকটা ঘামে জবজব করছে। একটু অস্বস্তি বোধ করেন মৌলির সামনে। তাড়াতাড়ি তোয়ালেটা টেনে বুকে জড়িয়ে বলেন,

—কী, কাণ্ডটা কী ? শুনি— ।

মৌলি মজা করে রসিয়ে রসিয়ে ছুটকির কাহিনীটা শোনায় । আর প্রাণ খুলে হাসে ।

পুরন্দর বুকে তোয়ালে ঘষতে ঘষতে বলেন, ঠিক হয়েছে । যেমন মেয়েছেলে, তার তেমনি শিক্ষা হয়েছে ।

—যা বলেছ । আর লোকটা বউকে একবার জিজ্ঞেসও করল না, তুমি কেন গিয়েছিলে ওখানে ? কী কাজটা ছিল তোমার ? তার আগেই পাগলাকে কাটবে বলে দা নিয়ে মার মার করে ছুটল ? ওহ্ পারেও বটে লোকটা !

পুরন্দর টিপ্পনী কাটলেন, বুড়ো বরের অমন কচি বউ ঘরে থাকলে যে অনেক জ্বালা । মরুক ব্যাটা নিজেই এখন কাটাকাটি করে । আপদ বিদেয় হোক একটা বাড়ি থেকে ।

এদিকে নকুলবাবু ফিরে এসেছেন । উঠোনে দাঁড়িয়েই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তর্জন-গর্জন চলছে এখন । ওপরের দিকে হঠাৎ দেখতে পান মৌলি আর পুরন্দরকে । পাঁচিলের ধারে পাশাপাশি দুজনে দাঁড়িয়ে । এদিকেই দৃষ্টি, মুখে মিটি মিটি হাসি ।

সঙ্গে সঙ্গে চড়াং করে মেজাজটা চড়ে যায় আরও, কাউকে ছাড়ব না । সব শালাকেই এক এক করে দেখে নেব আমি···যতো বদমাইশ নচ্ছার ।

চোখ পাকিয়ে প্রায় নাচতে নাচতে বলে চলেন নকুলবাবু ।

জুঁই গাড়ির আয়নার দিকে আবার দেখল । এখনও পিছন পিছন আসছে ওরা । রামদয়াল দুতিন বার স্পিড কমিয়ে পাশ দিল গাড়িটাকে । কিন্তু তবুও ওরা গেল না । সেই পার্কসার্কাস থেকেই পিছন নিয়েছে দলটা । সমানে ফলো করে যাচ্ছে তাকে ।

রাজেশ ঠাকুরের দলের কেউ নয় তো ! সর্বনাশ ! কথাটা মনে হতেই বুকটা কেঁপে উঠল তার । তাহলে ? মা জানলে তো একটা তুলকালাম বাধিয়ে ছাড়বে বাড়িতে । কী করবে এখন সে ? মনে মনে ভাবতে থাকে জুঁই ।

এই দলটাকে আগে কখনও দেখেছে বলেও মনে করতে পারে না । স্টিয়ারিং-এ একটা পালোয়ান চেহারার হুলোমুখো ছেলে । কুৎসিত দেখতে একেবারে । পাশের দুটোও তেমনি হোঁতকা । টিশার্টের কলার তুলে আবার হিরো-হিরো ভাব দেখাচ্ছে । মুখে বিগলিত হাসি । মরে যাই !

ঘেন্নায় চোখ ফিরিয়ে নেয় জুঁই । ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে তার এখন । রামদয়াল স্পিড বাড়ালে ওরাও স্পিড বাড়ায় । বাড়ি পর্যন্তই ধাওয়া করবে নাকি দলটা ?

কিছু একটা করা দরকার। প্রথম একটু মজাই লেগেছিল গাড়িটা দেখে। পরে বিরক্তি। এখন ভীষণ বিরক্তি আর ভয়। কী যে করবে জুঁই।

তখনই হঠাৎ চোখে পড়ে গেল তাদের একতলার সুহাসকে। কলেজ থেকে ফেরার পথে খুব গুলতানি হচ্ছে বন্ধুদের সঙ্গে। মুখে আবার সিগারেট। সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতেই কথা বলছে। এর আগে কখনও দেখেনি এটা।

সুহাসদাকে দেখেই যেন খুব ভরসা পেল জুঁই। কখনও অবশ্য তেমন কথা বলে না ওর সঙ্গে। তবু বেশ ভরসা পায় এখন।

ওদেরও নজর পড়ল এবার তার দিকে। বিড়বিড় করে কী বলল যেন সুহাসদা। তাকে দেখিয়েই এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ে হাওয়ায়। কত যেন পাকা স্মোকার একজন।

জুঁই হঠাৎ গাড়ি থামাতে বলে রামদয়ালকে। রামদয়াল ব্রেক কষল সঙ্গে সঙ্গে। দূরে পিছনের গাড়িটাও দাঁড়িয়ে গেল আস্তে করে।

জুঁই মুখ বার করে ডাকল, এই সুহাসদা, শোনো—।

রাস্তার মধ্যে এভাবে হঠাৎ তাকে ডেকে উঠবে জুঁই সুহাস কল্পনাই করতে পারেনি। বেশ ঘাবড়েই গেল যেন। কী করবে বুঝে উঠতে পারে না। বন্ধুদের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে চাপা গুঞ্জন আর চাঞ্চল্য। ফুটফুটে সুন্দরী মেয়েটা তাদের দিকেই তাকিয়ে আছে। একজন ধাক্কা দিল তাকে পেছন থেকে, যা না,—যা।

সুহাস এবার স্মার্ট ভঙ্গিতেই সিগারেট টানতে টানতে এগিয়ে এল। বলল, কী ব্যাপার ?

জুঁই ইঙ্গিতে পেছনের গাড়িটাকে দেখাল। চাপা সুরে বলল ঘটনাটা।

সুহাস বলল, ঠিক আছে। আমি দেখছি দাঁড়াও।

বন্ধুদের কাছে ফিরে গেল সুহাস। বলল সবাইকে ব্যাপারটা। সবাই এবার নজর করে গাড়িটার দিকে। পায়ে পায়ে এগোতে থাকে দল বেঁধে। আর তখনই স্টার্ট নিল গাড়িটা। ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল সবার চোখের সামনে দিয়ে।

সবাই হেসে উঠল হা-হা-করে।

সুহাস বলল, দেখলে তো এদের সাহস। যত সব লোফারের দল।

জুঁই বলল, তুমি আমার সঙ্গে একটু চলো না সুহাসদা। যাবে ?

সুহাস ইতস্তত করে। বন্ধুরা সাহস জোগায় ঠাট্টা করে, যা না। একসঙ্গে গাড়িতে চলে যা দুজনে।

গাড়ি চলেছে হু-হু করে। প্রায় ফাঁকা রাস্তা এদিকে। জুঁই আয়নার দিকে লক্ষ রাখে। কেউ আর ফলো করছে না এবার। তবুও লক্ষটা রেখেই চলে।

জুঁইয়ের এত কাছে বসে একটু আড়ষ্ট বোধ করে যেন সুহাস। আড়চোখে দেখে ওর মুখের দিকে। বলার মতো একটা কথাও খুঁজে পাচ্ছে না। টার্নিং-এর

ঝাঁকুনিতে আলতোভাবে জুঁইয়ের কাঁধটা একবারে ছুঁয়ে গেল তাকে। মাখনের মতো নরম শরীর। একটা উষ্ণ ভাপ ছাড়ছে যেন গা থেকে। সঙ্গে মৃদু একটা সুগন্ধ। কোনও দামি পারফিউমের ঘ্রাণ নিশ্চয়ই।

সুহাস মরিয়া হয়ে উঠল, দলটা যদি আবার ফলো করে কাল?

জুঁই পা মুড়ে বেঁকে বসল, কাল স্কুলে গিয়েই রিপোর্ট করে দেব। নাম্বারটা নোট করে নিয়েছি।

—তাতে কী হবে ওদের?

—পুলিশে খবর চলে যাবে। ঠিক খুঁজে বার করবে তখন গাড়ির মালিককে। তারপর পুরো দলটাকে। আমাদের স্কুলে তো এটা হামেশাই হয়। পুলিশ অ্যাকশানও নেয় চটপট।

সুহাস ঢোক গিলল, বাঃ বেশ সুন্দর সিসটেম তো।

জুঁই একটু চুপ করে থেকে বলল, তুমি সিগারেট খাও, সুহাসদা?

—না, খাই মানে, মাঝে মধ্যে। নেশা নেই। সুহাস আমতা আমতা করে।

জুঁই ঠোঁট বেঁকাল, উঁউ···নেশা নেই। সিগারেটের যা গন্ধ ছাড়ছে গা থেকে। আমি সব বুঝি। তুমি রোজ খাও নিশ্চয়ই—।

—এই, না না। কলেজে গেলে বন্ধুদের সঙ্গে যা দু একটা খাই। তুমি আবার বাড়িতে এ সব গল্প কোরো না যেন।

জুঁই হাসল, ঠিক আছে, বলব না। কিন্তু তুমিও আজকের এই ব্যাপারটা কাউকে বলবে না বাড়িতে। একদম নয়। মার কানে গেলে কেলেঙ্কারি করে ছাড়বে একেবারে। বেরোনোই বন্ধ হয়ে যাবে আমার।

—ঠিক আছে, বলব না।

—প্রমিজ? জুঁই ভুরু বাঁকাল।

—প্রমিজ। সুহাস হাসল হাতে হাত রেখে।

পাড়ার মধ্যে ঢোকার আগে গাড়িটা থামিয়ে সুহাসকে নামিয়ে দিল জুঁই। জানে, দুজনে এভাবে একসঙ্গে দত্ত বাড়িতে ঢোকা অসম্ভব। অলিখিত বিধানটা তাই দুজনেই মেনে নেয়।

মধ্যরাত্রে আবার শোরগোল দত্তভিলায়। তুমুল চিৎকার চেঁচামেচি পোড়ো বাড়ির বাগানে। নকুলবাবুই চেঁচাচ্ছেন আতঙ্কের সুরে—ওরে আমি গেলাম রে—। মাগো···বাবাগো—। এ কী হল গো আমার আঁ- আঁ।

পাগলাকে মারতে গিয়েই পড়ে গেছেন নকুলবাবু। সিঁড়ির ফাঁকে পা ঢুকে মুখ থুবড়ে পড়েছেন। টর্চটা ভেঙে চৌচির। হাতে পায়ে রক্ত। তার মধ্যেও উঠেছিলেন

হামাগুড়ি দিয়ে। কিন্তু কে যেন ধুপ করে লাফিয়ে পড়ল ওপর থেকে। বলেন, কে তুই ?

উত্তরে খ্যাঁক খ্যাঁক করা এক ভুতুড়ে হাসির শব্দ অন্ধকারে। একজন নয়, পর পর দুটো ছায়ামূর্তি। তার সামনেই লাফ দিয়ে সরে গেল দুপাশে। অদ্ভুত চেহারা। মানুষ না গরিলা চেনা যায় না।

দেখেই গলার স্বরটা বন্ধ হয়ে যায় নকুলবাবুর। থর থর করে হাত পা কাঁপে। ভুতে পাওয়া মানুষের মতোই আঁ-আঁ করতে করতে পালিয়ে আসেন কোনও মতে।

কিন্তু বাড়ির উঠোনে ঢুকেই আবার অন্যমূর্তি। লোকজন উঠে পড়েছে সবাই। ছুটকি এসে টানছে হাত ধরে ! সঙ্গে সঙ্গেই বিক্রমটা আবার ফিরে আসে। হাঁউমাউ করে নতুন উদ্যমে চেঁচাতে থাকেন,

—ওরে শালা ! তুই ভূঁত হোস, পাগল হোস, নতুন আচায্যি তোকে রেহাই দেবে না। এবার আগুন জ্বালিয়ে দেব আমি—তে রাত্তিরের মধ্যেই তোর মরা মুখ দেখবে লোকে··· ।

পরিক্ষিৎ একটু আগেই ফিরেছেন ক্লাব থেকে। খাওয়ার পর একটা সিগারেট টানছিলেন আয়েস করে। চোখ দুটো ঢুলু ঢুলু। আবেশ আসছে ঘুমের। কিন্তু চেঁচামেচিটা শুনে চমকে উঠে বসলেন। অসহ্য ! সব পান্‌সে করে দিল যেন স্কাউণ্ড্রেলটা। ইচ্ছে করছিল বন্দুকটা নিয়েই ছুটে যান। দুটোকেই শ্যুট করে খতম করে দেন একেবারে। এ কী বাঁদরামো রোজ। হয় এটা না হয় ওটা। হাঙ্গামা করেই যাচ্ছে !

জানলার ওধারে থেকে মৌলি ছুটে এল হঠাৎ। উদভ্রান্ত চেহারা। একটু আগেই রাত-পোশাক পরে শুতে যাবে বলে মুখে ক্রিম ঘষছিল। এখন লাল হয়ে উঠেছে উত্তেজনায়। বলল, এই, নকুলবাবু না দুটো ভূত দেখেছে ও বাড়িতে। কী ভয় করছে আমার শুনে।

—কী দেখেছে ? চোখ কুঁচকে ওঠে ক্ষিতিবাবুর।

—দুটো ভূত। হি হি করে নাকি হাসছিল ওঁকে দেখে—মাগো !

—নন্‌সেন্স। কাম অন মৌ, ডোনট বি সিলি। তোমার মাথাটাও এবার এরা খারাপ করে ছাড়বে দেখছি। যাও, শুয়ে পড় দেখি—

চওড়া হাতের পাঞ্জা দিয়ে মৌলির মাথাটা আলতো চাপড়ে দিলেন পরিক্ষিৎ।

৮

পন্নগভূষণ সকালবেলায় হিসেবের খাতায় চোখ বুলোচ্ছিলেন।

সরকার মশাই-ই এসব মিলিয়ে রাখেন নিয়মিত। জমিজমা, বাড়ি-ঘর, সম্পত্তি, এখনও যা সামান্য অবশিষ্ট আছে দত্তদের—তার আয় ব্যয়; বাকি বকেয়ার হিসেব। কর্তাবাবুকে শুধু তার ওপর চোখ বুলিয়ে একবার দাগ মেরে যেতে হয়। গণ্ডগোল কোথাও কিছু মনে হলে, সরকারবাবুর তলব পড়ে। পুরনো বিশ্বাসী লোক দত্তবাড়ির। সঙ্গে সঙ্গেই এসে দাঁড়িয়ে কড়ায় গণ্ডায় হিসেবটা বুঝিয়ে দেন।

কিন্তু আজ ডেকে পাঠাবার আগেই সরকারবাবু নিজেই নিঃশব্দে এসে ঢুকলেন। হাতে একখানা সুদৃশ্য গোলাপি লেফাফা। একটুক্ষণ অপেক্ষা করে চাপা গলায় বললেন, কর্তাবাবু।

পন্নগভূষণ চোখ তুলে একটু অবাক হয়ে তাকালেন, কী ব্যাপার ভূপাল?

সরকারমশাই কোনও কথা না বলে হাতের খামখানা বাড়িয়ে ধরলেন।

কর্তাবাবু দেখতে থাকেন খামখানা। ওপরে টাইপ করে ইংরেজিতে লেখা—মিস পল্লবী দত্ত। নীচে বাড়ির ঠিকানা। অতীব সুদৃশ্য মসৃণ কাগজ। পুরু করে আঠা দিয়ে মুখটা আটকানো। দেখতে দেখতে ভ্রূ দুটো কুঁচকে ওঠে কর্তাবাবুর।

অনুগত সরকারমশাই দাঁড়িয়েই থাকেন মাথা নামিয়ে।

নীচের লেটার বক্স থেকে চিঠিপত্রগুলো তিনিই বার করে নিয়ে আসেন রোজ। তারপর নাম দেখে যার যার ঘরে পৌঁছে দেন। সেরেস্তার চিঠি হলে নিজেই খুলে পড়েন। বা কোনও-কোনওটা কর্তাবাবুর কাছেও নিয়ে আসেন। ব্যক্তিগত কারও চিঠি এভাবে কর্তাবাবুর হাতে তুলে দেওয়া নিয়ম নয়।

কিন্তু আজকের ব্যাপারটা একটু অন্যরকম ঘটল। অবশ্য তার কারণও আছে। চিঠিটা দেখে তাঁরও বেশ সন্দেহ হয়েছে কর্তাবাবুর মতো। তাই জেনেশুনেই তিনি এই অনিয়মটা করলেন।

পন্নগবাবু একটুক্ষণ ভাবেন চিঠিটা হাতে নিয়ে। তারপর হঠাৎ ছুরি ঢুকিয়ে ফরফর করে খুলে ফেললেন। পল্লবী যথেষ্ট বড় হয়েছে। গোপনে এভাবে তার মতো বয়েসের মেয়ের চিঠি খুলে পড়া, ব্যাপারটা খুবই দৃষ্টিকটু। তবু কোনও উপায় নেই তাঁর। প্রেমপত্র হতে পারে আন্দাজ করেও পড়তে শুরু করে দিলেন চিঠিটা। এবং যা অনুমান করেছিলেন, ঠিক তাই। চিঠিটা সেই বখাটে বদমাস রাজেশ ঠাকুরেরই লেখা।

লেখার ভাষা যেমন অশালীন আর তেমনি কুরুচিপূর্ণ। যদিও পুরোটাই

ইংরেজিতে টাইপ করা। পড়তে পড়তে মাথা গরম হয়ে ওঠে কর্তাবাবুর। অনেক কষ্টে সংযত রাখেন নিজেকে।

শেষ দিকে আবার হামবড়াই করে হুমকি দিয়েছে শয়তানটা। কেউ নাকি রুখতে পারবে না তাকে—কোনও শক্তিই না। পল্লবীকে সে এখান থেকে নিয়ে যাবেই। খুন-জখম করতেও, তার জন্যে পিছপা হবে না। আর কয়েকটা দিন মাত্র ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে, পল্লবীকে। তার মধ্যেই রাজেশের লোক এসে যোগাযোগ করবে। এবং ব্যবস্থা একটা হবেই…পল্লবীর জন্যে তার ভালবাসা এমন উদ্দাম… পাহাড় থেকে নদী নেমে আসে যেমন পাথর ভেঙে…ধেয়ে যায় সমুদ্রের দিকে…তেমনি দুরন্ত আর শক্তিশালী সে…ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইনিয়ে বিনিয়ে আবেগভরা এমনি অনেক অসংযত প্রলাপোক্তি। পড়তে পড়তে রাগে অস্বস্তিতে শরীরটা রি রি করতে থাকে কর্তাবাবুর। ইচ্ছে করে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে আগুনে পুড়িয়ে ফেলেন কাগজখানা।

কিন্তু তা না করে, যেভাবে ভাঁজ করা ছিল সেইভাবেই খামে ঢুকিয়ে দেরাজের মধ্যে তালা দিয়ে রাখলেন।

গম্ভীর মুখে সরকারমশাইকে বললেন।

—একবার দেখ তো ভূপাল, ক্ষিতি আছে কি না?

—বড়োবাবু তো বেরিয়ে গেলেন হুজুর।

—আজ দেরি করে বেরোবার কথা ছিল না?

—আজ্ঞে দেরি করেই তো বেরোলেন।

—ও।

চুপচাপ ভাবেন একটু। পরে তার দিকে ফিরে বললেন,—চিঠিটা কে দিয়েছে, কিছু বুঝতে পারছ ভূপাল?

—আজ্ঞে না। তবে মনে হয় আন্দাজ করতে পারি।

—কে মনে হয়?

আজ্ঞে ওই রাজেশ ঠাকুরই হবে, না কি?

—ঠিকই ধরেছ তুমি। পা থেকে মাথা পর্যন্ত চাবকাতে ইচ্ছে করছে, ছোকরাকে ধরে আমার। লিখেছে ওকে নাকি কেউ আটকাতে পারবে না, লাবির সঙ্গে ও দেখা করবেই। ভাবো ও আস্পদ্দাটা একবার। আমার কিন্তু তখনি আপত্তি ছিল ওইরকম একটা উটকো জোয়ান বাড়ির মধ্যে ঢোকাতে…কেউ শুনল না। এখন দেখ, তার ফল তোমরা……

সরকারমশাই নির্বাক। এ সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করা সমীচীন নয় তাঁর পক্ষে। চুপচাপ দাঁড়িয়েই থাকেন মাথা নিচু করে।

কর্তাবাবু বলেন, আচ্ছা তোমার কী মনে হয়, ও সত্যিই তেমন কিছু করতে পারে?

—না হুজুর। এ কি মগের মুলুক নাকি? যে যা খুশি তাই করবে? কোথাকার হাঘরে এক ছোটলোক—

যা বলেছ সরকার। কর্তাবাবু খুশি হয়ে মাথা নাড়েন।

—তাছাড়া হুজুর, অত তর্জন গর্জন যার, তার কথার কোনও দাম নেই।

—না না ভূপাল। তবু আমাদের খুব সাবধানে থাকতে হবে এখন।

—সে তো নিশ্চয়ই হুজুর।

—বিশেষ করে আবার ওই পোড়ো বাড়ির দিকটা। খুব লক্ষ রাখবে। জঙ্গলের মধ্যে নাকি রাত্তিরে লোক ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায় এখন? আচায্যিমশাই কাল ভয় পেয়েছে কাকে দেখে? লক্ষণগুলো মোটেই ভাল নয় কিন্তু।

—কোনও চিন্তা করবেন না হুজুর। ওদিক দিয়ে খুব সুবিধে হবে বলে মনে হয় না।

—দেখ ভূপাল, আমার মনে হয়, তুমি নিজেই একটু নজর রাখ ওদিকে— সেটাই সবচেয়ে ভাল।

—যা হুকুম করেন আপনি, হুজুর।

—আর কাউকে বলবে না কিন্তু এসব। ব্যাপারটা কিন্তু খুবই গোপন।

—গোপন থাকবে কর্তা।

—আর একটা কথা সরকার···একটু দ্বিধা করেন যেন কর্তাবাবু। পরে গলা নামিয়ে বলেই ফেললেন, লাবির মনের ভাবটা কিছু বোঝ এখন? এখনও কি ওই হতভাগা শয়তানটার জন্যে

সরকার জিভ কাটলেন। যেন খুবই পাপ কথা শুনে ফেলেছেন একটা। সবেগে মাথা নেড়ে বললেন,—একেবারেই না হুজুর; লাবি দিদিমণি ওসব কথা কবে ঝেড়ে ফেলেছে মন থেকে। ও আর পাত্তা পাবে না এখানে।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন একটা কর্তাবাবু। বললেন,—আমারও তাই মনে হয়, সরকার। গানের এই নতুন মাস্টারটা খুব ভাল হয়েছে। মনটা ঘুরিয়ে দিয়েছে বোধহয় লাবির। আর কী সুন্দর একখানা গলা! বল?

—একেবারে খাঁটি কথা কর্তাবাবু! মানুষটা বড় ভাল। মথুরাবাবু মনের মতো মাস্টার হয়েছেন আমাদের।

—সবই তো বুঝি ভূপাল। কিন্তু আসল ব্যাপারটাই যে কী রকম গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে। লাবির বয়েসটা তো কম হল না··

চাপা নিশ্বাস ফেললেন একটা পন্নগবাবু।

কর্তাবাবুর মনের কথাটা বুঝেও সরকার চুপ করে থাকেন। ছোট মুখে বড় কথা বলা সাজে না। এ সব ব্যাপারে তিনি খুব হুঁশিয়ার। কখনও সীমানাটা ছাড়ান না তাঁর এক্তিয়ারের।

প্রসঙ্গটা চাপা দিতেই হঠাৎ বললেন, হুজুর আপনার জন্যে চা নিয়ে আসব এক কাপ ?

—না, না, ও সবের কোনও প্রয়োজন নেই। তুমি আমার কাছেই একটু থাক। মনটা বড় উতলা লাগছে আজ। কী যে আমার করা উচিত, কী উচিত নয়—কিছুই ঠিক করতে পারছি না।

উপযুক্ত বয়েসের মেয়ে নিয়ে কর্তাবাবুর উদ্বেগ—বিশেষত এই পরিস্থিতিতে, খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তবুও মূল গোলমালটা যে কোথায় তাও সরকারবাবুর অজানা নয়। বড় ঘরের ব্যাপার। এ সব জানলেও, কিছু বলতে নেই। তাই চুপচাপই দাঁড়িয়ে থাকেন।

পন্নগভূষণ হঠাৎ বললেন, তুমি ওই ডিটেকটিভ ভদ্রলোককে একবার ধরো দেখি। ওঁকে ব্যাপারটা জানানো দরকার একবার।

—নিশ্চয়ই হুজুর! আমি দেখছি—

সরকারমশাই ঘরের কোণে টেলিফোন ডাইরেক্টরির পাতা ওল্টাতে থাকেন দ্রুত।

—এ কি! নাম্বারটা তুমি লিখে রাখনি ভূপাল ?

—আজ্ঞে আমি তো সেদিন ছিলাম না ঘরে।

—ও। ঠিক আছে, তুমি সুখেন্দুকেই ধরে দাও। আমি বলে দিচ্ছি।

অফিসেই পাওয়া গেল সুখেন্দুবাবুকে। সরকারমশাই রিসিভারটা কর্তাবাবুর সামনে এনে রাখলেন।

পন্নগভূষণ গম্ভীর গলায় বললেন, কে, সুখেন্দু। আমি মেসোমশাই বলছি।

—হ্যাঁ বলুন, মেসোমশাই।

—শোনো, তুমি কি একটু ডিটেকটিভ চ্যাটার্জির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে আজ ?

—হ্যাঁ নিশ্চয়ই। মিঃ চ্যাটার্জি আজ নিজেই একবার যাবেন বলে কথা আছে।

—যাক্! তাহলে তো ভালই হল।

—কিন্তু ব্যাপারটা কী, বলুন তো মেসোমশাই ? কোনও গোলমাল হয়নি তো ?

—আজ সকালে একটা চিঠি এসেছে লাবির নামে। বিশ্রী একটা চিঠি। সেই ব্যাপারেই কিছু পরামর্শ দরকার। তুমিও পারলে একটু সকাল সকাল চলে এসো—।

—চিঠি এসেছে মানে, কার চিঠি ? কে দিয়েছে।

—কে আবার, সেই বদমায়েস ছোকরা! রাজেশ।

—বলেন কি! সেটা কী করে সম্ভব! সে তো এখন জেলে!

—এলেই নিজের চোখে দেখতে পাবে।

—চিঠির বক্তব্যটা কী মেসোমশাই ?

—খুব খারাপ। যতো সব আজেবাজে কথা। মাথা গরম হয়ে যায় পড়লে।

—ও নো—আপনি একদম ভাববেন না এ সব নিয়ে মেসোমশাই। আমরা দেখছি। আসলে ও বুঝে গেছে আর কিছু করতে পারবে না। তাই চিঠি দিয়ে ভয় দেখাচ্ছে।

—তুমি কি বলছ সুখেন্দু! ছোকরা রীতিমতো থ্রেট করেছে আমাদের! বলছে, দরকার হলে খুন-জখম করেও নাকি লাবিকে ও তুলে নিয়ে যাবে। ভাবতে পার ?

—ও মেসোমশাই, প্লিজ। একটু শান্ত হয়ে থাকুন আপনি। সে রকম বুঝলে আবার পুলিশ পোস্টিং চলবে আমাদের। আমি আসছি, বিকেলে ডিটেকটিভ চ্যাটার্জিকে নিয়ে। আপনি চিন্তা করবেন না।

ফোনটা রাখতে গিয়েও পারেন না সুখেন্দু। কর্তাবাবু বলেই চলেছেন তেমনি·

—আর কি অসভ্য ইতরের মতো ভাষা চিঠির। মাথাটা আমার জ্বলছে সকাল থেকে। কোমরে দড়ি বেঁধে ছোকরাকে আগাপাসতলা চাবকাতে পারলে শান্তি হত।

—সবই বুঝতে পারছি আমি, মেসোমশাই।

সুখেন্দুর গলাটা একটু অন্যরকম শোনাল। আফসোসের সুর যেন সামান্য। রাজেশ তো তাঁরই ঠিক করা লোক ছিল। অপরাধ আর অনুশোচনা বোধটা এখনও খোঁচা দেয় মাঝে মাঝে।

একটু থেমে আবার বললেন, মেসোমশাই চিঠিটা লাবি দেখেনি তো ?

—পাগল হয়েছে ? আমি ছাড়া এখনও আর কেউ দেখেনি। শুধু সরকারমশাই ব্যাপারটা সব জানেন।

—সরকারমশাই ?

—হ্যাঁ। চিঠিটা দেখে তারই সন্দেহ হয় প্রথমে। তারপর আমার কাছে নিয়ে আসে।

খানিকক্ষণ যেতেই লাঞ্চ আওয়ারে দেবদত্তকে ফোনে পেলেন সুখেন্দু,—মিঃ চ্যাটার্জি ? গুড মর্নিং, সুখেন্দু বোস বলছি।

—আরে! বলুন, বলুন। আপনার কথাই ভাবছিলাম একটু আগে।

—অসীম সৌভাগ্য আমার! আচ্ছা. রাজেশ কি জামিন পেয়ে গেছে ?

—ও ইয়েস। কিন্তু কেন, কিছু করেছে নাকি আবার ?

—পল্লবী দত্তের নামে একটা চিঠি দিয়েছে।

—ও এই ব্যাপার! তা দিতেই পারে। পয়সা দিয়ে ডাকটিকিট লাগালেই যখন ডাকবিভাগ চিঠি পৌঁছে দেয়, তখন পল্লবী দত্তের কাছে তার বিতাড়িত প্রেমিক দুটো মনের কথা লিখে পাঠাতেই পারে। এ নিয়ে এত উত্তেজিত হবার কী আছে আপনাদের?

—কিন্তু চিঠির ভাষাটা যে তেমন সুবিধের নয়, মিঃ চ্যাটার্জি। ও আবার থ্রেটনিং দিয়েছে, পল্লবীকে তুলে নিয়ে যাবে বলে। পন্নগবাবু ভীষণ উদ্বিগ্ন। আপনার সঙ্গেই কথা বলতে চান।

—পল্লবীর রিঅ্যাকশানটা কী?

—পল্লবী দেখেনি। পন্নগবাবু পড়ে নিজের কাছেই রেখে দিয়েছেন চিঠিটা। আপনাকেই দেখাতে চান সবার আগে। যেতে হবে একবার আজ।

—আই সি!'

—আপনি তো বলেছিলেন, আজ পোড়ো বাড়ির জঙ্গলে একবার হানা দেবার কথা।

—কিন্তু সেটা সবাইকে জানিয়ে নয়, মিঃ বোস। আমি আর রাতুল রাত্তিরে গিয়ে চুপি চুপি এক সময় ঢুকে পড়ব, কথা ছিল। এবং প্ল্যানিংটা শুধু আপনিই জানতেন।

—সরি। তা ফেরার আগে একটু রাত্তির করে আজই না হয় ঢুকে পড়বেন। এবং পারমিশান পেলে অধমও সঙ্গে থাকতে পারে আপনাদের।

দেবদত্ত চুপ করে থাকে ওপাশে। কী ভাবে নিজের মনে।

—ব্যাপারটা সম্পূর্ণই আপনার ওপর নির্ভর করছে, মিঃ চ্যাটার্জি। আপনি যা বলবেন তাই। কিন্তু এদিকে সিনিয়র দত্তসাহেব, আই মিন পন্নগবাবু, ভীষণভাবে এক্সপেক্ট করছেন আপনাকে। কী বলব আমি?

—অফকোর্স আয়াম কামিং। তাই বলে দিন। এই ধরুন পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা নাগাদ চলে যাব।

—ভেরি গুড। আমিই আপনাকে তুলে নিয়ে যাব। ঠিক আছে?

—থ্যাঙ্ক য়ু মিঃ বোস। ইজ ইট অলসো এ থ্রেটনিং?

সুখেন্দুবাবু হাসলেন।

ছটা বাজতে না বাজতেই সুখেন্দুর বিশাল গাড়িটা এসে দাঁড়াল দত্তভিলার সামনে। সুখেন্দুর সঙ্গে দেবদত্ত আর রাতুল। সরকারমশাই নিজেই দাঁড়িয়েছিলেন সবাইকে অভ্যর্থনা করার জন্যে। আজ আর বৈঠকখানার ঘরে নয়। সোজা ওপরে নিয়ে গেলেন সবাইকে। কর্তাবাবুর অফিস ঘরে।

গোটা বাড়িতেই যেন চাপা উত্তেজনা একটা। কারণটা হয়তো স্পষ্ট নয় সবার কাছে। তবুও উত্তেজনা। রাতুল অনুভব করতে পারছিল বেশ ব্যাপারটা।

পরিক্ষিৎ আর পুরন্দর ইতিমধ্যেই এসে পড়েছেন। চাপা গলায় ঘরের মধ্যে আলোচনা চলছে পন্নগবাবুর সঙ্গে। দরজার বাইরেও পায়ের শব্দ ক্রমাগত। হালকা ভারী, দ্রুত। ফিসফাস কথা বলার আওয়াজ। কিছু যেন একটা ঘটতে চলেছে এ বাড়িতে। কিন্তু সেটা কী, জানা যাচ্ছে না। রহস্যের আড়ালে ঢাকা আছে এখনও।

পন্নগভূষণের মুখ গম্ভীর। চশমার আড়ালে তীক্ষ্ন কঠিন দৃষ্টি। হঠাৎ দেবদত্তকে দেখে সজাগ হয়ে উঠল দৃষ্টিটা। হাত তুলে নমস্কার করে বললেন,—আসুন মিঃ চ্যাটার্জি, আসুন।

পরিক্ষিৎ বললেন, সব শুনেছেন নিশ্চয়ই।

—মোটামুটি। দেবদত্ত হাসল, পাশের চেয়ারে বসে।

—স্কাউন্ড্রেলটার এত বড় সাহস হবে, ভাবতে পারেন? খুবই উত্তেজিত দেখায় পরিক্ষিৎকে।

—এর মধ্যে খুব সাহসের পরিচয়টা কোথায় পেলেন?

—কী বলছেন! ওই রকম একটা লোফার ছেলে, দত্তবাড়ির মেয়েকে এই ভাষায় চিঠি লিখবে! কী নির্লজ্জ আর কুৎসিত সব কথা। ওকে তো এখনই পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া উচিত।

দেবদত্ত আবার হাসল, আপনারা খুবই হার্ট হয়েছেন বুঝতে পারছি। কিন্তু একটু শান্ত মাথায় ভেবে দেখুন তো ঘটনাটা। এক, ছেলেটা চিঠি লিখেছে তার এক পুরনো ছাত্রীকেই। দুই, তার নিজের স্ট্যান্ডার্ড যেমন, তার লেখার ভাষাটাও তেমন হওয়া স্বাভাবিক। খুব ভদ্র সংযত কোনও ভাষা আপনি নিশ্চয়ই আশা করতে পারেন না। তিন, পুলিশে ধরাতে হলে আপনাকে প্রমাণ দিতে হবে যে, এই চিঠিটা রাজেশ ঠাকুরই লিখেছে। সেটা পারবেন কি?

পরিক্ষিৎ এবং পুরন্দর দুজনেই উত্তেজিতভাবে কিছু বলতে গিয়েও থমকালেন। কর্তাবাবু মাঝখানে হাত বাড়িয়ে বাধা দিয়ে বললেন, —আঃ আগে চিঠিখানা ওঁকে দেখতে দাও তোমরা।

তিনিই দেরাজ থেকে খামটা বার করে দেবদত্তের হাতে দিলেন। একটু যেন অস্বস্তি লাগে চিঠিটা দেখে। তবু ধীরে ধীরে পড়তে শুরু করে দেবদত্ত।

নিজের মনেই বিড়বিড় করেন কর্তাবাবু, দেখুন আপনি পড়ে। এ রকম একটা চিঠি পেলে কি মাথা ঠিক রাখা যায়! ওদের আর কী দোষ, আমিই পারছি না…।

দেবদত্ত কোনও উত্তর দেয় না। অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে যেন পড়ছে চিঠিখানা। প্রতিটি লাইন, প্রতিটি শব্দ। মোটামুটি বেশ বড় আকারের চিঠি। দামি কাগজে ঝকঝকে টাইপে লেখা। অজস্র ভুল, ভাষার মধ্যে। অনেকটা অফিশিয়াল চিঠির মতো চেহারা। অথচ সই নেই, ঠিকানা নেই, তারিখ নেই। কোনও কিছুই নির্দিষ্ট

করে শনাক্ত করার উপায় রাখেনি পত্রলেখক। একদম শেষে একটিমাত্র সংকেত— আর. টি.। দুটো ক্যাপিটাল অক্ষরের মধ্যে তার নামের ইঙ্গিত।

অর্থাৎ রাজেশ ঠাকুর। যার জন্যে এই চিঠি তার কাছে হয়ত এইটুকুই যথেষ্ট। গোটা চিঠির প্রধান বক্তব্য, আমি তোমাকে কী পরিমাণ ভালবাসি। তার ভূরি ভূরি ব্যাখ্যা। এবং জগতের কোনও শক্তিই আমাদের আর আলাদা করে রাখতে পারবে না। দরকার হলে খুন জখম করেও আমি তোমাকে উদ্ধার করব, ডার্লিং।

উপযুক্ত ভাষা রাজেশ ঠাকুরের পক্ষে। কোনও সন্দেহ নেই। অন্তত তার প্রেমিকা পল্লবী দত্তকে অভিভূত করার পক্ষে যথেষ্ট। পড়তে পড়তে তার 'আর. টি'-কে, চাই কি, জেমস বণ্ড বা টার্জানের মতো একজন হিরোও মনে হতে পারে। এদিক থেকে রাজেশ এবার ঠিক টার্গেটেই হিট করেছে।

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আর একবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চিঠিখানা দেখতে থাকে দেবদত্ত। মুখ না তুলেও এখন সে অনুমান করতে পারছিল, উপস্থিত প্রতিটি ব্যক্তিরই চোখ এখন তার দিকে। একমাত্র রাতুল ছাড়া।

রাতুলের ভূমিকা এখন অবশ্যই ঘরের আর সবাইকে লক্ষ রাখা। প্রত্যেকের হাব-ভাব আচরণ। পন্নগভূষণ অতীব গম্ভীর, চিন্তাকুল। পরিক্ষিৎ পুরন্দর এখনও ক্ষিপ্ত। মনে মনে অস্ফালন চলছে হয়তো একটা। সুখেন্দু অন্যমনস্ক, বিষণ্ণ। সরকারমশাই সদাসতর্ক। অদ্ভুত একটা চতুর দৃষ্টি ঘোরে চোখে। দরজার বাইরেও কে যেন দাঁড়িয়ে! দুটো গভীর কালো চোখ। আড়াল থেকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে এদিকে। একবার তার নজর পড়তেই দ্রুত সরে গেল···

রাতুল তাকিয়েই থাকে। কিন্তু আর দেখা যায় না।

চিঠি পড়া শেষ করে এবার লেফাফাখানা পরীক্ষা করে দেবদত্ত। উল্টে-পাল্টে ভাল করে দেখে। তারপর হঠাৎ ঘোষণা করে, এ চিঠিখানা তো ডাকে আসেনি মিঃ দত্ত। কেউ হাতে করে এনেছে।

—সে কী বলছেন! পন্নগভূষণ চমকে প্রায় লাফিয়ে ওঠেন যেন।

—দেখুন এই সিলমোহরটা, অস্পষ্ট একটা জাল ছাপমারা। পোস্ট অফিসের সিল এ রকম হয় না। আর ডাকটিকিটটা ধোঁকা দেবার জন্যে মারা। অথবা ভেবেছিল ডাকে পাঠাবে হয়তো। কিন্তু পাঠায়নি।

—কিন্তু সরকারমশাই তো ডাকবাক্স থেকেই এনেছে চিঠিখানা।

—হতে পারে। ওখানেই ফেলে গেছে কেউ।

—সে কি কথা। দেখি তো—

বলেই সরকার মশাই হুমড়ি খেয়ে সবার আগে দেখতে থাকেন ছাপটা। পরিক্ষিৎ, পুরন্দর, কর্তাবাবু সবাই বিমূঢ় দৃষ্টিতে মুখ চাওয়াচায়ি করেন।

দেবদত্ত একটু চিন্তা করে নিজের মনে। পরে বলল, বাইরের লোকই কেউ

এসেছিল···রাজেশ একটা হামলায় জড়িয়ে ইতিমধ্যে পুলিশ হাজতে ছিল। মনে হচ্ছে, সেখান থেকে বেরিয়েই চিঠিটা হাতে হাতে পাঠিয়েছে।

পন্নগবাবু বললেন, কী আশ্চর্য। আমি তো কিছুই বুঝতে পারিনি।

—কী সরকারমশাই, আপনার কী মনে হয়? দেবদত্ত এবার সরাসরি তাঁর দিকে তাকায়।

সরকারবাবু একটু ঘাবড়েই গেলেন যেন। আমতা আমতা করে বলতে থাকেন,—হ্যাঁ স্যার, আপনি যখন বলছেন, তাই হবে। বাইরে থেকেই কেউ এসেছিল নিশ্চয়ই।

—এসে কার হাতে দিল চিঠিটা?

—আজ্ঞে? হাতে কেন দেবে? ডাক বাক্সেই ফেলে গেল।

—ও। কিন্তু একটা অচেনা লোক এই দুর্গের মধ্যে ঢুকে লেটার বক্সে অনায়াসে একটা চিঠি ফেলে চলে গেল! আপনাদের এত লোক—কারও চোখে পড়ল না! একটু আশ্চর্য ঠেকছে না? ভেবে দেখুন আপনি—

পরিক্ষিতের চোখ দুটো চকচক করে ওঠে। সবাই তাকিয়ে আছে এখন সরকার-মশাইয়ের দিকে।

ভদ্রলোক মাথাটা নামিয়ে খুবই কুণ্ঠিতভাবে বলেন,—আজ্ঞে, কালকের দিনটা বড় তালবেতালে গেছে। ভীষণ হইচই আর গণ্ডগোল ছিল বাড়িতে। সুযোগ পেয়ে বাইরের রাস্তার লোকজনও ঢুকে পড়েছিল দু চারজন। এখন তার মধ্যে যদি কেউ কাজটা করে গিয়ে থাকে···

বাইরে মেঘ ডেকে উঠল হঠাৎ। সরকার মশাইয়ের কথার মধ্যেই যেন সবাইকে চমকে দিয়ে কড়কড় করে ডেকে উঠল আকাশটা। ঝড় আসছে। মেঘটা জমছিল অনেকক্ষণ ধরেই। এবার ঠাণ্ডা হাওয়া ছাড়ল। বিদ্যুৎ চমকাল ঘন ঘন। আকাশে বছরের প্রথম কালবৈশাখীর আয়োজন শুরু হয়ে গেল প্রবলভাবে।

দেবদত্ত জানলার বাইরে আকাশটা দেখতে দেখতে বলল, কেন, গণ্ডগোল কেন? কিসের জন্যে গণ্ডগোল হল বাড়িতে?

কালো সিসের মতো মেঘে ঢেকে যাচ্ছে আকাশে। বিদ্যুৎ চমকাল তীব্র ঝলক দেখিয়ে।

সরকারমশাই তখন ধীরে ধীরে সব বর্ণনা করেন।

সকালবেলায় জঙ্গলে ছুটকির সঙ্গে পাগলার দেখা হওয়া, তারপর হঠাৎ তার তাড়া খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে আসার কাহিনী। চারদিকে কী দারুণ সোরগোল তাই নিয়ে। নকুলবাবুর দা নিয়ে পাগলাকে কাটতে যাবার কাহিনী। তাঁর হইচই চিৎকার চেঁচামেচি। তারপর রাত্তির বেলায় সেই ব্যাপার নিয়ে আবার এক প্রস্ত নাটক নকুলবাবুর। পোড়ো বাড়ির মধ্যে ভূত দেখে আছাড় খেয়ে পড়া—মারে,—বাবারে—করে ভয়ে ছুটতে ছুটতে পালিয়ে আসা···

সমস্ত সবিস্তারে বর্ণনা করতে থাকেন সরকার।

দেবদত্ত চোখ বন্ধ করে প্রতিটি খুঁটিনাটি শোনে মনোযোগ দিয়ে। আর কোনও দিকে যেন খেয়াল নেই। পরে নিজের মনেই মাথা নাড়ে, —ইয়েস! কোয়াইট পসিবল। ভিড়ের মধ্যে একজন এসে ঢুকে পড়া আশ্চর্য নয়। কী বল রাতুল?

রাতুল মাথা নেড়ে সায় দেয়।

তার চোখ দুটো তখনও দরজার বাইরে সেই অদৃশ্য কাজল-কালো দৃষ্টির সন্ধান করছিল।

৯

অনেকক্ষণ ধরেই চলল কালবৈশাখীর দাপটটা।

বছরের প্রথম কালবৈশাখী। যেমন ঝড়ের বেগ তেমনি মেঘের গর্জন। তারপর ধীরে ধীরে একসময় সব থেমে গেল। সন্ধ্যার আকাশে তারা ফুটতে লাগল একটা দুটো করে।

ক্ষুব্ধ পন্নগভূষণও আস্তে আস্তে অনেক শান্ত হলেন এবার। অপমানের চেয়ে দুশ্চিন্তাই বেশি। দেবদত্তের সঙ্গে কথা বলে মনের দুশ্চিন্তাটা যেন অনেকটা কাটল আগের চেয়ে। সত্যি, সবদিকেই প্রখর নজর ডিটেকটিভ চ্যাটার্জির। বিশেষ করে রাজেশ ও তার দলবলের খবর যে ভদ্রলোকের নখদর্পণে, এটা জেনেই আরও স্বস্তি।

ফোন নাম্বারও লিখে নিলেন এবার তিনটে। প্রয়োজনে যে কোনও সময় যোগাযোগ করা যাবে ভদ্রলোকের সঙ্গে। হ্যাঁ, এইটেই খুব দরকার এখন। চারদিকে শেয়াল কুকুরের মতো হন্যে হয়ে ঘুরছে শয়তানগুলো। কখন কী মূর্তিতে দেখা দেবে, কেউ জানে না।

আর এ বাড়িতে উটকো লোকের আনাগোনার তো বিরাম নেই। ঘরের মধ্যে নিজেরাই শত্রু ঢুকিয়ে রেখেছেন। তার ফল ভোগ করতে হবে এখন। যেমন পাজি ওই ষণ্ডা নকুল আচায্যি, তেমনি নচ্ছার বউটা। একেবারে সোনায় সোহাগা। ওদের জন্যেই আরও যত সব বদমায়েস, ছোটলোকের দল···

—কিন্তু মিঃ দত্ত, একটা ব্যাপারে আপনাদের সতর্ক থাকতে হবে।

—আজ্ঞে। কর্তাবাবু চমকে তাকালেন দেবদত্তের দিকে।

—মানে, ফোন ধরার ব্যাপারে। অন্তত বেশ কিছুদিন—। দেবদত্ত সবার দিকেই তাকায় কথাটা বলতে বলতে।

—কেন? একথা বলছেন কেন? পন্নগবাবুর মনের ভাবনাটা সম্পূর্ণ ওলট-পালট হয়ে যায় যেন।

—বলছি, কারণ অনেক আজে বাজে ফোন আসতে পারে এখন। কিছুদিন আপনার মেয়েকে কোনও ফোন রিসিভ করতে দেবেন না। আগে অন্য একজন কথা বলে ভাল করে বুঝে নেবেন ব্যাপারটা।

—না না, পন্নগবাবু মাথা নাড়েন, দত্তবাড়ির মেয়েরা কেউ কোনও ফোন ধরবে না। ধরেও না।

পরিক্ষিৎ বললেন, মিঃ চ্যাটার্জি, এ ব্যাপারে আমরা কিন্তু খুবই রক্ষণশীল। এ বাড়ির মেয়েরা কখনও নিজের হাতে ফোন তোলে না। দফতরটা পুরো সরকার-মশাই আর বাবার কণ্ট্রোলে। ওঁরাই বিবেচনা করে দেখেন, কাকে কী বলতে হবে, বা ডেকে পাঠাতে হবে।

—আপনাদের ঘরে কোনও লাইন নেই ?

—না, ইচ্ছে করেই কোনও এক্সটেনশান রাখিনি, পরিক্ষিৎ মাথা নাড়েন। আমরা অফিস ঘরে এসেই কথা বলি। বা সরকারমশাই আছেন আমাদের, যখন যার প্রয়োজন খবরটা ঠিক পৌঁছে দেন ঘরে।

দেবদত্ত বলল, যাক্। একদিক দিয়ে অন্তত নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। পল্লবীকে টেলিফোনে টিজ করার কোনও সুযোগ পাবে না ওরা।

—সেইজন্যেই তো সরকারবাবুর পাহারায় রাখা ওটা। তাছাড়া, পাড়া-প্রতিবেশীদেরও ব্যাপার আছে, দু-একজন এসে একটা ফোন করতে চায়। ঘরের মধ্যে তো ঢোকানো যায় না সবাইকে। পন্নগবাবু মাথা দুলিয়ে বললেন।

—তা বটে। দেবদত্ত মাথা নাড়ে।

সরকারমশাইয়ের দিকে দেখল একবার। গোঁফজোড়া ঝুপসি হয়ে ঝুলে পড়েছে মুখের দুপাশে। মুখ নিচু করেই দাঁড়িয়ে আছেন। তার মধ্যেও চোখ দুটো কেমন পিটপিট করে ঘুরছে। একটু ঘনিষ্ঠ সুরে বলল, তাহলে সরকারমশাই, আপনিই নজর রাখছেন সব ভাল করে। এ রকম চিঠি আরও আসতে পারে দু একটা। তারপর বলা তো যায় না, হয়তো আপনার সঙ্গে এসেই আলাপ জমাতে চেষ্টা করতে পারে ওরা। দেখবেন, আবার ফাঁদে পা দিয়ে বসবেন না যেন···

—না না, স্যার, সে কি বলছেন! সরকারের গোঁফজোড়া যেন এবার ঝাঁকুনি খেয়ে লাফিয়ে ওঠে। খুবই অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে প্রতিবাদ করতে থাকেন তিনি, না স্যার, কক্ষনো না। আমার কাছে কোনও লোক ঘেঁসতে পারবে না। আমি সব সময় হুঁশিয়ার··· ।

দেবদত্ত মৃদু হাসল, সেইজন্যে তো চিন্তা। বুঝলেন না, এক আপনাকে হাত করতে পারলেই যে কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায় ওদের।

পন্নগভূষণ জোর দিয়ে বললেন, না মিঃ চ্যাটার্জি, সরকারকে নিয়ে কোনও ভয় নেই। খুব বিশ্বাসী লোক আমাদের। একরকম ঘরেরই মানুষ। ওকে দিয়ে ওসব কাজ করতে পারবে না কেউ।

অনুগত সরকারমশাই খুব খুশি হলেন, যেন কথাটা শুনে। কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন কর্তাবাবুর মুখের দিকে।

পন্নগভূষণ বললেন, যাও তো ভূপাল, একবার ভেতরে যাও। তোমার কর্তামাকে কিছু জলখাবারের ব্যবস্থা করতে বলো। বাড়িতে সব মাননীয় অতিথিরা এসেছেন…।

পরিক্ষিৎ বাধা দিয়ে বললেন না বাবা, এখানে নয়। আমার ঘরেই ব্যবস্থা হয়েছে। আমরা এবার ওখানে গিয়েই বসছি একটু।

—ও। কর্তাবাবু একটু অবাক হয়ে তাকালেন। ব্যবস্থাটা তাঁর মনঃপূত কি না ঠিক বোঝা যায় না।

সুখেন্দুও বললেন, হ্যাঁ মেসোমশাই। ওখানেই আরও কিছু পরামর্শ করা দরকার আমাদের।

—তা বেশ। পন্নগভূষণ মাথা নাড়লেন।

হয়তো তাঁর সামনে নেশা টেশা করার অসুবিধে হচ্ছে ছেলেদের। ভেবে আর কথা বাড়ালেন না।

বেশ সাজানো গোছানো সুন্দর ড্রয়িং রুম পরিক্ষিৎবাবুর। পুব দক্ষিণে প্রশস্ত খোলা জানলা। লেস্ বসানো ছোট ছোট পর্দার ওপরে আকাশ দেখা যায় অনেকখানি। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার আকাশ। সেখানেই এনে বসালেন সুখেন্দু তাদের। দেবদত্ত আর রাতুল পাশাপাশি। সম্পূর্ণ আলাদা মহল একটা।

সামনেই মেহগনি কাঠের শোকেসের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড লক্ষ্মীপ্যাঁচার মুখ। একেবারে জ্যান্তপাখির মতো খরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ চমক লাগে চোখাচোখি হলে। একবার দেখেই চোখ ঘুরিয়ে নেয় রাতুল।

বাইরে কোথাও ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। এ অঞ্চলটা সত্যিই খুব নির্জন এখনও।

সুখেন্দুবাবু বসেই আগে একটা সিগারেট ধরালেন। দেবদত্তের দিকেও খোলা প্যাকেট বাড়িয়ে ধরলেন, নিন একটা সিগারেট খান—

রাতুল চটপট অন্য দিকে তাকায়। এতক্ষণ ধূমপান না করে সত্যিই যেন হাঁপিয়ে উঠেছেন ভদ্রলোক।

পুরন্দরবাবু এসে ঢুকলেন একটু পরে। খুব সাজগোজ করে এসেছেন। লুটোনো ধুতির কোঁচাটা হাতে নিয়ে বললেন, সুখেন্দুদা, আপনারা বসুন, আমি একটু বেরুচ্ছি।

—সে কি! কোথায় চললে?

—নেমন্তন্ন আছে একটা। গান বাজনার আসর আর কি—। মৃদু হাসি পুরন্দরের মুখে। একটু আগের সেই ক্ষিপ্ত ভাবটা একেবারেই আর নেই।

সুখেন্দু বললেন, ও। এসো তাহলে।

—চলি মিঃ চ্যাটার্জি। হাতজোড় করেন এবার দেবদত্তের দিকে।

--ও শিয়োর। আসুন—। দেবদত্ত হাত তুলল প্রতি নমস্কারে।

দূরে আকাশটা ডেকে উঠল গুড়গুড় করে। দেবদত্ত বাইরে তাকায়। আকাশে তারা নেই। কখন আবার মেঘ জমেছে। ব্যাঙ ডাকছে দূরে কোথায়। পোড়ো বাড়ির জঙ্গলেই হয়তো। দুর্যোগটা কি আবার শুরু হয়ে যাবে? মনে মনে ভাবে দেবদত্ত।

পরিক্ষিৎবাবু পায়ের ওপর পা তুলে বললেন, কী হবে আমাদের সুখেন্দুদা? চা না অন্য কিছু?

সুখেন্দু হাসলেন সামান্য। তারপর বললেন, আগে এক কাপ চা-ই হোক না ভাল করে।

মতলবটা বুঝতে তাঁর অসুবিধে হয় না ক্ষিতির। দু ভাইয়ের একই উদ্দেশ্য এখন। পুরো তো বেরিয়েই গেল। ক্ষিতির ইচ্ছে ঘরেই বসায় আসরটা। একবার ক্লাবে যাবারও প্রস্তাব দিয়েছিল।

পরিক্ষিৎ বললেন, খাবারটাও দিতে বলি তাহলে।

সিংহাসন পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বাবুর হুকুমের অপেক্ষায়।

—ওসব পরে হবে। তুমি মৌলিকে ডাক না আগে। অতিথিদের সঙ্গে একটু আলাপ পরিচয় হোক ঘরের মালকিনের। তবেই না আপ্যায়ন, কী বলেন মিঃ চ্যাটার্জি?

দেবদত্ত হাসল নিঃশব্দে। ভঙ্গিটা যেন—নো কমেণ্টস।

পরিক্ষিৎ তুড়ি মেরে সিগারেটের ছাই ঝেড়ে ডাকলেন, মৌ, প্লিজ কাম হিয়ার—

পরক্ষণেই সবাই হাজির দেখতে দেখতে। সাজগোজ করে ভিতরে যেন অপেক্ষাই করা হচ্ছিল, কখন ডাক পড়ে।

সবার আগে মৌলি, গোলগাল সুন্দর ভরাট মুখ। হিরের নাকছাবির ঝলক যেন তাঁর উজ্জ্বল হাসির মধ্যেও ঝলসাচ্ছে। কে বলবে জুঁইয়ের মতো একটা অত বড় মেয়ে আছে তাঁর।

শৈলীর চোখে মুখে নানা রঙের খেলা। হাতভর্তি বাহারি চুড়ি, গলায় মালা। গোটা শরীরটা যেন নেচে ওঠে তার চলনভঙ্গির মধ্যে।

সবার পিছনে জুঁই। কিন্তু তার দিকেই চোখ যায় আগে। সদ্য যৌবনে পা দেওয়া ঝকঝকে উজ্জ্বল কিশোরী। টলটলে কালো চোখে উপচে-পড়া যেন এক অদ্ভুত দৃষ্টি। একই সঙ্গে বিস্ময়, সঙ্কোচ আর লজ্জার আভা!

রাতুল অবাক হয়ে ভাবে, এই সেই জুঁই! দারুণ স্মার্ট দেখতে তো।

দেবদত্ত আর রাতুল দুজনেই উঠে দাঁড়ায়। সুখেন্দুই পরিচয় করিয়ে দেন একে একে সবার সঙ্গে।

একগাল হাসিতে মুখ ভরে গেল মৌলির, উঃ আমার মেয়ে তো কখন থেকে

ছটফট করছে, আপনাদের দেখবে বলে। চোখের সামনে দুজন জ্যান্ত ডিটেকটিভকে। কই জুঁই এবার কথা বলো—

জুঁই লাজুক চোখে তাকায় রাতুলের দিকে।

রাতুল হাসল, হেলো জুঁই! অ্যাট লাসট য়ু সি, জাস্ট সাম্‌ অর্ডিনারি পিপল—ইজিপ্ট ইট?

জুঁই মৃদু হেসে মাথা নাড়ে—ও নো।

শৈলী বলল, শুধু জুঁই কেন? আপনাদের সম্বন্ধে আমারও খুব কৌতূহল। এতদিন তো শুধু বইয়ে পড়েছি।

—আর এখন? খুব হতাশ হলেন তো। দেবদত্ত বলল বিনীত ভঙ্গিতে।

—ও মা, কেন? না না—। মৃদু আর্তনাদ করে যেন নেচে ওঠে শৈলী।

—অবশ্য জুঁইয়ের কারণটা আমি আন্দাজ করতে পারি। মৃদু হাসি দেবদত্তের মুখে, হ্যাঁ জুঁই, এই সেই রাতুল সেন। দ্যাট ইয়াং ম্যান উইথ ফ্যানটাসটিক আইডিয়াজ।

রাতুল হাসল সপ্রতিভ ভঙ্গিতে জুঁইয়ের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে।

জুঁইয়ের মুখটা লাল। একবার, থ্যাঙ্ক য়ু, বলেই চোখ নামিয়ে নেয়, লজ্জায়। সবাই তাকিয়ে দেখছে তার দিকে। মা, বাবা, শৈলীমাসি।· ·

পরিক্ষিৎ বললেন, কী ব্যাপার সুখেন্দুদা?

—ব্যাপারটা শুনবে? খুবই মজার ঘটনা, আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম, হ্যাঁ জুঁই, দিস ইজ দ্যাট ইয়াং ম্যান্‌ হু কেপ্ট দ্যাট ফ্লাওয়ার···

সুখেন্দু এবার ভেঙে বলেন পুরো ব্যাপারটা। গাড়িতে ওঠা প্রথম মেয়ে হিসেবে কীভাবে রাতুলের রাখা ফুলগুলো সেদিন প্রাপ্য হল জুঁইয়ের। দুজনের কথা বলার ভঙ্গি এবং প্রতিক্রিয়াটাও নকল করে দেখালেন মজা করে।

মুহূর্তে ঘরের পরিবেশটা পাল্টে যায়। সবাই হাসিতে উচ্ছ্বসিত এবার। পরিক্ষিৎ হাসলেন হা-হা করে। যেন দারুণ একটা মজার গল্প শোনালেন সুখেন্দু।

শুধু জুঁই একা অপ্রস্তুত একদিকে। সবাইকে হাসতে দেখে খুবই অপ্রস্তুত হয়ে মুখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অবশেষে দেবদত্ত কাছে ডেকে নিয়ে পাশে বসালেন তাকে, সিট ডাউন হিয়ার, জুঁই। তোমার সঙ্গেই একটু গল্প করব আমি।

চায়ের পর পর খাবারও এসে পড়ল। এলাহি আয়োজন একেবারে। লুচি, মাংস, তোপসে মাছের ফ্রাই, চাটনি, মিষ্টি—কিছুই আর বাকি রাখেননি ভদ্রলোক।

পরিক্ষিতের তবু ইচ্ছে ছিল একটা আলাদা আসর বসাবার। সুখেন্দুর বিশেষ আপত্তিতে তা আর হল না। বললেন, এখনই দেবদত্তকে নিয়ে ফিরতে হবে তাড়াতাড়ি—একটা জরুরি কাজে। আজ আর সম্ভব নয়।

খেতে খেতেই এখন জমিয়ে গল্প গুজব চলে চারদিকে। রাতুল ইনভেস্টি-গেশানের গল্প শোনাচ্ছে মৌলি আর শৈলীকে। মেয়েরা কেউই খেতে বসেনি। অবশ্য জুঁই বাদে। তাকে জোর করেই বসিয়ে দিয়েছে দেবদত্ত। দুজনে খেতে খেতেই গল্প চলছে।

দেবদত্ত বলছিল, তুমি একদিনও মুখোমুখি দেখনি ওকে ?

জুঁই মাথা নাড়ল, না। আমাদের দিকে যে জানলাটা, সেটা একদম ভাঙা, ও আসতে পারে না। ওপাশের বন্ধ ঘরে বসেই কথা বলে—।

—কী কথা বলে ?

—কোনও মাথামুণ্ডু নেই। একদিন আমাকে বলছিল, লেখাপড়া করে যে, গাড়ি চাপা পড়ে সে···তারপই হঠাৎ আবার বলে, রেলগাড়ি ঝমাঝম, পা পিছলে আলুর দম···কে দেখেছে কে দেখেছে, দাদা দেখেছে···।

কথাগুলো সুর করে বলতে বলতে জুঁই হেসে লুটোপাটি খায়।

দেবদত্ত বলল, তার মানে ও তোমাকে চেনে ?

—হ্যাঁ। কথা বললেই গলাটা চিনতে পারে।

—আশ্চর্য। দেবদত্ত অবাক হয়ে দেখে ওর দিকে।

—একদিন না, অদ্ভুত গল্প শোনাচ্ছিল। হঠাৎ শুরু করে,···এক রাজা, তার দুই রানি। দুয়োরানি আর সুয়োরানি, রাজার মনে সুখ নেই···তারপরই কোথা থেকে আবার এল···রাজপুত্তুর আর কোটালপুত্তুর, দুজনে ঘুমোচ্ছে গাছের তলায়, জঙ্গলের মধ্যে গাছের মাথায় ব্যাঙ্গমা বলে, ব্যাঙ্গমী কে ঘুমায়ে রয়, দেখো তো হোথায়···

বলতে বলতে আবার হাসে জুঁই। খুব মজা পাচ্ছে যেন সে পাগলার গল্প শোনাতে। এমনভাবে কেউ তার কাছে এ সব জানতে চায়নি কখনও। তাতেই যেন আরও উৎসাহ।

বলল একদিন রাত্তিরে উঁ উঁ করে কাঁদছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে গো, কাঁদছ কেন তুমি ?

ও কোনও সাড়া দেয় না।

বললাম, খিদে পেয়েছে, কিছু খাবে ?

সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ যেন মুখস্থ বলতে লাগল, চপ-কাটলেট, ঘুগনি-আলুরদম, পিঁয়াজি, ঘুঁসি, ডাণ্ডা,·· কুলপি বরফ, চাই কুলপি মা···লা···ই।

বলেই হি হি করে ছেলেমানুষের মতো হাসে জুঁই। চোখ দুটো জলে ভরে যায় হাসির তোড়ে। তবুও থামতে পারে না।

দেবদত্ত বলল, কিন্তু যখন রেগে ওঠে ও ?

—আমাকে রাগ দেখায় না কখনও। বেশির ভাগই গল্প আর কবিতা বলে।

—ওর কাছে রাত্তিরে কোনও লোকটোক যায় না ? সাড়া পাও না, কখনও ?

—ও বাবা ! ওখানে কে যাবে ? জঙ্গলে সাপখোপ কত কী ঘুরছে। কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই দাঁত কপাটি লেগে যাবে আপনার। এক একদিন কী রকম অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ হয় রাত্তিরে। শুনলে ভীষণ ভয় করে।

—ভুতুড়ে বাড়ি নাকি ?

—তাই-ই তো। পাগলা রেগে গিয়ে যখন তখন বকে ওঠে কাকে। সেদিন নকুলবাবু নাকি নিজের চোখেই ভূত দেখেছে দুটো।

—ও। দেবদত্ত মাথা দোলায় অন্যমনস্ক হয়ে।

সুখেন্দু আর মৌলি এগিয়ে এলেন এদিকে।

মৌলি ভ্রূ বাঁকিয়ে বললেন, আমার মেয়ে খুব জ্বালাতন করছে তো ?

—কই না তো। বিন্দুমাত্র না। দেবদত্ত হাসল।

—না, আর বলবেন না। তখন থেকে দেখছি, বকর বকর করেই চলেছে আপনার সঙ্গে। একবারও উঠতে দিচ্ছে না।

—ঠিক উল্টো ম্যাডাম, বলতে গেলে আমিই আটকে রেখেছি জুঁইকে। খুব গল্প শুনছি ওর। সুন্দর বলে কিন্তু।

জুঁই হাসল লাজুক চোখে।

আকাশটা আবার ডেকে উঠল বাইরে। দেখতে দেখতে রাতও হয়ে গেল। সেই ব্যাঙগুলো থেকে থেকে ডেকেই চলেছে। বৃষ্টির জল পেয়েই হয়তো ওরা কোটর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে আজ। তাদেরও বেরিয়ে পড়তে হবে এবার। বৃষ্টিটা নামার আগেই। না, আর দেরি নয়।

রাতুল এখনও গল্প করে চলেছে শৈলী আর পরিক্ষিতের সঙ্গে। দেবদত্ত দূর থেকেই যেন চোখে চোখে নিঃশব্দে ইঙ্গিত করল তাকে,…রাতুল লেটস্ গো…।

পরক্ষণেই জুঁইয়ের দিকে বলল, আজ তাহলে উঠছি জুঁই, খুব ভাল লাগল তোমার সঙ্গে আলাপ হয়ে।

মৌলি বললেন, সে কি ! আপনার গল্প তো আমরা কিছুই শুনলাম না। এর মধ্যেই চলে যাবেন ?

—সরি ম্যাডাম। একটু যে কাজ আছে এখন।

কথার মধ্যেই হঠাৎ আবার দমকা ঝড় ওঠে বাইরে। শোঁ শোঁ হাওয়ার শব্দ।

—ওই, আবার এল বোধহয়। এই ঝড় বৃষ্টির মধ্যেই যাবেন ? মৌলির চোখে উদ্বেগ।

পরিক্ষিৎ এসে বললেন, সে কি ! এর মধ্যে কোথায় যাবেন, মিঃ চ্যাটার্জি ?

দেবদত্তর চোখে মুখে এক অন্যরকম দৃষ্টি। বলল ঠিক জানি না। তবে বোধ হয় ডাকটা এসে গেছে যাবার !

মৌলি বললেন, ওমা কোথায় !

দেবদত্ত জুঁইয়ের দিকে তাকিয়ে ভাবুকের মতো আবৃত্তি করে :

স্ট্যান্ডিং স্টিল অ্যাট ডাস্ক
লিস্‌ন ইন ফার ডিসট্যানসেস্‌
দা সঙ অফ ফ্রগলিংগস্‌ !

—বাঃ, খুব সুন্দর তো, চোখদুটো বিস্ফারিত হয় জুঁইয়ের, এটা কার কবিতা ।

এ কবির নাম—বুজো । এটা হল জাপানি হাইকু । মানে এক ধরনের ছোট্ট সাংকেতিক কবিতা । যে শুনবে সে মনে মনে আরও কিছু যোগ করে নিয়ে ছবিটা সম্পূর্ণ করবে । তোমার তো ভাল লাগল, এবার নিজের মতো করে ছবিটা ভেবে নাও, জুঁই । তোমাকে দায়িত্ব দিলাম । আর আমার ছুটি আজকের মতো, গুড বাই—

বলতে বলতেই পা বাড়ায় দেবদত্ত । মৌলি শৈলীকে মাথা ঝুঁকিয়ে বলে, গুড নাইট, অ্যান্ড থ্যাংক য়ু ভেরি ম্যাচ ।

জুঁই হাত তুলল হাসি মুখে, বা-ই-ই

রাতুলও হাত নাড়ে স্মার্ট ভঙ্গিতে । নাড়তে নাড়তেই সুখেন্দু ও দেবদত্তর পিছন পিছন গটগট করে নেমে গেল ।

নির্জন ফাঁকা রাস্তা । তবু গাড়িটা আস্তেই চলছে তাদের । অনেকটা গিয়ে বড় মাঠের পাশে পরপর দুটো পাক খেয়ে ফিরে এল আবার । পার্কের কাছাকাছি প্রায় । হিন্দুস্থানি পানের দোকানটির সামনাসামনি আসতেই পিছন থেকে টক্‌ টক্‌ করে ইঙ্গিত করল দেবদত্ত । আর সঙ্গে সঙ্গেই ব্রেক কষল ড্রাইভার ।

রাস্তাঘাট পুরো ফাঁকা । কেউ দেখবার নেই কোনও দিকে । টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে । সঙ্গে দমকা ঝোড়ো হাওয়া ।

সুখেন্দু চুপি চুপি বললেন, এই রকম ওয়েদারে যাবেন ?

দেবদত্ত চাপা গলায় বলে, এইটাই তো আদর্শ পরিবেশ, সুখেন্দুবাবু । এমন সুযোগ হাতছাড়া করতে আছে কখনও ।

—কিন্তু যদি কিছু একটা অঘটন ঘটে যায় ?

রাতুল মৃদু শব্দ করে কোমর চাপড়াল । বলল, সুখেন্দুদা, এখানে ছোট্ট একটা জিনিস আছে সঙ্গে । ফুললি লোডেড । যদি দরকার পড়ে, ব্যবহারটা আজ দেখাব আপনাকে—

—উরে বাবা ! ও সব থাক্‌ তোমার । এই অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে ভাঙা লড়ঝড়ে সিঁড়ি বেয়েও ওপরে উঠবে কী করে ? সেটাই ভাব ।

—সে ব্যবস্থাও রেডি, এই দেখুন, ঝোলা থেকে অদ্ভুতদর্শন এক টর্চ বের করে দেখায় রাতুল, আলোটা কম বেশি যেমন খুশি করা যায় এর । বলেই হঠাৎ ফোকাস

করে ফুটম্যাটের দিকে। প্রথমে ছড়ানো প্রখর আলোর ঝলক, তারপর আস্তে আস্তে ডিম আর ছোট হয়ে আসে বৃত্তটা।

—বাঃ বেশ জিনিসটা। ভাঙা বাড়ির মধ্যে সামলে রেখো কিন্তু।

দেবদত্ত বলল, মিঃ বোস, আপনি বরং গাড়িতেই অপেক্ষা করুন আমাদের জন্যে। আমরা দুজনে ঘুরে আসি।

—অসম্ভব। আমিও যাব আপনাদের সঙ্গে। একযাত্রায় পৃথক ফল কেন হবে। তবে আপনার আপত্তি থাকলে কোনও, অবশ্য আলাদা কথা।

—না না, আপত্তির কী আছে? বেশ চলুন। রাস্তাটা তো আপনিই চেনেন আমাদের চেয়ে বেশি।

গাড়ি ছেড়ে হাঁটতে হাঁটতে এবার জঙ্গলের মুখোমুখি গলিতে এসে দাঁড়ায় তিনজনে। না, কেউ কোথাও নেই। ঘড়ির চকচকে ডায়ালটা নজর করে দেবদত্ত—দশটা পঁচিশ। বলল, চলুন এবার ঢোকা যাক ভেতরে।

তিনটি ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে অন্ধকারে। চারিদিকে শোঁ শোঁ করা হাওয়ার আর্তনাদ। গাছপালাগুলো দুলছে চারদিকে। পাগলের মতো মাথা ঝাঁকিয়ে নেমে আসছে এক একবার। যেন এখনই একটা কিছু ঘটতে চলেছে এখানে।

দেবদত্ত বলল, রাতুল, বি অ্যালার্ট। সরু ফোকাসটা ফেলবে শুধু মাটির দিকে, অ্যান্ড দ্যাট টু, হোয়েন অ্যাবসলিউটলি নেসেসারি··

অদ্ভুত একটা শব্দ হল ধুপ করে। তিনজনেই দাঁড়িয়ে পড়ে। কাঁটার খোঁচায় সুখেন্দুর পা ছড়ে গেছে। তবুও চুপ। সামনেই থমথমে চেহারার সেই অদ্ভুত ভাঙাচোরা বাড়িটা। চারদিকে দাপিয়ে ওঠা ঘন বন জঙ্গল—আদিম বন্যপ্রকৃতি। মাঝখানে ঐতিহাসিক এক অট্টালিকার জীর্ণ ধ্বংসাবশেষ। নহবতখানা এখন বাদুড় আর চামচিকের কুঁই কুঁই করা ভঙ্গিতে মুখর। মাথার ওপর দিয়েই ঝাপটা দিয়ে বেরিয়ে গেল একটা দল। কিন্তু মানুষের কোনও সাড়া নেই।

অবশেষে সেই ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে বসে এবং শেষে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ওপরে একটা বন্ধ ঘরের মধ্যে পৌঁছে গেল ওরা। রাতুল রিভলভারটা বার করে নিয়েছে। দেবদত্তর হাতে টর্চ। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলো ফেলে চারদিকে। আর সঙ্গে সঙ্গে চামচিকের দল ধেয়ে আসে। পালে পালে। ধাড়ি বুড়ো ছানা পোনা সব এক সঙ্গে। উন্মত্তের মতো কিচ মিচ শব্দে প্রতিবাদ জানাতে থাকে যেন সবাই। যেন অবাঞ্ছিত কোনও আগন্তুক ঘরের দখল নিতে এসেছে তাদের—তারই প্রতিবাদ।

মাথা নিচু করে নিঃশব্দে তার মধ্যেই এগোতে থাকে তিনজনে। কিন্তু সে কোথায়? কোথাও তো কোনও চিহ্ন নেই।

ফোকাসটা কোণের দিকে ফেলল দেবদত্ত। এক বোঝা রাবিশের পাহাড়। সিলিং ছুঁয়ে ফেলেছে প্রায়। ঢিবির মাথায় পাশাপাশি দুটো মূর্তি যেন।

ফোকাসটা মুখের ওপর ঘোরায়। আরে! গাট্টা গোট্টা পালোয়ান চেহারার দুটো হনুমান। ভয়ে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে।

দেবদত্ত বিড়বিড় করল, গুড গড! আপনারা! রাতুল, এই বোধহয় নকুলবাবুর সেই ভূত। জঙ্গলে লাফিয়ে পড়লে মাথার ওপর, আমাদেরও তাই মনে হত···

—কিন্তু, পাগলটা কোথায় গেল, দাদা?

—ভাবছি, আজ কি আসেনি তাহলে।

—ব্যাড লাক, এত কষ্ট করেও দেখা পেলেন না। সুখেন্দু বললেন।

—কিন্তু আপনার দেখা সেই ছায়া মূর্তি—তারও কি আসার সময় হয়নি?

—কে জানে, সে কখন আসে। কেনই বা আসে···সুখেন্দু স্বগতোক্তি করেন।

টর্চের আলোয় ছোট ছোট কয়েকটা কাগজের টুকরো, পুরানো ছেঁড়া চিঠি কয়েকটা, দেখেই দেবদত্ত চটপট কুড়িয়ে নেয়। আরও খোঁজে আলো ফেলে ফেলে। তারপর হঠাৎ এক জায়গায় ফোকাসটা ধরে থাকে।

কী দেখে উবু হয়ে ঝুঁকে পড়ে প্রায়। তারপর ফিসফিস করে বলে, এ কী! সুখেন্দুবাবু। এখানে যে আর একজন এসেছিল। ভারী বুটজুতো পরা হেভিওয়েট কেউ। এই যে সোলের চিহ্নটা দেখুন—

গুঁড়ো গুঁড়ো ধুলো রাবিশের মধ্যে ছাপটা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সবাই দেখে মাথা নামিয়ে। দেখতেই থাকে একদৃষ্টিতে। হানা বাড়ির বন্ধ ঘরে সেই অদ্ভুত দুটো পায়ের চিহ্ন!

—ব্যাট হু ইজ দিস স্ট্রেঞ্জার? দেবদত্ত নিজের মনে স্বগতোক্তি করে, জানতেই হবে আমাদের·

ঘরের নিশাচর বাসিন্দারা তখনও উন্মত্তের মতো ঘুরপাক খেয়ে চলেছে মাথার উপর।

১০

পল্লবী উদাস দৃষ্টি মেলে বসে ছিল বারান্দায়।

বিকেল হতে এখনও অনেক বাকি। খাঁ খাঁ দুপুর। আগুনের হল্কার মতো ভাপ্ ছাড়ছে দুপুরের রোদ। হাওয়াতেও তেমনি একটা জ্বালা ধরানো ভাব! ঝপ্ করে আজই হঠাৎ গরমটা পড়ে গেল। তার জন্যেই আরও বেশি লাগছে ঝাঁঝটা।

পল্লবী প্রথমে শুয়েই ছিল বিছানায়। একটা বই নিয়ে। তারপর খানিক এপাশ ওপাশ করে উঠে পড়ল। ঢক্‌ঢক্ করে ঠাণ্ডা জল খেল এক গ্লাস। বেছে বেছে গান শুনল রেকর্ডের। তার প্রিয় কয়েকটা গান। সুখেন্দুদার নতুন আনা

ভীষ্মদেবের রেকর্ডটাও বাজাল। শেষে সব ফেলে বারান্দায় এসে চুপচাপ বসে থাকল।

বিহ্বল হয়ে জ্বলন্ত ভরা দুপুরটাকেই দেখতে থাকে। তার মধ্যেও একবার চোখ ঘুরিয়ে লক্ষ করতে ভোলে না। কেউ কোথাও আড়ি পেতে নেই তো, দত্তভিলার সামনে?

যত দূর দেখা যায় রাস্তাটা প্রায় ফাঁকা। শুধু চন্দ্রবাবুদের দরজায় একটা অদ্ভুত চেহারার লোক। এই ঝাঁ ঝাঁ দুপুরের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছুরি কাঁচিতে শান দিয়ে যাচ্ছে! পেন্টুল পরা, খালি গা। গলগল করে ঘামছে। তার দিকে একবার দুবার দেখলেও এখন আর মুখ তুলছে না। দুলতে দুলতে ঘুরন্ত চাকার ওপর একটা চওড়া বঁটি চেপে ধরে শান দিচ্ছে।

অদ্ভুত ধার ফুটে উঠছে বঁটিটায়! তীব্র ক্র্যা-অ্যাঙ··· ক্র্যা-অ্যাঙ··· শব্দে কান বিঁধিয়ে উল্টে পাল্টে পাথরের ওপর ঘসা খেয়ে চকচক করে উঠছে ·· দুপাশ থেকে স্রোতের মতো লকলকিয়ে ওঠা আগুন··· অজস্র আগুনের ফুলকি। আর তার মধ্যেই ওর কালো পাথরের মতো কঠিন মুখটা। একভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে।

কেমন যেন অস্বস্তি লাগে দেখতে। শরীরটা ঝিম ঝিম করে ওঠে লাবির? তবু আচ্ছন্নের মতো তাকিয়ে থাকে সে। আগুনের ফুলকিগুলো যেন নেচে নেচে ঘুরছে চোখের সামনে।

দেখতে দেখতে চোখের সামনে দিয়েই দুপুরটা গড়িয়ে গেল। শান্ দেবার চাকাঅলা যন্ত্রটা কাঁধে নিয়ে সেই লোকটা কখন চলে গেছে। সুন্দর ফুরফুরে হাওয়া উঠল একটা অপরাহ্নের। মুখের ওপর থেকে চুলগুলো সরাতে সরাতে আপনা থেকেই একটা নিশ্বাস পড়ে লাবির। কেন, সে জানে না।

বামুনদি চা নিয়ে এল তার জন্যে। বলল, দিদিমণি, তুমি শোওনি আজ?

পল্লবী মাথা নাড়ল দুপাশে, নাহ্। ভীষণ গুমোট লাগছিল ঘরে।

—হ্যাঁ গো, আঁচলে মুখ মুছল বামুনদি, গরমও পড়েছে বটে আজ! দেখো, আবার একটা ঝড় বৃষ্টি হয় নাকি।

—হুঁ। পল্লবী অন্যমনস্কের মতো সাড়া দেয়।

তারপর চা খেতে খেতেই হঠাৎ মনে পড়ল, আরে! একটু পরেই যে মিস্ সাইনি এসে পড়বেন। তাঁর আসার দিন আজ। একেবারে কাঁটায় কাঁটায় সময় ধরে এসে যান ভদ্রমহিলা।

তাড়াতাড়িই চা-টা শেষ করে পল্লবী। অনেক কাজ তার এখন। গা ধোয়া, চুল বাঁধা, পোশাক পাল্টানো। তারপর ফিটফাট হয়ে বসতে হবে পিয়ানোর সামনে। মিস্ আসবার আগেই একটু প্র্যাকটিস্ করে নিতে হবে আগের দিনের লেসন্গুলো।

সুখেন্দু বাড়িতে পা দিয়েই টুং টুং আওয়াজটা পেলেন। মিষ্টি সুরে পিয়ানো বাজছে লাবির ঘরে। ভিতরে যাবেন কি না ইতস্তত করেন একটু।

সরকারমশাই তার আগেই এগিয়ে এসেছেন সাড়া পেয়ে। হাতজোড় করে মাথা নামিয়ে বলেন, আসুন বাবু, আসুন—।

সুখেন্দু বললেন, কী সরকারমশাই। আপনাদের খবরটবর সব ভাল তো ?

—আজ্ঞে, হুজুর !

—মিস্ সাইনি, দিদিমণির ঘরে আছেন, এখনও ?

—আজ্ঞে, যাবার সময় হল, এইবার।

—ও আচ্ছা। আর সব ?

সরকার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে অন্য সবার খবরগুলোও বলে যান পরপর ; কর্তামশাই বেড়াতে বেরোলেন একটু আগে, ক্ষিতিবাবু, পুরোবাবু ফেরেননি এখনও, ড্রাইভার, শৈলী আর জুঁইদিদিমণিকে নিয়ে মার্কেটে গেল, ক্ষিতিবাবুও থাকবেন ওখানে···

পরে হাত দুটো কচলে, দিদিমণিকে কি আমি খবর দেব হুজুর ?

—আরে না না, আমি বসছি ক্ষিতির ঘরে। মিস্ সাইনি চলে গেলে খবরটা দেবেন।

—তাই হবে হুজুর।

পরিক্ষিতের ঘরে এসে বসলেন সুখেন্দু। ভিতরে মৌলি গুনগুন করে গান গাইছিল। সুখেন্দুর সাড়া পেয়েই সামনে এসে দাঁড়াল। খুব খুশি খুশি মেজাজ।

বলল, এ কী সুখেন্দুদা ! আজ এমন গম্ভীর মুখ করে আছেন কেন ?

—হাঁড়ি মুখ বলো। সেইটেই তো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আমার মুখের সঙ্গে। সুখেন্দু মৃদু হাসলেন।

—যাঃ কী যা তা বলছেন ! মৌলির চোখে কটাক্ষ, আপনার মতো এমন সুপুরুষ, হ্যান্ডসাম কজন দেখা যায় ?

—সুপুরুষ ! কথাটা তো বিদ্রুপের মতো লাগে এখন, সুখেন্দুর মুখে ম্লান হাসি, বলো রিজেক্টেড পুরুষ।

—কেন, এমন করে বলছেন কেন ? আপনার কিসের দুঃখ সুখেন্দুদা ?

—আমার কথা ছেড়ে দাও। তোমাকে কিন্তু খুব সুন্দর দেখাচ্ছে আজ। রিয়েলি চার্মিং !

—থ্যাঙ্ক য়ু, মৌলির মুখটা আরক্ত দেখায় সহসা, একটা নতুন কিছু টের পাচ্ছেন আজ ? নিশ্চয় পাচ্ছেন আপনি !

—কী বলো তো ? সুখেন্দু অবাক হয়ে তাকান।

মৌলি আরও কাছে সরে এল। একেবারে মুখের সামনাসামনি সুখেন্দুর। এক নিশ্বাসের দূরত্বে মাত্র। বলল, এবার। এবার পাচ্ছেন ?

ভীষণ আড়ষ্ট লাগে তাঁর। শাঁখ বেজে উঠল সন্ধের কোন্ বাড়িতে। তার মধ্যেই মৃদু এক পরিচিত সুগন্ধের ঘ্রাণ মৌলির শরীর থেকে। কিন্তু বড় বিপজ্জনকভাবে গা ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে মৌলি। যে কোনও মুহূর্তে একটা ভুল হয়ে যেতে পারে। এই তীব্র শরীরের ভাষা অচেনা নয় সুখেন্দর।

সহসা নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, পেয়েছি। লা-ভাঁ! অপূর্ব লাগছে।

—তবে ? মৌলি উচ্ছ্বসিত প্রায়, আজই খুললাম, আর আপনিও ঠিক সেইদিনই এলেন! আশ্চর্য না! সেই ক-বে দিয়েছিলেন এটা, মনে আছে ?

—একটু একটু আছে বই কি। সুখেন্দু মাথা নাড়লেন।

যদিও ঘটনাটা সঠিক মনে নেই তাঁর। কবে এই ফরাসি পারফিউমটা তিনি এনেছিলেন মৌলির জন্যে। দামি জিনিস বলে ব্যবহার না করে তুলেই রেখেছিল এতদিন। আজ হঠাৎ মেখে একেবারে কিশোরীর মতো উৎফুল্ল যেন।

ঝলমল করে আবার হাসল মৌলি, ঘরে ঢুকেই আপনি টের পেয়েছিলেন গন্ধটা, তাই না ?

—পেলেও ঠিক বুঝতে পারিনি। বোধশক্তিটা একটু মোটা তো ?

—ছিঃ। আপনি নিজেকে বার বার এমন ছোট করেন কেন, বলুন তো ?

—যা সত্যি তাই বলে ফেলি, আর কি।

—কক্ষনো সত্যি নয়। সবাই আপনাকে এত মান্য করে, ভালবাসে, কাছে পেলে খুশি হয়— জীবনে সব দিক দিয়েই তো আপনি সাকসেসফুল! তবুও এমন বলছেন !

সুখেন্দু মৌলির চোখে চোখ রেখে মৃদু হাসেন।

বললেন, কী জানি! বেশ লাগছে অবশ্য তোমার কথাগুলো শুনতে। কিন্তু আমার তো মাঝে মাঝে ভীষণ ডিজেক্টেড লাগে। হতাশ হয়ে পড়ি নিজের ওপর ।

—ছি ছি, সুখেন্দুদা! এ সব কী বলছেন আজ ?

—এক এক সময় ভাবি, সত্যিই কি আমার তেমন কোনও দাম আছে কারও কাছে ?

—আ-হা-হা! খুব জানেন। অদ্ভুতভাবে মুখ বাঁকিয়ে এবার কটাক্ষ করে মৌলি, আমাকে আর ঘাঁটাবেন না।

পরে লাস্যময়ীর মতো কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলল, কী হয়েছে আজ আপনার বলুন তো ?

সুখেন্দু হাসলেন, তুমিই বলো।

পিয়ানোর আওয়াজটা থেমে গেছে কখন। সরকারমশাইয়ের গলা পাওয়া গেল বাইরে, হুজুর— ।

সুখেন্দু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ক্ষিতির কি দেরি হবে আজ?

—বলা যায় না। তবে জুই আছে, তাড়াতাড়ি ফিরতেও পারেন।

—ঠিক আছে। আমি বসছি ওদিকে— ।

—যাওয়ার আগে একটা কথা বলে যাবেন, সুখেন্দুদা? মৌলির গলাটা অন্যরকম শোনাল। খুবই কৌতূহল যেন কী জানতে।

—কী বলো? যেতে গিয়েও দাঁড়ালেন সুখেন্দু।

—সেদিন ডিটেকটিভদের সঙ্গে আপনি কোথায় গেলেন? যাবার আগে ভদ্রলোক রহস্য করে কী যে বলে গেলেন, কিছুই বোঝা গেল না। জুই তো আমাদের পাগল করে ছাড়ছিল, কোথায় গেলেন ওঁরা, কোথায় গেলেন সুখেন্দু জেঠু?

সুখেন্দু গম্ভীর হয়ে ভাবেন একটু। পরে বললেন, সেটা আমার কাছেও এক রহস্য মৌলি। সঙ্গে থাকলেও সব বুঝিনি। সময় হলেই ঘটনাটা তোমায় বলব আমি। কিন্তু এখন নয়— ।

মৌলি বড় বড় চোখে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

পল্লবী চায়ের পট সাজিয়েই বসে আছে তাঁর জন্যে। প্লেটে নানা ধরনের কেক, বিস্কুট। হালকা একটা সবুজ আলো জ্বলছে ঘরে। তার মধ্যে জাম রঙের শাড়ি পরা ধবধবে ফর্সা পল্লবীকে অপূর্ব দেখাচ্ছে যেন।

সুখেন্দু মৃদু হেসে বললেন, বাঃ! তোমাকে যে রূপকথার রাজকন্যের মতো লাগছে!

পল্লবী কোনও কথা বলে না। হাসেও না।

—মিস্ সাইনিকে এত জলদি ছুটি করে দিলে আজ?

পল্লবী চোখ তুলে তাকাল। গভীর আয়ত দৃষ্টিতে বিষণ্ণতার ছোঁয়া।

—কী হল লাবি?

—কথা বলব না তো আপনার সঙ্গে।

—কেন? আমার অপরাধ?

—সেদিন এসে, একবারও আমার সঙ্গে দেখা করলেন না কেন? কতক্ষণ এ বাড়িতে ছিলেন অথচ— ।

—ওহ্ হো! এই ব্যাপার! আমি ভাবলাম না জানি কী!

—এটা কিছু নয়?

—ছেলেমানুষি কোরো না। ওঁরা সব ছিলেন না সঙ্গে। ওঁদের রেখে তোমার সঙ্গে দেখা করা কি ভাল হত? তুমিই বলো।

—তারপরও তো তিন-চারদিন কেটে গেল! ঝড়ের মধ্যে অন্ধকারে সেদিন

কোথায় বেরিয়ে গেলেন, কেউ জানে না। একটা খবর পর্যন্ত নেই তারপর থেকে।

—সরি লাবি, ভেরি সরি। আসলে একটা জাহাজ নিয়ে খুব গণ্ডগোল চলছিল আমাদের। নাওয়া-খাওয়ারও সময় ছিল না। ক্ষিতি জানত সবই—

পল্লবী কোনও কথা না বলে পট থেকে লিকার ঢেলে চা তৈরি করতে থাকে। মাপ মতো দুধ চিনি মিশিয়ে সোনালি বর্ডার দেওয়া সুন্দর কাপটা তুলে ধরে সুখেন্দুর দিকে।

আস্তে করে হাতটা ছুঁয়ে কাপটা ধরলেন সুখেন্দু। মাথা ঝুঁকিয়ে বললেন, থ্যাঙ্ক য়ু ম্যাডাম।

পল্লবী এবার হাসল মৃদু। চোখ তুলে বলল, য়ু আর মোস্ট ওয়েলকাম!

সুখেন্দু সিগারেট ধরালেন। আরাম করে একটা টান দিয়ে বললেন, —ওহ্ হো। তোমার জন্যে খুব ভাল একটা জর্জেট পেয়েছি এবার। মিসেস মরিসন এনে দিয়েছেন। নিয়ে আসব—।

—আমার চাই না ও সব।

—আমার যে চাই। সুখেন্দু হাসলেন।

—মানে? আপনি শাড়িটা পরবেন?

—কী আর করা? তুমি যদি নিতান্তই না পরো।

শব্দ করে এবার হেসে উঠল লাবি, বেশ দেখাবে তাহলে!

হাসতে হাসতে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, ওহ্ সুখেন্দুদা! দারুণ মানাবে আপনাকে! দারুণ! দৃশ্যটা কল্পনা করে যেন হাসির তোড় থামে না তার। সুখেন্দুও হাসতে থাকেন লাবিকে স্বাভাবিক হতে দেখে।

আকাশে গুম গুম করে মেঘ ডাকে। কথার মধ্যেই চমক লাগে পল্লবীর। একটু আগেও কিছু বোঝা যায়নি। হঠাৎ হাওয়াটা বন্ধ হয়ে এখন থম থম করছে আকাশটা।

সুখেন্দুও থমকে ঘড়ির দিকে দেখলেন। প্রচণ্ড জোরে ডেকে উঠল আবার আকাশটা। সঙ্গে বিদ্যুতের ঝলক। কাচের শার্সিতে হঠাৎ ঝাপটা মারল যেন। ঝড়টা এসে পড়ার আগেই ওঠার কথা ভাবেন সুখেন্দু। দেখতে দেখতে রাতও হয়ে গেছে। ক্ষিতি, পুরো, ওদের কারওই ফেরার নাম নেই এখনও।

অবশেষে পল্লবীকে বলে, যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন সুখেন্দু। কিন্তু বাধা পড়ল। পোড়ো বাড়ি থেকে সেই মুহূর্তেই পাগলার গান ভেসে এল কানে। অদ্ভুত একটা আকুল সুর। দাঁড়িয়ে পড়তেই হয় সুখেন্দুকে। গোটা আকাশ জুড়ে ঝড়ের মেঘ। গুম গুম করে ডেকে ফিরছে চারদিকে। তার সঙ্গে গলা মিলিয়েই সে গাইছে:

ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে।
কে ডাকে মধুর তানে কাতর প্রাণে

আয় চলে আয়,

ওরে আয় চলে আয় আমার পাশে··· ·

এ কী গান আজ পাগলার ! গমগম করে বাজে যেন মেঘের ডাকের সঙ্গে !

সুখেন্দু চুপচাপ তাকিয়ে থাকেন বাইরের দিকে। মনে মনে ভাবেন, লোকটা তাহলে আবার এসেছে ! এমন একটা দিন ! কিন্তু সেই অদৃশ্য চরিত্রটি ! সেও আসবে কি আবার ?

লাবি অবাক হয়ে দেখছে তাঁর দিকে।

সুখেন্দু বললেন, বাঃ বেশ গাইছে তো !

—হ্যাঁ। আজ খুব মুডে আছে মনে হচ্ছে।

দুজনেরই কান এখন তার অদ্ভুত গানটার দিকে। কিন্তু পাগল ধৈর্য হারিয়ে ফেলে। কি খেয়ালে হঠাৎ সুরটা বদল করে। চটুল গলায় গেয়ে উঠল হঠাৎ ;

আমি বনফুল গো—

ছন্দে ছন্দে দুলি আনন্দে আমি বনফুল গো—

কুল কুল করে হেসে উঠল পল্লবী এবার। তাড়াতাড়ি পিয়ানোতে বসে, সেও বাজাতে থাকে সুরটা পাগলার সঙ্গে, টুংটাং টুংটাং···

আবার প্রচন্ড গর্জন আকাশে। প্রতিধ্বনির মতো শব্দটা গুড় গুড় করে ছড়িয়ে যাচ্ছে আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। না, আর দাঁড়ালেন না সুখেন্দু। লাবির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চটপট বেরিয়ে পড়লেন।

গেটের মুখে আবার সরকারবাবুর সঙ্গে দেখা। কোথায় বেরোচ্ছেন এই দুর্যোগে। ধুতির ওপর ফুলশার্ট, বগলে প্রকান্ড একটা ছাতা।

সুখেন্দু বললেন, এ কী, আপনি এই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে কোথায় চললেন ?

—আজ্ঞে, শুঁড়োর চৌধুরীদের বাড়ি।

—এত রাতে ! কী ব্যাপার, আদায়পত্তর নাকি ?

—আজ্ঞে, যথার্থ ধরেছেন হুজুর !

—তা আমার গাড়িতে আসুন। বড় রাস্তার মোড়ে নামিয়ে দেব আপনাকে, চলে আসুন '

বিনা বাক্যব্যয়ে ছাতাটা বগলে নিয়ে ভেতরে বসে পড়েন সরকারমশাই। গাড়ি চলতে শুরু করে।

সুখেন্দু একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, আচ্ছা, সরকারমশাই একটা কথা জিজ্ঞেস করি আপনাকে।

—বলুন হুজুর। সরকার জড়সড় হয়ে তাকান।

—আপনাদের পোড়ো বাড়ির ওই পাগলা, ও কি রোজই আসে এখন ?

—হ্যাঁ হুজুর ! তাই তো মনে হয়।

—রোজ সাড়া পান ওর ?

—দুই একদিন হয়তো পাই না। শরীর টরির খারাপ থাকে, বা খেয়ালও করি না ঠিকমতো···। কথাটা সম্পূর্ণ করেন না সরকার।

—অন্য আর কাউকে ঢুকতে দেখেন না ওখানে ?

সরকার চমকে উঠলেন যেন, না, না তো! আর কে যাবে ? কেনই বা যাবে খামোকা ওই জঙ্গলের মধ্যে ?

—তাও বটে! ঠিকই—। সুখেন্দু গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়েন।

সরকারমশাইও চুপ। আর কোনও কথা হয় না দুজনের।

বড় রাস্তা আসতেই তাঁকে নামিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল সুখেন্দুর গাড়িটা।

দেখতে দেখতে ঝড়টা শুরু হয়ে গেল। হু হু করা একটা অদ্ভুত শব্দের মাতামাতি পোড়ো বাড়ির জঙ্গলে। সঙ্গে ঝম ঝম্ করে বৃষ্টি, ঘন ঘন মেঘের গর্জন।

পল্লবী জানলার বন্ধ শার্সির পাশে বসে আছে। বাইরে অন্ধকার ঝড়ের রাত। বড় মন খারাপ লাগে তার। কেমন যেন ভয় ভয় করে। পাগল সেই থেকে চুপ করে আছে। আর কোনও সাড়া নেই। শুধু সিঁ সিঁ করা উন্মাদ আর্তনাদে ডাক ছেড়ে উঠছে জঙ্গলটা।

তারপরই হঠাৎ এক সময় তার গলা পাওয়া গেল। ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চিৎকার করে গান ধরেছে আবার :

বলে, আয় রে ছুটে আয় রে ত্বরা
হেথা নাইক মৃত্যু নাইক জরা···
ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে···

সুরটা চাপা পড়ে যায় ঝড়ের শব্দের মধ্যে। একবার শোনা গেল তার অট্টহাসির শব্দ। ক্ষিপ্ত ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যেই হাসছে হা-হা-হা···।

নাটক শুরু হয় তারপর। মেঘের ডাক আর ঝড়ের শব্দকে উদ্দেশ্য করেই যেন বলছে,

শুনেছ কাত্যায়ন! বলেছে আত্রেয়ী··· দস্যু আমি তোমায় বধ করব, না না, তোমার মূর্তি গড়িয়ে পুজো করব।·· কাত্যায়ন তুমি নাড়ি দেখতে জানো ? ·· দেখ তো আমি বেঁচে আছি কি না···

প্রচণ্ড শব্দ করে বাজ পড়ল কোথায়। কানে তালা লেগে যায় পল্লবীর। তার মধ্যে সেই একটানা সোঁ সোঁ গর্জন। মনে হয় সমস্ত পৃথিবী জুড়েই যেন এক আদিম শক্তির তান্ডব শুরু হয়ে গেছে আজ রাতে। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যায় হঠাৎ। সেই গা ছমছমে ঘন বর্ষার দিনগুলোর কথা!

আবার পাগলা চিৎকার করে উঠেই, কে ? কে, রে তু দুরাত্মা পামর ! কে—

কিন্তু হঠাৎ স্বরটা যেন চাপা পড়ে যায় এক আর্তনাদের মতো শব্দে—আহা-আঁ-আঁ-আঁ—

স্বরটা বেরোতে গিয়েও বেরোচ্ছে না। অদ্ভুত সেই আর্তনাদের মধ্যেই কী যেন বলতে চায় সে। কান ফাটা শব্দে আবার বাজ পড়ল কোথায় ! আর কিছুই শোনা যায় না। তারপর শুধুই ক্ষিপ্ত ঝড়ের গর্জন। ঝম ঝম বৃষ্টির শব্দ। পল্লবী তবু কান পেতেই থাকে। কিন্তু আর কোনও সাড়া দেয় না পাগল।

সরকারমশাই আদায় সেরে বাড়ি ফিরছেন। কোমরের গেঁজেয় নোটের বাণ্ডিলটা শক্ত করে বাঁধা। জল কাদার রাস্তা। ধুতিটা তুলে আঁট করে পেঁচিয়ে নিয়েছেন কোমরের সঙ্গে। তিনি ভিজলেও টাকার গায়ে জল লাগবে না এক ফোঁটা। জুতো জোড়াও খুলে নিয়েছেন। মাঝে মাঝে জল ভাঙতে হচ্ছে।

বেঁটেখাটো মানুষটা ছাতার তলায় ঢাকাই পড়ে গেছেন। এখন এক হাতে জুতো এক হাতে ছাতা নিয়ে যথাসম্ভব দ্রুত পা চালিয়ে বাড়ি ফিরে আসছেন। কোথাও লোকজন নেই। এই দুর্যোগের রাতে রাস্তাঘাট প্রায় ফাঁকা। মাঝে মধ্যে একটা দুটো টানা রিকশা। আর হঠাৎ হঠাৎ এক আধটা গাড়ি। দুপাশে পিচকিরির মতো জল ছিটিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে যাচ্ছে। একটা ট্যাক্সি তো তাঁর পেছন দিকটা পুরো ভিজিয়ে দিয়ে গেল। তা যাক্। সরকারবাবুর এ সব দিকে এখন কোনও খেয়াল নেই। আগে টাকাটা নিয়ে ভালয় ভালয় বাড়ি পেঁাছোনো দরকার। তারপর অন্য কথা !

খেয়ালি সংঘের মোড় ছাড়িয়ে এসেছেন। আর একটু। দত্তভিলা দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ বৃষ্টির ঝাপটায় ছাতাটা যেন বেঁকে যায়। খুব কায়দা করে সামলান। সামনেই একটা ট্যাক্সি হেডলাইট জ্বালিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এ কী ? দুচোখে আলো মেরে ধাঁধা লাগিয়ে দিচ্ছে যেন। তার মধ্যেই আবার বৃষ্টির ধারাগুলো এঁকে বেঁকে ঝাপটা মারে এসে !

ছপ্ছপ্ করে জল ভেঙে কেউ আসছে ওদিক থেকে। ছায়ামূর্তির মতো দত্তভিলার দিক থেকেই যেন হেঁটে আসছে। মাথায় টুপি, গায়ে বর্ষাতি। হেডলাইটা আড়াল করতে চেষ্টা করেন একটু। কিন্তু ছাতা জুতো সামলে তাও পারেন না।

ভীষণ ঘাবড়ে গেলেন সরকার। তাড়াতাড়ি টাকার গেঁজেটা চেপে ধরেন। কী করবেন তিনি এখন ? তাকেই যদি ধরে এসে লোকটা ? চোখে চড়া আলোর ফোকাস। ঠিকমতো ঠাহরও হয় না কিছু। এগোবেন কি পেছোবেন, ভাবছেন দাঁড়িয়ে।

আর ঠিক তখনই তাঁর চোখে মুখে জল ছিটিয়ে হুস করে বেরিয়ে গেল ট্যাক্সিটা।

সরকারমশাই হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁর জুতোসুদ্ধ হাতটাই টাকার গেঁজেতে চাপা এখন। চোখ মুখ থেকে ময়লা জল গড়িয়ে পড়ছে টপ টপ করে।

কিন্তু সেই ছায়ামূর্তিটা! সে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল! তবে কি সে ট্যাক্সিটা চেপেই পালাল? কিছুই যেন স্পষ্ট বুঝতে পারেন না সরকারমশাই।

১১

সরকারমশাই বাড়িতে ফিরে কাউকেই বলতে পারলেন না কথাটা।

মনের মধ্যেই ওলোট-পালোট চলে অনেকক্ষণ ধরে। তবু মুখ খোলেন না একবারও। কী-ই বা বলবেন। নিজের চোখে যা দেখলেন তা যে নিজেই পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেন না। অন্যকে বোঝাবেন কী করে। চোখে কী রকম ধাঁধা লেগে গেল যে।

তবে জল ভেঙে ছপ্‌ছপ্‌ করে ঠিকই একজন আসছিল। সেটা ভোজবাজি নয়। পোড়ো বাড়ির দিক থেকেই আসছিল।···

কর্তাবাবুকে হয়তো বলা যেত কথাটা। কিন্তু দুর্যোগের রাত। ছেলেরা কেউ বাড়ি ফেরেনি। তার মধ্যে. বুড়ো মানুষটাকে বিছানা থেকে তুলে এ রকম একটা কাহিনী শোনালে, হিতে বিপরীতও হয়ে যেতে পারত। অগত্যা ঘটনাটা পুরোই চেপে গেলেন সরকারবাবু।

তড়িঘড়ি শুয়ে পড়লেন ঘরে গিয়ে। কিন্তু ঘুমোতে পারেন না কিছুতেই। বাইরে তখনও টিপটিপ বৃষ্টি। হাওয়ার শব্দ। মনের মধ্যে উসখুস করে বেড়ায় যত রাজ্যের আজেবাজে চিন্তা। দু'চোখের পাতা এক হয়েছে কি, সেই অদ্ভুত ছায়ামূর্তিটা সামনে এসে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গেই চমকে ওঠেন। বুকের মধ্যে ধুকপুক ধুকপুক করে বেড়ায় একটা অজানা আশঙ্কা।

এক একবার মনে হয়, কার যেন পায়ের শব্দ বাইরে! আস্তে আস্তে ঘরের সামনে এসেই দাঁড়াল শব্দটা। তারপর সব চুপচাপ। ঝিনঝিন করে কাঁপল বুঝি দরজাটা। সরকারমশাই পাশ ফিরলেন উল্টো দিকে। নাহ্‌ তবুও রেহাই নেই। অদ্ভুত সব খুটখাট শব্দ রাত্তিরের। চারদিক থেকে যেন কানে এসে বেঁধে।

সিঁড়ির নীচে চারদিকে চাপা তার ছোট্ট ঘরটা। পুব দিকে একটা মাত্র জানলা। ঝড়বৃষ্টির রাত বলে ভেজানো ছিল আজ। হঠাৎ সেদিকে ক্যাঁ-অ্যাচ্‌ করে একটা শব্দ। আস্তে আস্তে যেন খুলে যাচ্ছে জানলাটা। অনেকটাই ফাঁক হয়ে গেল। আকাশ দেখা যাচ্ছে! বুকের মধ্যে আবার ঢিব্‌ঢিব্‌ করে। হাওয়ার ঝাপটায় খুলে গেল কি পাল্লাটা? না কি, অন্য কোনও কারণ?

আর ভাবতে পারেন না সরকারমশাই। মাথার বালিশটা দু হাতে আঁকড়ে চোখ মুখ গুঁজে মড়ার মতো পড়ে থাকেন। আপ্রাণ চেষ্টা করেন সব কথা ভুলে একটুখানি অন্তত ঘুমোতে। অবশেষে অনেক কষ্টে শেষ রাতের দিকে একটা ঝিমটি এল চোখে। সরকারমশাই ঘুমিয়ে পড়লেন…

পরদিন ভোরবেলায় উঠেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন সরকার। নিজের চোখে দিনের বেলায় গলিটা একবার তদন্ত করে দেখতে গেলেন। ভাল করে চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকেন। কী উদ্দেশ্যে সে এসেছিল, জানা হয়তো সম্ভব নয় এখন। বা পাগলার সঙ্গে কোনও বোঝাপড়া হয়ে থাকলে, তাও না।

তবু দেখতে থাকেন একবার। যদি কিছু হদিশ পাওয়া যায়। পাগলাটা যদি এখনও ঘরে থাকে, তার ভাবগতিকটাও নজর করা যেতে পারে।

আস্তে আস্তে জঙ্গলের মধ্যেই ঢুকে পড়লেন। ভাঙা সিঁড়িটার মুখোমুখি। ঘাস গজিয়েছে সিঁড়ির ওপর। ঝাঁড়ালো থোকা থোকা ঘাস! কেউ যেন কাদা পায়ে মাড়িয়ে গেছে তার ওপর। বৃষ্টির জলে খানিক ধুয়ে গেলেও কাঁকর-বালি-কাদার ছাপটা গেঁথে আছে এখনও। সেই ছায়ামূর্তির পায়ের ছাপ কি?

ওপরের ঝাঁকড়া গাছ থেকে একটা ডাল ভেঙে পড়েছে আড় হয়ে। সিঁড়ির মাঝামাঝি পথটা আটকে দিয়েছে প্রায়। ডালপালার ফাঁক দিয়েই একবার উঁকি দিয়ে দেখলেন। কিন্তু এ কী দেখছেন তিনি! বুকটা ধড়াস করে উঠল সরকারবাবুর!

ঝিলিমিলে ফুল পাতাগুলোর আড়াল থেকে স্পষ্ট দেখছেন পাগলার শরীরটা। গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে ঘরের মধ্যে। শেষে এ কী অদ্ভুত কাণ্ড করে বসে আছে পাগল! ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন সরকারমশাই। শরীরটা যেন কেমন করছে। ফিরে যাবেন কি? কিন্তু না, আরও একটু স্পষ্ট করে দেখা দরকার।

ডালটা পেরিয়ে আরও ওপরে উঠলেন। হ্যাঁ, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন এবার। ছেঁড়া ময়লা পেণ্টুল পরা, ঝুলন্ত পা দুটো নিথর। ঘরের কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে শরীরটা। মুখটা বিকৃত। চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে। সরাসরি চোখে চোখ পড়তেই মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল আবার। চোখ বন্ধ করে ফেললেন হঠাৎ। কী করবেন এখন? ভেবে কিছুই যেন কুল কিনারা পান না।

একটুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে নেমে এলেন নীচে। লোকটা শেষে খ্যাপামি করতে করতে আত্মহত্যাই করে বসল! ভাবা যায় না। ছায়ামূর্তিটা কি তবে এই দৃশ্য দেখেই অমন তড়িঘড়ি পালিয়ে গেল কাল? নাকি ওর সঙ্গে আগেই দেখা হয়েছিল? পরে ক্ষিপ্ত হয়ে এই কাণ্ডটা করে বসল? দারুণ কোনও আঘাত কি পেয়েছিল মনে? কিন্তু কিছুই আর জানার উপায় নেই। সব জানাশোনার বাইরে চলে গেছে পাগল!

মুখে টু শব্দটা না করে আবার ঘরেই ফিরে এলেন তিনি। খবরটা কাকে

বলবেন এখন ? কর্তাবাবুরা সবাই ঘুমোচ্ছেন ! পুরোবাবু অন্যদিন সকাল বেলায় দড়ি নিয়ে লাফ ঝাঁপ করেন ছাতে। আজ তিনিও ওঠেননি। বৃষ্টি বাদলার রাত পেয়ে আরাম করে ঘুমোচ্ছেন সবাই।

এদিকে যে বাড়িতে এমন একটা কাণ্ড ঘটে বসে আছে, স্বপ্নেও ভাবতে পারছেন না কেউ। অথচ চটপট একটা কিছু ব্যবস্থা করা দরকার এর। কর্তাবাবুর ইচ্ছে থাক বা না থাক পুলিশ ডাকতে হবে। বৃত্তান্তটা থানাপুলিশ পর্যন্ত গড়াবেই এবার। সে আজই হোক আর কালই হোক। কেউ ঠেকাতে পারবে না।

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে ঝিম মেরে ঘরের মধ্যে বসে থাকেন সরকার। পরে মনে হল, ডিটেকটিভবাবুকে খবর দিলেই বোধহয় সবচেয়ে ভাল হয় এখন। তারপর কাল রাতে গাড়িতে বসে সুখেন্দুবাবুও একবার খোঁজখবর নিচ্ছিলেন পাগলার। সংবাদটা শুনলে তিনিও নিশ্চয় ছুটে আসবেন। যা যা করণীয় তারপর সব ঠিক-ঠাক ব্যবস্থা করে ফেলবেন। সব দিক দিয়েই যেমন প্রভাবশালী তেমনি বিচক্ষণ ব্যক্তি। তাঁর মতামত ছাড়া তো কোনও কাজই হবে না এ বাড়িতে।

অফিস ঘরে এসে শেষে সুখেন্দুকেই ফোন করলেন সরকারমশাই।

সুখেন্দু তখনও বিছানা ছাড়েননি। সুন্দর একটা স্বপ্নের ঘোর ভাসছিল চোখের সামনে। মুখোমুখি বসে আছেন দুজনে। তার আয়ত দৃষ্টিতে মৃদু অভিমান। ভ্রূযুগলে কটাক্ষের ঢেউ ··

হঠাৎ রিং বাজল টেলিফোনের তার মধ্যে। যেন এক স্বপ্নের টেলিফোন !

শুয়ে শুয়েই হাত বাড়িয়ে টেলিফোনটা ধরলেন সুখেন্দু, হ্যালো—তারপর খবরটা শুনেই চমকে উঠে বসলেন, অ্যাঁ! কী বলছেন আপনি ? কালকের সেই গানটা কানের মধ্যে এখনও যে শুনতে পাচ্ছেন ঃ

কে ডাকে মধুর তানে কাতর প্রাণে···আয় চলে আয়···ওরে আয় চলে আয় আমার পাশে···

তারপরই এমন একটা ঘটনা ! কোনও যোগাযোগ আছে কি এর মধ্যে ? মাথার ভিতর অনেক কথা ঘুরপাক খায় সুখেন্দুর।

বললেন, সুই-সাইড ! আপনি কী করে জানলেন ?

—সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে, আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি হুজুর।

—আমি যে বিশ্বাস করতে পারছি না সরকারমশাই।

—না হবারই কথা। আমিও দৃশ্যটা দেখে ভীষণ ঘাবড়ে গেছি, হুজুর। ডিটেকটিভবাবুর কথা মনে এল একবার। তারপর ভাবলাম আপনাকেই জানাই আগে।

—ভালই করেছেন। আপনি ভাববেন না, ডিটেকটিভ চ্যাটার্জিকে নিয়েই আমি যাচ্ছি। আপনাদের কর্তাবাবুকে বলছেন তো ?

—আজ্ঞে কর্তা এখনও ওঠেননি ঘুম থেকে। তাছাড়া ঘুম থেকে ডেকে তুলে সাত সকালেই এমন একটা খবর দেব··· একটু অপেক্ষা করছি।

—ক্ষিতি ?

—না, ওঁরা কেউই ওঠেননি। শুধু লাবি দিদিমণি গলা সাধতে বসেছেন।

—ও। একটু ভাবেন সুখেন্দু, পরে বললেন, শুনুন খবরটা এবার কর্তাবাবুদের জানিয়েই দিন আপনি। দেরি করবেন না। আর বলে দিন, ডিটেকটিভবাবুকে নিয়ে আমি ঘন্টাখানেকের মধ্যেই এসে পড়ছি, ও কে ?

—তাই হবে হুজুর।

সুখেন্দু রিসিভারটা রেখে দিলেন।

খবরটা ছড়িয়ে পড়তে আর দেরি হল না এবার। গোটা বাড়িতে হুলস্থুল তাই নিয়ে। কেউ কিছু বুঝতে পারে না ব্যাপারটা। পুরোবাবু, ক্ষিতিবাবু দুজনেই গুম মেরে বসে থাকেন পাশাপাশি। কর্তাবাবু তো একেবারে থ হয়ে তাকিয়ে থাকেন মুখের দিকে, তুমি কী বলছ ভূপাল !

—আজ্ঞে আমি নিজে দেখে এলাম, হুজুর।

—কিন্তু আমরা কী করব ? মুখটা বেশ গম্ভীর হয়ে যায় কর্তাবাবুর, একটা মাথা খারাপ পাগল, খেয়ালের বসে গলায় দড়ি দিয়েছে, তার জন্যে আমরা মাথা ঘামাতে যাব কেন ? কী বল হে, অ্যাঁ ?

—কিন্তু হুজুর পুলিশ এলে তো, এখানেই আগে ঢুঁ মারবে।

—না না ভূপাল, আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই এর মধ্যে। পুলিশে একবার ছুঁলেই হাজার ঝামেলা। আমরা বলব, ওকে আমরা চিনি না। আসত মাঝে মাঝে পোড়ো বাড়িতে, এই পর্যন্ত শুনেছি···

—কিন্তু ওই রাজেশ ছোকরারও তো কোন কারসাজি থাকতে পারে এর মধ্যে, হুজুর।

—তোমার সেইরকম কিছু মনে হচ্ছে নাকি ? কর্তাবাবু এবার একটু ঘাবড়ে গেলেন যেন।

—আজ্ঞে আমি বলছি না, তবে হতেও তো পারে। এখন ডিটেকটিভবাবু এসে যদি ধরতে পারেন ব্যাপারটা।

—ও। কর্তা গম্ভীর হযে ভাবতে থাকেন এবার।

সারা বাড়িতে একটা থমথমে ভাব যেন। ক্ষিতি, পুরো দুজনেই গম্ভীর মুখে বসে কর্তাবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করছেন। কেন এমন একটা কাণ্ড করে বসল পাগলা !

একমাত্র পল্লবীকেই কিছু বোঝানো যাচ্ছে না। এ বাড়িতে পাগলার সঙ্গে তারই যে নিকট সম্পর্ক ছিল সবচেয়ে। সমানে ঝরঝর করে কেঁদে যাচ্ছে মেয়েটা। সুবর্ণ-

ময়ী অনেক বোঝাচ্ছেন, তবুও থামছে না। দেখাদেখি জুঁইও চোখের জল ফেলছে দরজায় দাঁড়িয়ে।

সাতটা নাগাদ সুখেন্দু এসে হাজির হলেন। সঙ্গে দেবদত্ত আর রাতুল। তত-ক্ষণে মোটামুটি ধাতস্থ হয়ে নিয়েছে সবাই। সরকারবাবু উঠে গিয়ে তাঁদের ভিতরে নিয়ে এলেন।

দেবদত্ত বলল, আপনি তো প্রথম দেখেছেন, ব্যাপারটা।

—আজ্ঞে হুজুর। সরকার মাথা চুলকে বললেন।

ঘরের মধ্যে পরিক্ষিৎ, পুরন্দর, কর্তাবাবু সবাই চুপ।

দেবদত্ত হাত তুলে নমস্কার করে কর্তামশাইকে।

পন্নগবাবু সঙ্গে সঙ্গেই হাত জোড় করে মাথা নোয়ালেন, আসুন মিঃ চ্যাটার্জি। আপনিই একটু দেখুন দয়া করে, যদি কিছু ধরতে পারেন ঘটনাটা।

—নিশ্চয়ই মিঃ দত্ত, আমি দেখছি।

—সকালবেলায় উঠে এ কী ঝামেলা বলুন তো। অথচ আমরা বিন্দুবিসর্গ কিছু জানি না এর। কেন যে লোকটা এই কাজ করে বসল? মাথা আমার ঘুরছে তখন থেকে।

—না না, আপনি ভাববেন না। চলুন সরকারমশাই, জায়গাটা দেখিয়ে দেবেন আমাদের।

—হ্যাঁ, তাই চলুন আগে। সুখেন্দুও উঠে দাঁড়ালেন। পরিক্ষিতের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরাও চলো। যাওনি তো একবারও।

—না। সবাই মিলে যাবার দরকার কী সুখেন্দুদা? মিঃ চ্যাটার্জিই দেখে আসুন না, যা দেখবার। পরিক্ষিৎ মাথা নাড়লেন।

পন্নগভূষণ নিশ্বাস ফেলে বললেন, যা হবার তা তো হয়েই গেছে। এখন আর গিয়ে কীই বা হবে, মিঃ চ্যাটার্জি। যা করণীয় এবার আপনিই করুন।

—বেশ। আমিই দেখে আসছি তাহলে। আপনারা আগে পুলিশে একটা খবর পাঠিয়ে দিন। এটা জরুরি। আসুন সরকারমশাই—

বলেই রাতুলকে সঙ্গে নিয়ে পা বাড়াল দেবদত্ত।

সুখেন্দুবাবু সামান্য একটু ইতস্তত করেন। কিন্তু পরে কী ভেবে অনুসরণ করেন ওদের। বৃদ্ধ পাগলার জন্যে তিনিও কাতর হয়ে পড়েছেন যেন। লোকটাকে তিনি মনে মনে বেশ পছন্দই করে ফেলেছিলেন।

বৃষ্টি ধোয়া জঙ্গলটা এখনও যেন খাঁ খাঁ করছে। চারদিক নিস্তব্ধ। গতরাত্রির ঝড়ের তাণ্ডবে গাছপালাগুলোর যেন একটা বিধ্বস্ত চেহারা। হেলে পড়েছে এদিক

ওদিক। খুব সাবধানে পা ফেলতে হয়। তার মধ্যেও সবদিকে একটা সাবধানী সতর্ক দৃষ্টি ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে দেবদত্ত।

সিঁড়ির পাশেই একটা প্রকাণ্ড কৃষ্ণচূড়া গাছ। এক সময় শখ করে লাগানো হয়েছিল নিশ্চয়। এখন ডালপালা বিস্তার করে প্রকাণ্ড এক মহীরুহে পরিণত। কার্নিশ ছাড়িয়ে প্রায় ছাতের ওপর মাথা তুলেছে।

দেবদত্ত বলল, গাছটা দেখেছ রাতুল?

—হ্যাঁ কৃষ্ণচূড়া তো। দারুণ ফুল ফুটেছে।

—ফুলের জন্যে নয়, সিঁড়ির ওপর ডালটা কী রকম পড়ে আছে দেখ। লক্ষ কর, ডালটা মনে হচ্ছে ঝড়ে ভাঙা নয়।

—তাহলে? সুখেন্দু প্রশ্ন করেন, কী করে ভাঙল?

—সেটাই তো জানতে চাইছি। দেবদত্ত ধীরে ধীরে উঠতে উঠতে বলল!

ভাঙা ডালটা ছাড়িয়েই সরকারবাবু দেখালেন, ওই দেখুন। তার আগেই অবশ্য চোখে পড়েছে দেবদত্তর। দরজার মুখে এবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে হঠাৎ।

সামনেই গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে একটা দীর্ঘ লম্বা মানুষের শরীর। বয়েসটা ঠিক আন্দাজ করা যায় না। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যেই হবে সম্ভবত। ময়লা ছাই রঙের একটা প্যাণ্ট, গায়ে বুক খোলা হাফ হাতা শার্ট। মুখভর্তি কাঁচাপাকা দাড়ির জঙ্গল। চোখ দুটোই সাংঘাতিক সবচেয়ে। যেন কী এক ভয়ানক আতঙ্কে ঠেলে বেরিয়ে আসছে। দেখলেই বুকের মধ্যে ধড়াস করে ওঠে।

ঘরের বাদুড় চামচিকের দলও যেন সন্ত্রস্ত হয়ে এই দৃশ্য দেখে। ওড়াউড়ি বন্ধ রেখে আড়ালে বসে কিচমিচ করছে আজ।

সুখেন্দু বললেন, কাল রাতেই গান শুনেছি ওর। আর আজ এই অবস্থা। ভাবতে পারছি না আমি।

দেবদত্ত একবার ফিরে তাকাল সুখেন্দুর মুখের দিকে। তারপর আস্তে আস্তে ঝুলন্ত ডেডবডিটার কাছে এসে দাঁড়াল।

রাতুল সন্ধানী দৃষ্টিতে পুরো ঘরটার এদিক ওদিক নজর করে চলেছে। ওপরে পাগলের প্রাণহীন দেহ। আর নীচে ছড়ানো তার ফেলে যাওয়া পার্থিব সংসার। ছেঁড়া-খোড়া কাগজ, জ্যামের শিশি, বিস্কুটের প্যাকেট, থিয়েটারের হ্যাণ্ডবিল, চিঠির টুকরো···বেছে বেছে টুকটাক কিছু পকেটে পুরে নেয় রাতুল।

দেবদত্ত ডেডবডিটার কাছে দাঁড়িয়ে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে একদৃষ্টিতে। রাতুলকে ইঙ্গিত করে ফটো তুলতে একটা। রাতুল ঝোলা থেকে ক্যামেরা বের করে এই অবস্থায়ই ফটো তুলে নেয়। পরে রাবিশের ঢিবিটা ফোকাস করে আলাদা আর একটা ছবি।

দেবদত্ত লক্ষ করে, পুরনো কড়িকাঠের নাগাল পেতে ঢিবির ওপরই হয়তো

উঠেছিল লোকটা। সেখানে দাঁড়িয়ে ফাঁস লাগিয়েই এদিকে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে। না হলে অত ওপরে যাওয়া সম্ভব ছিল না।

কিন্তু পাগলের মুখের চেহারা দেখে অন্যরকম একটা সন্দেহ হয়। ইজ ইট এ ডেথ বাই হ্যাংগিং?

মুখটা বন্ধ। চাপা ঠোঁটের দুপাশেও কোনও দাগ নেই। ঘাড়টাও অন্যরকম। মোটামুটি সোজাই মনে হচ্ছে। তবে? অদ্ভুত সন্দেহটা তার দৃঢ় হয় ক্রমশ।

শার্টের পিছন দিকটা লক্ষ্য করে। এখনও যেন জলে ভিজে। প্যান্টের অবস্থাও তাই। দুটোতেই রাবিশের গুঁড়ো মাখা। প্যান্টের নীচের দিকে আবার খোঁচা লেগেছিল একটা। গোড়ালির পাশে কালচে রক্তের দাগ। পড়ে গিয়েছিল কি!

তাকাল আর একবার ওপরে। ফাঁস লাগানো দড়িটার দিকে। বেশ কিছুক্ষণ লক্ষ করে।

তারপর মেঝের দিকটাই আবার পরখ করে নিচু হয়ে। হাঁটতে হাঁটতে সিঁড়ির দিকে যায়। রাতুলও সঙ্গে হাঁটছে। সন্দেহের গন্ধটা যেন সেও টের পেয়েছে।

বলল, দাদা সামথিং রং?

—ইয়েস রাতুল। সামথিং ভেরি আনইউজুয়াল।

কৃষ্ণচূড়ার গাছটা লক্ষ করতে করতে নিজের মনেই বলল, ইয়েস, নট আনলাইকলি অ্যাট অল·

আবার এসে দাঁড়াল ডেডবডিটার কাছে। বিশেষভাবে লক্ষ করে তার পিঠের দিকটা, হাত দুটো, লম্বা লম্বা বনমানুষের মতো নখগুলো, ঘাড়, গলা, চোখের মণি দুটো।

তন্ময় হয়ে ভাবে কী একমনে। তারপর মাথা নেড়ে বলল, না, সরকারমশাই। এ লোকটা কিন্তু আত্মহত্যা করেনি। ইটস এ কেস অফ প্লেইন মার্ডার। অ্যান্ড ইট ওয়াজ প্ল্যানড ভেরি কেয়ারফুলি।

—সে কী বলছেন স্যার, খুন? সরকারবাবুর স্বর বন্ধ হয়ে আসে।

সুখেন্দু বললেন, মাই গুডনেস! ওকে কে মার্ডার করবে? কেনই বা করতে যাবে?

—সেটা সম্পূর্ণ আলাদা প্রশ্ন। ধরে নিন কোনও আগন্তুকের সঙ্গে হয়তো লড়াই বেধেছিল, ক্ষিপ্ত হয়ে ধাওয়া করে ছিল পাগল। সঙ্গে সঙ্গে গলায় ফাঁস দিয়ে সেই-ই লটকে দিয়ে গেছে।

—তার মানে কি, রাজেশের লোকজন কেউ এসেছিল এখানে?

—নিশ্চিত কিছু বলা মুশকিল। আপনাদের নকুল আচার্যও হতে পারেন। কিন্তু এখন সেটা বিবেচ্যও নয়। প্রথম এবং প্রধান কাজ এখন, হাউ হি ওয়াজ মার্ডারড? অ্যান্ড হু ইজ হি? সেটাই ঠিক করা।

সরকার বললেন, গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে যে লোকটা, সে খুন হল কেমন করে?

—খুব সোজা। আগে খুন করে, পরে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছে।

—কী সর্বনাশ! দেখে তো কিছুই বোঝার উপায় নেই।

—সেটাই উদ্দেশ্য খুনির। সবাইকে বোকা বানানো। এবং আমরাও যে একটু আধটু বোকা হইনি তাও নয়। কিন্তু এখন আর সন্দেহ নেই। ওকে আগেই খুন করা হয়েছে।

রাতুল বলল, পিঠে অত রাবিশ আর ময়লা দেখে আমারও খটকা লাগছিল।

—ঠিকই অনুমান করেছ, আগে ওকে খুন করে তারপর টেনে হিঁচড়ে তোলা হয়েছে ঢিবির ওপর।

সুখেন্দু বললেন, ওর পায়ের দিকটাও বেশ ছড়ে গেছে কিন্তু।

—ইয়েস, থ্যাঙ্ক য়ু ফর ইয়োর ফাইন অবজারভেশান, দেবদত্ত চোখ ঘোরাল, এটা হয়তো অন্য কারণে।

—কী কারণে?

—মনে হয় খুনি ডেডবডিটা হাতের কাছাকাছি ওই কৃষ্ণচুড়ার ডালেই লটকাতে চেয়েছিল প্রথমে। কিন্তু হল না, 'কৃষ্ণচুড়া করেছিল প্রতিবাদ'—দেবদত্ত মাথা নাড়ল, তখনই হয়তো ডালটা ভেঙে গেল মড়মড় করে বৃষ্টির মধ্যে। ওর জামা ভিজল, প্যাণ্ট ভিজল, পায়ের দিকটা থেঁতলে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যানটাও বদলে গেল। ওকে টেনে হিঁচড়ে ঢিবির ওপর তুলে শেষ কড়িকাঠেই লটকানো হল। লক্ষ করুন আপনারা, চিহ্নগুলো একটু একটু সবই পাবেন এখনও।

সরকার হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন মুখের দিকে দেবদত্তর। বললেন, কী আশ্চর্য স্যার! আমরা একটুও বুঝতে পারলাম না কিছু!

—সরকারমশাই, গলায় দড়ি দিয়ে মৃত্যু হলে, তার কতগুলো স্পষ্ট লক্ষণ আছে যে ডাক্তারিশাস্ত্রে। সেগুলো জানা থাকলে আপনিও বুঝতেন। এখনও আরও কিছু পরীক্ষা বাকি অবশ্য, তাহলেও আপাতদৃষ্টিতে আমি নিশ্চিত, এটা সুইসাইডের কেস নয়।

সুখেন্দু বললেন, কিন্তু ওর শরীরে তো তেমন কোন ইনজুরি নেই। খুনটা হল কী করে?

রাতুল বলল, মনে হচ্ছে ডেথ বাই স্ট্র্যাংগুলেশান—গলা টিপে শ্বাস বন্ধ করেই মারা হয়েছে।

দেবদত্ত সায় দিল, ইয়েস রাতুল। কিন্তু সেটা এখনও প্রমাণসাপেক্ষ। বডিটা না নামিয়ে বলা যাবে না। তবে এটা ঠিক, মৃত্যুর আগে খানিকটা ধস্তাধস্তি হয়েছিল দুজনের।

—বলেন কী! সরকারমশাই তাকালেন ওপরে।

—হ্যাঁ। এবং খুনিকেও ও সহজে রেহাই দেয়নি। কিছু চিহ্নও রেখে দিয়েছে আমাদের জন্যে। ওর হাতের নখগুলো লক্ষ করুন। শেষবারের মতো পাগল

খুনির শরীরটা খামচে ধরেছিল নিশ্চয়ই। তারই কিছু কিছু নমুনা, রক্ত মাংসের ছিটে, গায়ের রোম—এখনও লেগে আছে ওর হাতে। নখগুলোর মধ্যে। দেখুন ভাল করে আপনারা।

—ওহ ইয়েস, রিয়েলি! ইট ইজ দেয়ার। আশ্চর্য আপনার দৃষ্টি মিঃ চ্যাটার্জি। সুখেন্দু মুগ্ধ হয়ে মন্তব্য করেন।

—এবং এটাই আপাতত আমাদের একটা বড় ক্লু। দেবদত্ত বলল নিজের মনে।

১২

থানা থেকে পুলিশের লোকজন আসতে প্রায় নটা বেজে গেল। ততক্ষণে খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে। বাগানের আশেপাশে দুচারজন উঁকিঝুঁকিও মারতে শুরু করেছে।

তদন্তের ভার নিয়ে এসেছেন সাব ইন্সপেক্টর মহীতোষ ঘোষাল। ভদ্রলোক পরিচিত দেবদত্তর। ঘটনাস্থলে তাকে দেখে খুবই উৎফুল্ল হলেন।

অ্যাটেনশানের ভঙ্গিতে বললেন, গুড মর্নিং স্যার। আপনি যখন এসে গেছেন, তখন আমার আর কোনও চিন্তা নেই।

দেবদত্ত ধন্যবাদ দিয়ে হাসল একবার

—আর, এটা তো বোধহয় একটা সিম্পল অ্যাণ্ড অর্ডিনারি কেস, স্যার। গলায় দড়ি স্বেচ্ছায় দিয়ে সুইসাইড করেছে, নাকি কারও প্ররোচনায় করেছে। ব্যস্! এর মধ্যে তেমন আর কী আছে…

দেবদত্ত কোনও উত্তর না দিয়ে শুনতে থাকে তাঁর কথাগুলো।

—কিন্তু আপনার সেই চণ্ডীতলার কেসটা, উফ্ এখনও মনে আছে আমার! ঘরে বসেই কী দারুণ ডিডাকশন করেছিলেন। চোখে প্রায় আঙুল দিয়ে আমাদের চিনিয়ে দিয়েছিলেন খুনিকে। লোকের কাছে এখনও স্যার, গল্প করি সেই কেসটার, অথচ কী ভীষণ জটিল ছিল ব্যাপারটা…

—মিঃ ঘোষাল, দেবদত্ত বলল এবার, এই কেসটাও খুব সাধারণ নয়, যতটা আপনি মনে করছেন। গলায় দড়ি দিয়ে কিন্তু মৃত্যু হয়নি এই লোকটার।

—সে কী বলছেন মিঃ চ্যাটার্জি! আমি যে শুনলাম…

—নো, ইটস নট এ সুইসাইড, বাট এ কেস অফ হোমিসাইড।

—বলেন কী, হোমিসাইড! মহীতোষবাবু বেশ চমকে গেলেন খবরটা শুনে। তার মানে মার্ডার করে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়ে গেছে কেউ?

—এক্জ্যাক্টলি। অন্তত আমার তাই ধারনা, মিঃ ঘোষাল। এখন আপনি নিজে একবার ইন্সপেকশন করে দেখুন, কী মনে হয়।

—না না, স্যার। আপনি যখন বলছেন, তখন বিষয়টা নিশ্চয়ই গুরুতর…

বলতে বলতে হঠাৎ গুম মেরে গেলেন ভদ্রলোক। মনের মধ্যে ঘুরপাক খায় অনেকগুলো চিন্তা। যদি সত্যিই তাই হয়? তাহলে তো তদন্তের ঝামেলাটা বেড়ে গেল বহুগুণ। ওপরঅলাদের নজর পড়ে যাবে এ দিকে। অথচ থানায় অভিযোগ হয়েছে, একটা সুইসাইড। গলায় দড়ি দিয়ে সুইসাইড করেছে একটা অচেনা পাগল। এখন যে কেসটা বেমালুম ঘুরে গেল! তাহলে? দেবদত্তের সঙ্গেই পরামর্শ করতে থাকেন অগত্যা। কী ভাবে কী করা যায় এখন।

লাশটা নামানো হল মাটিতে।

সটান চিত হয়ে শুয়ে আছে খোলা চোখে পাগল। সরকারমশাই যেন সহ্য করতে পারেন না দৃষ্টিটা। মুখ ফিরিয়ে সরে গেলেন! দেবদত্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। মহীতোষও দেখছেন মনোযোগ দিয়ে। পাশে সুখেন্দু, নিশ্বাসটা হঠাৎ যেন বন্ধ হয়ে আসছে তাঁর। রাতুল দেখতে দেখতে শাটার টেপে ক্যামেরার।

হঠাৎ চুপচাপ যেন সবাই। সবার একটাই দ্রষ্টব্য এখন। মেঝের ওপর নিথর হয়ে পড়ে থাকা সেই অদ্ভুত পাগল লোকটা। এই পৃথিবীর সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক নেই যার। আস্তে আস্তে ওর চোখ দুটো বন্ধ করে দিতে থাকে একজন পুলিশের লোক। সুখেন্দু মুখ ফিরিয়ে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে রইলেন!

নীচে গাছের ডালটা কেটে পথ পরিষ্কার হচ্ছে খানিক। আর একটু পরেই সম্ভবত শুরু হবে পাগলের অন্তিম যাত্রা। মহাসিন্ধুর ওপারে। যে দেশে জরা নেই, মৃত্যু নেই, সেই চির বসন্তের দেশেই হয়তো সে ফিরে যাবে এবার। প্রকাণ্ড বড় গাছটার দিকে তাকিয়ে কথাগুলো ভাবতে ভাবতে মন ভারী হয়ে আসে সুখেন্দুর। লোকটাকে আগে কখনও চোখেই দেখেননি। তবু এমন হয়!

এ দিকে মহীতোষবাবু এখনও ডেডবডিটা পরীক্ষায় ব্যস্ত। লক্ষণগুলো একটা একটা করে মিলিয়ে দেখছেন শরীরের। ঠিকই বলেছেন, মিঃ চ্যাটার্জি। মেডিক্যাল জুরিস্‌প্রুডেন্স অনুযায়ী এটাকে গলায় দড়ির কেস হিসাবে মানতে সত্যিই খটকা লাগছে। বরং ফাঁস আটকে বা গলা টিপে খুন করা হয়েছে—এই মতটাই বেশি বিশ্বাসযোগ্য'।

আরও একবার পরামর্শ করতে থাকেন দেবদত্তর সঙ্গে। কী ভাবে খুনি কাবু করল পাগল লোকটাকে। পাগলরা স্বভাবতই অনেক বেশি তেজি আর হিংস্র হয়ে ওঠে এই সব সময়।

রাতুলও আলোচনায় যোগ দেয় এবার। বিশেষ করে সে জামার আর প্যান্টের দাগগুলোর কথা বলে। স্পষ্টই একটা ধস্তাধস্তির ইঙ্গিত। মহীতোষবাবু ঘাড় নাড়েন, ইয়েস মিঃ সেন।

দেবদত্ত হাতের নখগুলোর দিকে আঙুল দেখাল, এই অস্ত্রগুলোও কিন্তু কম

কাজে আসেনি। আর এর মধ্যেই রয়ে গেছে একটা মোক্ষম প্রমাণ। খুনির শরীরের রক্ত, মাংস, চামড়া, তার লোম···। ফোরেনসিক টেস্টে পাঠালেই সব ধরা পড়বে। এটাই সবচেয়ে জরুরি।

মহীতোষবাবু উৎসাহিত হয়ে বলেন, নিশ্চয় স্যার! আজই পাঠাব আমি টেস্টে ওগুলো।

—আর এখানেই হয়তো পাওয়া যাবে তার আঙুলের ছাপ। গলায় নীলচে ফুলে ওঠা দাগগুলোর পাশে একটা কাঠি বোলায় দেবদত্ত।

—হ্যাঁ, আমারও মনে হচ্ছে, স্যার।

গলার দড়িটা নিয়েও খানিক পরীক্ষা করে দেবদত্ত। বলল, কর্ডটা বেশ পুরনো, ধারের দিকে মর্চের দাগ, ব্যবহার হয়েছে এর আগে। যাক, জিনিসটা সাবধানে রাখবেন, দরকার পড়তে পারে—।

—অফকোর্স! এটা তো রাখতেই হয় আমাদের।

—তা হলে মিঃ ঘোষাল, এখন আপনার কী মনে হচ্ছে? এটা হত্যা না আত্মহত্যা?

—ডেলিবারেট অ্যান্ড প্ল্যানড মার্ডার! সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহই নেই, স্যার। এখন খুন কখন হল এবং ঠিক কী ভাবে হল, সে বিষয়ে নিশ্চন্ত হতে হবে আমাকে।

—সেটা খুব বড় সমস্যা নয়। পোস্টমর্টেম করলেই একটা হদিশ পেয়ে যাবেন। কিন্তু তার চেয়ে অনেক জরুরি এখন আপনার বার করা, কাকে খুন করা হল, এবং খুনটা কে করল? বুঝতে পারছেন, কার খুনের তদন্ত করছেন আপনি!

মহীতোষবাবু মাথা নেড়ে গম্ভীর হয়ে ভাবতে থাকেন, মার্ডার কেস হলে, এগুলোই প্রথম ও প্রধান ব্যাপার ইনভেস্টিগেশানের। কিন্তু মুশকিল হল, এখানে খুনের কোনও মোটিভ তো পাওয়া যাচ্ছে না। সেটা না হলে এগোবেন কোন পথে? একটা পাগল লোককে হঠাৎ কেন খুন করতে গেল একজন? তার উদ্দেশ্যটা কী?

আবার আলোচনা করেন একটু সমস্যাটা নিয়ে। রাতুল বলল, আমার মনে হয়, সবচেয়ে আগে লোকটার আইডেন্টিফিকেশান দরকার একটা। সেটা হলে ছবিটা পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

—ইয়েস। দেয়ার য়ু আর রাতুল! নিহতের জীবনের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে তার খুন হওয়ার আসল কারণ। এবং অনেকটা তার পারিপার্শ্বিকের মধ্যেও। তাই আগে দরকার লোকটা এবং তার পারিপার্শ্বিককে জানা, এবং তারপর তার খুনিকে।

মহীতোষবাবু বললেন, কিন্তু একে কে আইডেন্টিফাই করবে, স্যার? সবাই তো বলছে, একটা অচেনা পাগল।

—তবু চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে আমাদের। সেটাই তো প্রথম ধাপ তদন্তের।

লাশটা নীচে নামিয়ে এবার পাবলিককে দেখার সুযোগ করে দিন। যদি কোনও বেরিয়ে আসে হঠাৎ। সুখেন্দুবাবু, আপনি কী বলেন?

—আমি ঠিক ধরতে পারছি না প্ল্যানটা।

—কেউ একজন এসেও তো যেতে পারে পাগলার চেনা লোক ওর মধ্যে। অথবা পাগলার এই অবস্থাটা নিজের চোখে যাচাই করার জন্যেও যদি কেউ উপস্থিত হয়। সেটা জানার জন্যেই জালটা পেতে শিকারির মতো অপেক্ষা করা। আর কিছু নয়। মৃদু রহস্যের হাসি দেবদত্তের মুখে।

—আই সি! অদ্ভুত প্ল্যান তো আপনার! এতে কাজ হবে?

—দেখাই যাক না। এই এলাকার আশপাশের লোকগুলো যদি আসতে থাকে ভিড় করে, কেউ না কেউ কি একটা সুতো ধরিয়ে দেবে না আমাদের?

—অসম্ভব নয়। অবশ্য আপনিই সেটা ভাল বুঝবেন— ।

—আমার ইচ্ছে, কর্তা পন্নগভূষণও একবার এসে দেখুন নিজে। কখনও তো চোখে দেখেননি। শুধু গান আর গলা শুনেছে।

—অবশ্যই, বলে দেখতে পারেন। কিন্তু মেসোমশাই কি আসবেন এখানে?

মহীতোষবাবু বললেন, আমাদের দরকার হলে অবশ্যই আসতে হবে। তদন্তের প্রয়োজনে পুলিশ যদি মনে করে…

দেবদত্ত থামিয়ে দিল যুবক অফিসারটিকে, ধীরে, মিঃ ঘোষাল ধীরে, অত ব্যস্ত হবার কিছু নেই। মাথাটা ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করবেন এ সব কাজে? সব ব্যবস্থা আপসে হয়ে যাবে। আপনি ডেডবডিটা আগে নামাবার ব্যবস্থা করুন।

—ঠিক আছে, স্যার।

সুখেন্দু একটু সরে এসে চাপা গলায় ফিসফিস করে বললেন, মিঃ চ্যাটার্জি, যদি রাজেশের কোনও হাত থাকে এর মধ্যে, তা হলে কি কোনও লাভ হবে এতে?

দেবদত্তও ফিসফিস করে জবাব দেয়, হবে— ! ব্যস্ত হবেন না। সব মাথায় আছে আমার…

একটা বাঁশের মাচার ওপর লাশটা শুইয়ে আস্তে আস্তে নামানো হল রাস্তায়। ওপরে নীল আকাশ, সবুজ গাছগাছালি। আর নীচে নিথর হয়ে ঘুমিয়ে থাকা পাগলার পার্থিব শরীর!

পিল পিল করে লোক ছুটে আসে চারদিক থেকে। সবাই দেখতে চায় ঘটনাটা। মুখ চোখ বিকৃত করেও দেখে এক দৃষ্টিতে। মন্তব্য করে অদ্ভুত অদ্ভুত। রাতুল ক্যামেরাটা ঝুলিয়ে রেখেছে গলায়। সুযোগমতো টুকটাক শাটার টেপে।

মহীতোষবাবু জনে জনে জিজ্ঞেস করে চলেছেন, কী ভাই চেনো নাকি?…দেখুন তো আপনি ভাল করে, লোকটাকে চিনতে পারেন কি না?…কী মনে হয়, দেখেছেন এর আগে কোথাও…

সরকার একপাক ঘুরে এলেন ভেতর থেকে। দেবদত্তকে বললেন, স্যার, একবার ও দিকে যেতে হয়। একটু চা-টা খেয়ে নেবেন আপনারা—।

—হ্যাঁ নিশ্চয়ই যেতে হবে। কিন্তু তার আগে, আপনি আমাকে একটা সত্যি কথা বলুন তো সরকারমশাই।

ভিড় থেকে পাশে সরে এল দেবদত্ত সরকারমশাইয়ের হাত ধরে। সরকার অবাক। বললেন, আজ্ঞে কী বলছেন আপনি……

—এই লোকটাকে কি আপনিও চেনেন না?

—ন্‌না, না হুজুর। আ-আমি কী করে চিনেব।

—যদি একটা আন্দাজ-টান্দাজও করতে পারেন, সেটাই বলুন না প্রাইভেটলি আমাকে, কেউ জানবে না —।

ভদ্রলোকের হাতপাগুলো যেন ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকে এবার। মুখটা বিবর্ণ, না স্যার, সত্যি বলছি, আমি কিছুই জানি না—

মহীতোষবাবু এগিয়ে এলেন, এই যে স্যার, ইনি চেনন বলছেন।

দেবদত্ত দেখল লোকটাকে, আপনি? বলুন কী জানেন?

ভদ্রলোকের নাম গৌরহরি পাল, মাস্টার টেলার। এ পাড়ায় অনেকদিনের দোকান। ড্যাবা ড্যাবা চোখে তাকিয়ে বললেন, আমার মুখটা যেন কেমন চিনা চিনা লাগে, স্যার।

—তাই? কোথায় দেখছেন বলুন তো?

—এই বিডোন স্ট্রিটের দিকে দেখছি, পার্কের ধারে ঘোরাঘুরি করতে।

—আর কিছু? ওর নাম, বা কী করত ওখানে?

—এই সব কইতে পারি না, তবে দেখছি আমি অরেই ঠিক। পাল খুব আত্ম-বিশ্বাস নিয়ে চোখ ঘোরান।

—ও। হতাশ হয়ে বলেন মহীতোষাবাবু।

পাল চলে গেল। কিন্তু লোক আসার কোনও কামাই নেই। দূর দূর থেকে খবর পেয়ে সব চলে আসছে। নানারকম মন্তব্য করে তারা নিজেদের মধ্যে। একজন বলে, ভোরবেলায় বাসস্ট্যান্ডের দিকে যেতে দেখেছি একে। সমর্থন করে আর একজনও, হ্যাঁ আমিও দেখেছি।

তার মধ্যেই হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে নেমে এলেন একজন সম্ভ্রান্ত চেহারার ভদ্রলোক। সটান এগিয়ে এসে বললেন, কী সরকারমশাই, আপনাদের পাগল লোকটা গলায় দড়ি দিল শেষে! কী কাণ্ড!

কিন্তু ডেডবডিটার মুখের দিকে তাকিয়ে যেন কথা বন্ধ হয়ে গেল তাঁর। আরও

কাছে এসে নজর করে বললেন, আশ্চর্য। সরকারমশাই, লোকটা আমাদের সুধা নয় তো!

—না না রঞ্জনবাবু, সে কী করে সম্ভব! কোথায় সুধাবাবুর চেহারা আর কোথায় এ। আকাশপাতাল তফাত।

দেবদত্ত যেন এইরকমই একটা পরিস্থিতির অপেক্ষায় ছিল। চটপট এগিয়ে নিজের পরিচয়টা দেয় ভদ্রলোককে। একটা কার্ডও দিল, নাম ঠিকানা লেখা। তারপর নমস্কার করে বলল, ইনি কে আমরা সনাক্ত করতে পারছি না। অথচ ইনভেস্টিগেশানের জন্য সেটা জানা অত্যন্ত জরুরি, যদি অনুগ্রহ করে আপনি একটু সাহায্য করেন আমাদের—

—অবশ্যই। ভদ্রলোক প্রতি নমস্কার করে হাত বাড়িয়ে দিলেন, আমি রঞ্জন চৌধুরী, অ্যাডভোকেট। বলুন কী জানতে চান আপনারা?

দেবদত্ত বলল, আপনি যে সুধার কথা বললেন এক্ষুনি, তিনিই কি সুধাকান্ত দত্ত? যিনি নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলেন এই বাড়ি থেকে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। আপনি কী জানেন তার কথা?

—জানি না, তবে শুনেছি কিছু কিছু। তা হলে এই লোকটার সঙ্গে মিল পাওয়া যাচ্ছে সুধাকান্তবাবুর। আপনি বলছেন?

ব্যাপারটা কোন দিকে গড়াচ্ছে বুঝে যেন একটা ঢোক গিললেন রঞ্জনবাবু, দেখুন, সে ভাবে নিশ্চিত করে কিছু বলা মুশকিল। আমার জাস্ট মনে এল কথাটা, বলে ফেললাম। একটা সম্ভাবনা আর কি। তা ছাড়া সরকারমশাই যখন চিনতে পারছেন না, তখন জোর দিয়ে আর বলি কী করে।

—কিন্তু এটা না জানলে যে আমাদের চলবে না, রঞ্জনবাবু। আপনি কি কোনওভাবেই আমাদের আর একটু সাহায্য করতে পারেন না? যদি আর কেউ কিছু জানে বলে মনে করেন—

ভদ্রলোক ভাবলেন একটু। তারপর বললেন, সবচেয়ে ভাল হয়, আপনারা যদি সুধার ন দিদার খোঁজ করতে পারেন একবার। বয়েস হয়ে গেছে এখন। তবু ছোট থেকে কোলেপিঠে করে তিনিই মানুষ করেছেন তো, দেখলে ঠিকই চিনবেন। আর তিনি একবার হ্যাঁ বললে, আর না বলতে পারবে না কেউ।

—ন দিদা? তাঁকে কোথায় পাওয়া যাবে এখন।

—পাবেন। শুভোব মিত্তিরদের সঙ্গে খুবই আত্মীয়তা ওঁদের। সরকারমশাই সব জানেন। একটু চেষ্টা করলে ঠিক খোঁজ পাওয়া যাবে।

—থ্যাঙ্ক য়ু মিঃ চৌধুরী। থ্যাঙ্ক য়ু ভেরি মাচ। খুব উপকার করলেন আমাদের। আশা করি আপনাকে আবার পাব প্রয়োজন হলে—

—অবশ্যই। আমি এ পাড়ারই লোক, দরকার হলে বলবেন। আচ্ছা আসছি এখন, নমস্কার—

পরিস্থিতিটা পুরোপুরি বদলে গেল এবার। হিসেবমতো একটা ক্ষীণ সূত্র অন্তত পাওয়া গেছে। সেটা ধরেই জোর তৎপরতা চালান মহীতোষবাবু। লোক চলে গেল গাড়ি নিয়ে সুধাবাবুর ন দিদার খোঁজে। যে করেই হোক, একবার হাজির করাতে হবে ভদ্রমহিলাকে। এখন তাঁর উপরই নির্ভর করছে সব।

এ দিকে পন্নগভূষণকেও নিয়ে আসা হল। খুবই ভেঙে পড়েছেন বৃদ্ধ। সঙ্গে ক্ষিতিবাবু, পুরোবাবু ওঁরাও আসেন। অসম্ভব একটা টেনশানে মুসড়ে পড়েছেন সবাই। রাশভারী ক্ষিতিবাবু একভাবে লোকটার দিকে তাকিয়েই থাকেন। শেষে এই রকম একটা কাণ্ড করে সে, সবাইকে বিপদে ফেলে যাবে, যেন ভাবতেও পারেননি কখনও।

কিন্তু শেষপর্যন্ত কেউই সনাক্ত করতে পারেন না তাঁরা। পন্নগবাবু ঝাপসা দৃষ্টিটা মেলে অনেকক্ষণ ধরেই দেখলেন। পরে মাথা নাড়লেন, না কখনো না।

একবার রঞ্জনবাবুর কথাটা উল্লেখ করতেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন আরও।

বললেন, হামবাগ! কোথায় আমাদের সুধাকান্ত! রাজপুত্তুরের মতো চেহারা একটা। তার সঙ্গে এই ভূতের মতো পাগলটার তুলনা! ছোঃ—!

—কিন্তু চেহারাটা কি মানুষের বরাবর একরকম থাকে মিঃ দত্ত? অবস্থার ফেরে বয়েসের পোড় খেয়ে পাল্টেও তো যায় অনেক।

—না মিঃ চ্যাটার্জি, কর্তাবাবু মাথা নাড়েন, আপনি যাই বলুন, একে আমি সুধা বলে কোনও মতেই মানতে পারছি না—।

পুরোবাবু বললেন, তা ছাড়া সুধা হলে এখানে লুকিয়ে থাকতেই বা যাবে কেন দিনের পর দিন? আর, বেছে বেছে শুধু রাত্তিরবেলাটা?

ক্ষিতিবাবুও সায় দিলেন, ঠিকই বলছে পুরো। সুধা হলে এই রকম অদ্ভুত কাজ করতে যাবে কেন?

—সেটা অন্য প্রসঙ্গ মিঃ দত্ত, দেবদত্ত বলল, আপাতত আমাদের একটা কথাই বিবেচ্য—এই লোকটির সঙ্গে নিরুদ্দিষ্ট সুধাকান্ত দত্তর কোনও মিল আছে, কি নেই?

পন্নগভূষণ কোনও উত্তর না দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন গম্ভীর মুখে। মানী লোক। খুবই অপদস্থ হচ্ছেন যেন কতকগুলো উটকো লোকের হাতে। কী আর করা। দাঁতে দাঁত চেপে মেনে নিচ্ছেন সব।

সুখেন্দু বললেন, মেসোমশাই লাবি একবার আসতে চাইছে এখানে।

—সে কী! পন্নগবাবু চমকালেন, না না, ও কী করে আসবে এখানে?

—বাধা দেবেন না প্লিজ! শুনেছি পাগলাটা ওকে গান শোনাত, দুজনে কথাও হত মাঝে মাঝে, একবার দেখে গেলে ক্ষতি কী? দেবদত্ত বলল।

—ইনভেস্টিগেশনের প্রয়োজনে এটা দরকার আমাদের। মহীতোষবাবু বলে উঠলেন।

—ঠিক আছে। হতাশ হয়ে বললেন কর্তাবাবু।

সুখেন্দুই গিয়ে নিয়ে এলেন লাবিকে। চোখ দুটো এখনও ছলছলে, মুখ নিচু করে হেঁটে আসে আস্তে আস্তে। পিছনে জুঁইকেও দেখা যায়।

চারপাশের ভিড়টা হঠাৎ বাড়তে থাকে সঙ্গে সঙ্গে। রাতুল নিজে গিয়ে দাঁড়াল পুলিশের সঙ্গে এই যে, একটু সরুন, সরে যান পিছন দিকে—আরও, আরও—

জুঁই চোখ তুলে একবার তাকাল। তারপর ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল পাগলের চেহারা দেখে।

পল্লবীও আর সামলাতে পারে না। জুঁইয়ের দেখাদেখি সেও কেঁদে ফেলে।

দেবদত্ত অবাক হয়ে দেখে। অবশেষে এতক্ষণে যেন মৃত লোকটার কোনও আপনজন এসে কাছে দাঁড়াল। যদি ওর আত্মা থাকে কোথাও, হয়তো শান্তি পাবে।

সে একটু শান্ত হতেই, দেবদত্ত বলল, এক্সকিউজ মি, মিস দত্ত। আপনাকে একটু ডিসটার্ব করব।

লাবি অবাক চোখে তাকিয়ে বলল, বলুন— ।

—এই লোকটার মুখের সঙ্গে আপনার দাদা, নিরুদ্দিষ্ট সুধাকান্তর কি কোনও মিল দেখতে পান আপনি ?

লাবি তাকিয়েই থাকে দুঃখী দুঃখী মুখে। তারপর দু পাশে মাথা নাড়ল, না। আমি চিনতে পারছি না। আমি—

চোখে জল এসে পড়ে আবার।

—থ্যাঙ্ক য়ু। আপাতত আর কোনও প্রশ্নই নেই আমার।

অবশেষে অসাধ্য সাধন করলেন সরকারবাবু আর আই বির লোকেরা মিলে। খুঁজে খুঁজে সুধাকান্তবাবুর ন দিদা কুসুমকুমারীদেবীকে ঠিক হাজির করালেন স্পটে। কিন্তু চেহারাটা দেখে একটু দমে যায় দেবদত্ত। একে দিয়ে কি সম্ভব হবে কাজটা ? বয়েসের ভারে নুয়ে পড়েছেন প্রায়। তা আশি নব্বই তো হবেই। চোখ দুটো ঘোলাটে, চামড়া টামড়া ঝুলে তলতল করছে গায়ের।

হ্যাটপরা একজন ভদ্রলোক ধরে ধরে নীচে নামালেন কোমর ভাঙা বৃদ্ধাকে। কপালে হাত আড়াল করে ঘোলাটে চোখেই একবার যেন অবস্থাটা ঠাহর করে নিতে চান তিনি। চোখ দুটো ফুলো ফুলো। হয়তো কেঁদেছেন খুব খবরটা পেয়ে।

লাঠি হাতে কুঁজো কুসুমকুমারী ঠুক ঠুক করে এবার নিজেই এসে দাঁড়ালেন পাগলার কাছে।

চোখ দুটোয় জল এসে যাচ্ছে বারবার। আঁচলে মুছলেন ভাল করে। তবু আবার ঝাপসা হয়ে যায়। হঠাৎ লাঠিটা ফেলে উবু হয়ে বুকের ওপর হাত বোলাতে বোলাতে ডুকরে কেঁদে উঠলেন, সুধা রে—তুই এ কী করলি— । কী করলি— ।

দেবদত্ত অনেক করে থামায় তাঁকে। বলল, আপনি চিনতে পারছেন দিদা? ইনিই সুধাকান্ত তো?

ন দিদা রোদ আড়াল করে তাকালেন, সুধা নয়? চোখে তো ভাল দেখি না বাবা, এত গোঁফদাড়ি ভরা মুখ! কিছু বুঝতে পারছি না ঠিক। তবে বুকে পোড়া দাগ আছে কিন্তু একটা। সেই এক ফোঁটা বাচ্চা তখন, লাথি মেরে গরম দুধের বাটি উল্টে দিয়েছিল—উঃ কী পোড়াটাই না পুড়ে গিয়েছিল, অনেকদিন ছিল সেই দগদগে দাগটা দেখো তো বাবা সেটা আছে নাকি বুকে, তা হলে ঠিক চিনতে পারব··

বুকের ওপর আবার হাত বোলাতে থাকেন বৃদ্ধা।

দেবদত্ত নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকে। দুধের বাচ্চার সেই দাগটা কঠিন লোমশ বুকের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেছে। এখন কে তাব সন্ধান দেবে!

—স্যার, কী সিদ্ধান্ত করব তা হলে আমরা?

—কোনও সিদ্ধান্ত নয়। শুধু সন্ধান আর সন্দেহ করব আমরা এখন। অন্যমনস্কেব মতো উত্তর দিল দেবদত্ত।

কিন্তু সে খেয়াল করে না। ঠিক সেই মুহূর্তেই দূর থেকে একজন শ্যেন-দৃষ্টিতে নজর রেখে চলেছে তাদের ওপর। কঠিন আর ক্রূর দুটো চোখ।

১৩

সকালবেলায় রাতুল আর দেবদত্ত মুখোমুখি বসে কথা বলছিল দত্তভিলার খুনের রহস্যটা নিয়ে। কীভাবে এবং কোন পথে এগোতে হবে এবার।

রাতুল ইতিমধ্যেই একটা ছক করে ফেলেছে তার ডায়েরির লেখাগুলো থেকে। সন্দেহজনক আর সম্ভাব্য অপরাধীদের একটা খসড়া মোটামুটি। সেটা নিয়েই আলোচনা চলছিল এখন।

বলল, দাদা, এক নম্বর কালপ্রিট হিসেবে আমি নকুল আচার্যের নামটাই প্রথমে রাখলাম।

—কেন?

—কারণ, আপাতদৃষ্টিতে তারই একটা মোটিভ পাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়া সে-ই চড়াও হয়েছে পোড়ো বাড়িতে এর আগে দু'দুবার—

দেবদত্ত গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ে, বেশ। তারপর?

—আর একটা পয়েন্ট, এই কাজের পেছনে কোনও শক্ত-পোক্ত লোকের হাত আছে

বলেই আমাদের ধারনা। সে দিক থেকেও নকুলবাবুর সম্ভাবনা জোরালো—ওঁর নামই তো ষণ্ডা নকুল, দত্তবাড়িতে!

—ভদ্রলোককে মুখোমুখি একবার. না দেখলে বোঝা যাচ্ছে না। ডেডবডি দেখতেও আসেননি একবার সেদিন, লক্ষ করেছ?

—সেটাই তো সন্দেহের কারণ আরও। তাঁর এই রকম একজন শত্রু খুন হয়ে গেল, অথচ মুখ বাড়িয়ে দেখলেন না একবারও।

—ঠিকই। অস্বীকার করছি না তোমার যুক্তিগুলো, রাতুল।

—তারপর দ্বিতীয় জনের নাম. অবশ্যই রাজেশ এ্যাণ্ড কোম্পানি। যে কোনও একজন বা দুজন—

—কিন্তু এদের মোটিভ? দেবদত্ত প্রশ্ন করে।

—মোটিভ পল্লবী দত্ত। তাকে পাওয়া বা না পাওয়া।

—তার মানে? দেবদত্ত হেসে ফেলে।

—খুব সহজ। আমাদের হিরোর চিঠির ভাষাটা একবার ভাবুন, কী রকম মরিয়া হয়ে উঠেছে সে তার হিরোইনের জন্যে। হন্যে হয়ে শেষে পাগলকেই ধরেছিল হয়তো, কিন্তু বাগে আনতে না পেরে লোকটাকে রেগেমেগে শেষে খুনই করে ফেলেছে।

—ঠিকই বলেছ রাতুল। একটা প্রকাণ্ড গাছ, বনস্পতির মতো দত্তভিলার মাথা ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রায়···চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি যেন এখনও···

রাতুল অবাক হয়ে বলে, গাছ!

—ইয়েস রাতুল, সেই কৃষ্ণচূড়া গাছটার কথা ভাবো। ওর আগায় উঠে দড়ি ঝুলিয়ে যদি দত্তভিলার ছাতে লাফিয়ে পড়ে কেউ? গভীর রাতে দুর্যোগের মধ্যে ওর মতো ডেসপারেট ছেলে দু'চারজন নেমে পড়লে আর কে ঠেকায়! আচমকা ঝড়ের মতো অ্যাকশান করে, নায়িকাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়াও অসম্ভব ছিল না —কী বলো?

—অবশ্যই! ঠিক বলেছেন দাদা! আর আমাদের পাগলা হয়তো সেই রকমই কিছু দেখে বাধা দিয়েছে। তার ফলেই একটা তুমুল ধস্তাধস্তি···এবং শেষ পর্যন্ত খুনই করে ফেলেছে ওরা লোকটাকে।

—ইয়েস। কিন্তু পাগল বাধা দেবে কেন, হোয়াই? নিজের মনেই যেন প্রশ্ন করে দেবদত্ত।

—দেবে, পাগল বলে। বুদ্ধিমান লোক হলে তো ঘাপটি মেরে দূরেই বসে থাকত। টুঁ শব্দটিও বার করত না মুখে।

দেবদত্ত হাসে রাতুলের কথা শুনে। কিন্তু মনের মধ্যে অন্য একটা চিন্তা ঘোরে তার। সম্ভব কি না সেটা, জানা যাচ্ছে না যদিও এখন।

রাতুল বলল, এবার পরের নামগুলো। এখানে কোনও মোটিভ পাওয়া যাচ্ছে না

তেমন। তবু যাদের পক্ষে কাজটা করা সম্ভব ছিল, তাদের একটা মোটামুটি তালিকা।

—বেশ বলো।

—প্রথমেই সরকারমশাই, অনেক রাত পর্যন্ত বাইরে ছিলেন সেই দুর্যোগের মধ্যে।

—ঠিকই। কিন্তু শারীরিক দিক দিয়ে তোমার সাসপেক্ট কি উপযুক্ত এ কাজের ?

—আপাতদৃষ্টিতে না। কিন্তু ওর হাবভাব আর চালচলন দেখলে বেশ ধুরন্ধর একটি এলিমেণ্ট বলেই মনে হয়। ওপর থেকে বোঝা যায় না কিন্তু তলে তলে অনেক কিছুই সম্ভব ওঁর দ্বারা। বিশেষ করে মালিক যখন বিরক্ত পাগলার ওপর, দিনের পর দিন জ্বালাচ্ছে দত্ত ফ্যামিলিকে—তখন অনুগত সরকার কাজটা করে ফেললেও ফেলতে পারেন।

—মোটিভটা স্ট্রং হচ্ছে না। তবু মানলাম, সম্ভবনার দিক থেকে—।

—দ্বিতীয়জন পরিক্ষিৎ দত্ত। তিনিও বাইরে ছিলেন সেদিন। ঝড়ের পর গাড়িতে মেয়ে এবং শৈলীদেবীকে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে ফিরেছেন প্রায় বারোটা নাগাদ। কোন্ বন্ধুবাড়িতে নাকি আটকে পড়েছিলেন, নিশ্চয় পানভোজনের আসরে। তারপর সেখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে এসে নেমেছেন ঠিক মধ্যরাতে। তখনও দুর্যোগটা চলছে, রাস্তাঘাট জনশূন্য, একবার ভেবে দেখুন, তাঁর সুযোগর কোনও অভাব ছিল না—

—বাঃ! চমৎকার সাজিয়েছ তোমার আর্গুমেণ্ট রাতুল! খুবই সম্ভব এটা, কিন্তু আবার সেই প্রশ্ন, ক্ষিতিবাবু কেন করতে যাবেন হঠাৎ এই কাজটা? ইচ্ছে করলে লোকজন দিয়ে পাগলাকে বাড়িছাড়াই তো করে দিতে পারতেন তিনি।

—দাদা, মোটিভটা পুরোপুরি জানি না আমরা। তবে মাঝেমধ্যেই ওঁরা বিরক্ত হয়ে পাগলাকে মেরে ফেলার কথা বলেছেন। এই তো দেখুন, সরকারমশাইয়ের জবানবন্দি, ক্ষিতিবাবু রেগে গিয়ে ভাইকে বলছেন—'পুরো, কিক্ দ্যাট বাস্টার্ড আউট।'

—সরকার অবশ্য ঠিক বলতে পারেননি, 'বাস্টার্ড'টা' কে ? নকুলবাবা না পাগল। তবে এটা ঠিক, লোকটার পাগলামি দু ভাইয়ের কেউই ভাল চোখে দেখেননি। দুজনেই বেশ বিরক্ত এবং হাড়ে হাড়ে চটা ছিলেন ওর ওপর……

—সেই একই মনোভাব তো নকুলবাবুর ওপরও ওঁদের। নকুলবাবুরও কি খুন হবার সম্ভাবনা আছে তাহলে ? রাগের মাথায় কেউ খুন করার একটা শাসানি দিলেই সেটাকে সিরিয়াসলি ধরা ঠিক নয়। তবে জাস্ট সম্ভাবনার দিক খেকে বা সুযোগের দিক থেকে তোমার কথাগুলো মানছি, ইয়েস রাতুল, তোমার যুক্তিতে ভুল নেই।

এবং সেই একই কারণে এটা পুরন্দর দত্তের পক্ষেও সম্ভব ছিল। তিনিও বেশ রাত করে ফিরেছেন। অবশ্য ক্ষিতিবাবুর প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে। তাই না? তবু মানলাম তোমার যুক্তি। তারপর ?

—না দাদা, আপাতত এই পর্যন্ত আমার লিস্ট। আর কারও নাম মাথায় আসছে না।

—কর্তা পন্নগভূষণকে বাইরে রাখছ তাহলে তোমার সন্দেহের ?

—কী বলছেন, ওঁকেও সন্দেহ করব ? সত্তরের মতো বয়েস, চোখে ঝাপসা দেখেন···তাছাড়া উনি তো বাড়িতেই ছিলেন। এই রকম একজন বৃদ্ধের পক্ষে···

—উপায় নেই রাতুল। তুমি পন্নগ মানে জান ?

—না তো। মানেটা কী ?

—পায়ের দ্বারা গমন করেন না যিনি। অর্থাৎ সাপ। তুমি সরকারমশাইয়ের কথা বলছিলে না, ওপরে দেখে কিছুই বোঝা যায় না, অথচ তলে তলে সব করতে পারে লোকটা। পন্নগবাবুও সেই একই ধরনের এলিমেণ্ট। মনিব-ভৃত্যের খুবই মাখা-মাখি সম্পর্ক এদিক থেকে। তুমি পন্নগবাবুর চোখের দিকে লক্ষ করেছ ? লেন্সের আড়াল থেকে যেন সাপের মতোই একটা ক্রূর দৃষ্টি ফুটে ওঠে মাঝে মাঝে। ভদ্রলোক সার্থকনামা।

—কিন্তু ওঁর মতো বয়েসের কেউ এই রকম একটা ধকল সহ্য করবে কী করে ? শুধু তো ধস্তাধস্তি নয়। খুন করে লাশটাকে টেনে তুলতেও হয়েছে ওপরে।

—ভেবে নাও না, সঙ্গে কেউ ছিল আর একজন। তাহলে ?

রাতুল চুপ হয়ে যায় এবার। মুখে কথা সরে না যেন। এমন একটা সম্ভাবনার কথা তার মাথায়ই আসেনি। অথচ অসম্ভব নয় সত্যিই। কিন্তু মেলাতে পারে না মন থেকে। সৌম্যদর্শন, অভিজাত, বৃদ্ধ পন্নগভূষণকে এই ভূমিকায় মেলাতে পারে না সে।

—কী রাতুল ? খুব একটা ধাক্কা লাগল কি মনে ?

—না দাদা, ভাবছি হয়তো আপনার কথাই ঠিক।

—হয়তো বা নয়। দেবদত্ত হাসল. কিন্তু সন্দেহ রাখতেই হবে। এটা ছাড়া ইনভেস্টিগেশান চলে না। প্রথমে সন্দেহ তারপর অনুসন্ধান।

—তাহলে কি সুখেন্দুদাকেও ঢোকাতে হবে লিস্টে ?

—না না, আমি জানি, তুমি নিশ্চয়ই চাও না সেটা। তাছাড়া ওই পাগল লোকটাকে তিনি পছন্দ করতেন। তোমার ডায়েরি খুঁজলে তাঁর এরকম দু একটা মন্তব্য পেয়েও যেতে পার। পল্লবী আর জুঁইয়ের পরে, আর এই একটা লোকেরই পাগলার ওপর কিছুটা দুর্বলতা ছিল। ডেডবডিটা দেখতে দেখতে তাঁর রি-অ্যাকশানের মধ্যেও সেটা ফুটে উঠছিল। হয়তো তুমিও লক্ষ করেছ।

—হ্যাঁ ঠিকই। খুবই করুণ দেখাচ্ছিল মুখটা।

—তবে ? সুখেন্দুদা তোমার জটিল চরিত্রের মানুষ একজন, কিন্তু খুনি কখনোই নয়, বরং······

বলতে বলতে হঠাৎ কিছু একটা চিন্তা করে দেবদত্ত। পরে বলল, ভদ্রলোককে একবার টেলিফোন করো তো।

—সুখেন্দুবাবুকে ? কী বলব ?

—কাল জবানবন্দি নিতে যাব তোমার সাসপেক্টদের। একটা অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট চাই তার জন্যে।

রাতুল একবার ঘড়ি দেখে বলল, সেটা তো এখনই হতে পারে দাদা, নয় ? দেরি না করে ইণ্টারোগেশানটা যত তাড়াতাড়ি করা যায় ততই তো ভাল···

—ও ইয়েস। কিন্তু আমার লিস্টটা যে একটু অন্যরকম ! প্রথম টার্গেট হলেন মিসেস নকুল আচার্য ! অর্থাৎ ছুটকি দেবী। তাঁকে দিয়েই আরম্ভ করতে চাই আমি। এবং পরে অবশ্যই পল্লবী দত্ত। এখন একটা আগাম খবর না দিয়ে হুট করে কি এঁদের কাছে যাওয়া উচিত হবে ?

—আশ্চর্য ! আপনার লিস্টে এঁদেরও নাম আছে ?

—এছাড়াও দু একজন আছে, দরকার পড়লে তাদের সঙ্গেও কথা বলতে হবে। মৃদু হাসি দেবদত্তের মুখে।

রাতুল অবাক হয়ে দেখে তার দিকে। তারপর উঠে গিয়ে আস্তে আস্তে টেলিফোনের ডায়লটা ঘোরায়।

পরদিন সকালবেলায় নকুলবাবুর বাড়িতে রীতিমতো সোরগোল পড়ে গেল একটা। সবারই চোখে ভয়, উদ্বেগ আর আতঙ্ক। না জানি কী ঘটে যায় আবার। পাগলের খুনের খবরটা ইতিমধ্যেই চাউর হয়ে গেছে সবার কাছে। ডিটেকটিভ দেবদত্ত চ্যাটার্জি এসে পড়েছেন তারই সূত্র ধরে। এবং প্রথমেই নকুলবাবুর কাছে। দত্তভিলার ওপরের জানলাগুলো পট পট খুলে যাচ্ছে। উঁকিঝুঁকি মারছে ছায়া ছায়া অনেকগুলো মুখ।

আর স্বয়ং নকুলবাবু প্রায় পাগলের মতো আচরণ করছেন। একবার উঠছেন, একবার বসছেন।

দেবদত্ত যতই বোঝাতে চেষ্টা করে, কেন বুঝছেন না মশাই আপনি, এটা সে রকম সাংঘাতিক কোনও ব্যাপার নয়, রুটিন এনকোয়ারি একটা। আপনার মিসেসকে আলাদা, জাস্ট দু'একটা প্রশ্ন করব। আসলে উনিই তো লোকটাকে দেখেছিলেন খুব কাছে থেকে, কথাও হয়েছিল দু-একটা। তারই একটু খোঁজখবর—

কিন্তু নাছোড়বান্দা নকুলবাবু সে সব কিছুই কানে তোলেন না। তাঁর মুখে সেই এক কথা, বিশ্বাস করুন স্যার, আমি এই পৈতে ছুঁয়ে বলছি, আমরা কেউ কিছু জানি না এ ব্যাপারে, আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন, কোনও ঝামেলার মধ্যে কখনও থাকে না নকুল আচার্যি—হ্যাঁ, রাগের মাথায় একদিন গিয়েছিলাম অবশ্য

তেড়ে, কিন্তু সে তো পাগলাকে একটু ভয় দেখাতে, অন্য কোনও মতলব ছিল না আমার, বিশ্বাস করুন আপনি—

বলতে বলতে হঠাৎ ভেউ ভেউ করে কাঁদতে শুরু করেন নকুলবাবু। অস্বস্তি লাগে দেবদত্তর। তাগড়া চেহারার একজন বয়স্ক ভদ্রলোকের হঠাৎ এরকম মেয়েদের মতো কান্নাকাটি। রীতিমতো ডিসগাস্টিং। আড় চোখে একবার রাতুলের দিকে তাকায়। অভিনয় করছেন না তো? ধরা যাচ্ছে না ঠিক। রাতুলের চোখেও সেইরকম ইঙ্গিত।

একটুক্ষণ দেখে অবশেষে গলা চড়াতে বাধ্য হয় দেবদত্ত, প্লিজ, আর নয়। চুপ করুন এবার, আপনার কথা পরে হবে। আগে আপনার মিসেসকে আসতে দিন এখানে—

ছুটকি এল একটু পরেই। চোখে কাজল টেনে এসেছে, চুল বিনুনি করা। ছিপছিপে চটকদার চেহারার অল্পবয়সী মেয়ে। জুলজুলে দৃষ্টিতে ভয়ের চেয়ে কৌতূহলটাই যেন বেশি। অন্তত নকুলবাবুর তুলনায় অনেক ডাকাবুকো।

রাতুলের দিকেই তাকায় আগে। চোখটা প্রায় নাচিয়ে বলল, বলুন কী জানতে চান?

—তেমন কিছুই নয়, সামান্য দু-একটা কথা। দেবদত্ত মৃদু হাসল।

—সে কথাটা কী?

—শুনেছি, আপনি একদিন পোড়ো বাড়ির জঙ্গলে চলে গিয়েছিলেন একা একা, পাগলাকে দেখতে, সত্যি?

—হ্যাঁ। কিন্তু পাগলাকে দেখতে যাইনি, দেখা হয়ে গিয়েছিল।

—ও। সাহস আছে আপনার বলতে হবে। রিয়েলি—

ছুটকি দেবদত্তর চোখে চোখ রাখে। কী বলবে ঠিক করতে পারে না।

—আচ্ছা মিসেস আচার্য, আপনার মনে আছে, লোকটাকে কী অবস্থায় দেখেছিলেন?

—হ্যাঁ। গালে হাত দিয়ে সিঁড়িতে বসে চুপচাপ একটা পাখির দিকে দেখছিল। আমায় বলেও ছিল পাখিটার নাম, মনে হচ্ছে—সোনা বউ।

—আই সি। থ্যাঙ্ক য়ু ভেরি মাচ। একটু চেহারার বর্ণনা দেবেন কি, কেমন দেখাচ্ছিল লোকটাকে তখন, মানে কী মনে হল আপনার—

—দেখতে? একটু ভাবে যেন ছুটকি। সহসা বিষণ্ণ দেখায় দৃষ্টিটা। বলল, অদ্ভূত ধরনের একটা লোক। লম্বা চওড়া চেহারা, মুখ ভরা দাড়ি গোঁফ, লালচে টকটকে চোখ, কিন্তু কেমন যেন অন্যমনস্ক, পায়ের কাছে মুখ বাঁধা প্রকাণ্ড একটা ঝোলা, বেতের লাঠি, নীচে জঙ্গলের মধ্যে আমি, কোনও দিকেই কোনও খেয়াল নেই—

—ঝোলা? রাতুলের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে দেবদত্ত।

—হ্যাঁ। মস্ত বড় একটা ঝোলা। বোধ হয় ওর সংসারটাই ছিল ওর মধ্যে।

—আপনার ভয় করেনি একটুও ?

—প্রথমে করেছিল। তারপর আর নয়। পরে মনে হচ্ছিল এ যেন পাগলা নয়, খুব একজন দুঃখী লোক কেউ, মাঝে মাঝে মাথা নাড়ছিল একটা চাপা কষ্টে। বোধহয় অসুস্থই ছিল—বলতে বলতে নিশ্বাস চাপে ছুটকি।

তারপর আপনা থেকেই আবার সব কথা বলে যায় সেদিনের। কী রকম রেগে উঠে বলেছিল, বউ, পালাও তুমি এখান থেকে। তোমাকে মারবে। সেই লোকটাই আবার সাহস দিয়ে কীভাবে হাত বাড়িয়েছিল, উঠে এসো, আমার হাত ধরে উঠে এসো

বলতে বলতে যেন আবেগ এসে যায় ছুটকির।

রাতুল মাথা নিচু করে তরতর করে নোট নেয় ডায়েরিতে। কোনও কথাই বাদ দেয় না।

ছুটকির পর আবার নকুলবাবু। কাঁদো কাঁদো মুখে এসে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক। অথচ চোখদুটো যেন নেশাখোরের মতো ঢুলুঢুলু। বুঝে ওঠাই মুশকিল আসলে কী ধরনের চিজ।

দেবদত্ত বলল, আপনি এ বাড়িতে কতদিন আছেন নকুলবাবু ?

—তা প্রায় দশ বছর।

—আর পাগলা ?

—আজ্ঞে ? তা বছর দুয়েক মনে হয়, ঠিক খেয়াল করিনি।

—ওর নামটা জানেন আপনি ?

—বুধু পাগলা।

—কী করে জানলেন ?

—নিজেই বলত নিজেকে, বুধু, তুমি একটা আস্ত বুদ্ধু, কোনও আক্কেল হল না —বুধু, তুমি করছ গো—

—আপনি কদিন ওর ঘরে ঢুকেছেন ? ঠিক জবাব দিন—

—না স্যার, ঘরে নয়। মাত্র সিঁড়ি পর্যন্ত, দুদিন—না না, একদিন স্যার—একদিন। তারপরই ছুটে পালিয়ে এসেছি অদ্ভুত দুটো চেহারা দেখে ধুপ করে লাফিয়ে পড়েছিল ঘরের ভেতর···

—ঠিক করে বলুন নকুলবাবু, মিথ্যে বললে বিপদ আছে, একদিন না দুদিন ?

—একদিন স্যার। আর একদিন গিয়েও ফিরে এসেছি। বাগানে আর একজন পেটি মেরে দাঁড়িয়েছিল তখন। দেখে পালিয়ে এসেছি।

দেবদত্ত চমকায়, আর একজন! কে সে, আপনি চিনতে পেরেছিলেন ?

—না স্যার, গাছের সঙ্গে মিশে অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল, বেঁটেখাটো একটা লোক···আমি দেখেই···

—সরকারমশাই কি, লোকটা ? রাতুল দুম করে পাশ থেকে প্রশ্ন করে।

—হতেও পারে। কিন্তু আমি জানি না স্যার, অন্ধকার ছিল ভীষণ···

দেবদত্ত আর রাতুলের মধ্যে চকিতে দৃষ্টি বিনিময় হয় আর একবার। নকুলবাবু তেমনি গোবেচারা মুখ করে আছেন। ঢুলঢুলু চোখে জল। সন্দেহ নেই, লোকটা গভীর জলের মাছ।

পল্লবীর সঙ্গে আলাদা কথা বলাটা অবশ্য খুব সহজে সম্ভব হয় না। পরিক্ষিৎবাবু নিমরাজি হলেও কর্তামশাই স্রেফ ঘাড় নাড়লেন, না না, এর মধ্যে আর বাড়ির মেয়েদের টানবেন না আপনারা। যা বলতে হয় আমাকেই বলুন।

শেষমেশ অবশ্য সুখেন্দুই ব্যাপারটা মাঝখানে থেকে ম্যানেজ করে দিলেন। তিনিই সঙ্গে করে অফিস ঘরের মধ্যে নিয়ে এলেন লাবিকে। পরে দরজাটা বন্ধ করে পাশে এসে বসলেন।

খানিকক্ষণ নিঃশব্দেই কাটে। পল্লবী চোখ নামিয়ে আছে মাটির দিকে। দেবদত্ত আর রাতুল দুজনেই এই প্রথম দেখছে সেই সুন্দরী নায়িকাকে। যে দত্তবাড়ির সব নাটকের মূলে।

দেবদত্ত বলল, আপনাকে এই অবস্থার মধ্যে একটু বিরক্ত করছি বলে আমি খুবই দুঃখিত মিস্ দত্ত ; কিন্তু আমার উপায় নেই, এমন একটা কাণ্ড ঘটে গেল হঠাৎ···

পল্লবী চোখ তুলে তাকাল। সেই গভীর আয়ত দৃষ্টি, যে কোনও পুরুষের বুকে যা কাঁপন ধরায়। কিন্তু এখন সেখানে এক অদ্ভুত আতঙ্কের ছায়া। কথা বলতেই যেন ভয় পাচ্ছে।

—আচ্ছা ওই বুধু পাগলার সঙ্গে তো, আপনার মাঝে মধ্যেই কথা হত ?

—হ্যাঁ। পল্লবী মাথা নাড়ে।

—আপনি খুব পছন্দ করতেন ওকে ? লোকটাও খুশি হত আপনার গলা পেলে ? তাই না ?

পল্লবী অবাক হয়ে তাকাল দেবদত্তর দিকে। চোখ দুটো চিকচিক করে সহসা, ঠোঁটটা কাঁপে। বলল, জানি না, আমি জানি না—

—আচ্ছা আমি শুনেছি, ও ভীষণ চেঁচামেচি আর পাগলামি করত যখন, হঠাৎ আপনি কিছু বললে চুপ হয়ে যেত একেবারে, এর কারণটা কী ? একটু বলবেন ?

পল্লবী গভীর নিশ্বাস ফেলল। অসহায়ের মতো মাথা নাড়ল তারপর, আমি কিছুই জানি না—

দেবদত্ত একটু ভাবে, তবে কি ভেতর থেকে কেউ শিখিয়ে দিয়েছে পল্লবীকে ? যে

সব কথার উত্তরে শুধু বলবে, আমি জানি না, জানি না। কেমন যেন সন্দেহই হতে থাকে তার।

—আচ্ছা, ঠিক আছে, অন্য দিক থেকে এগোতে চেষ্টা করে দেবদত্ত, আমি সুখেন্দুবাবুর কাছে শুনেছি, খুন হবার রাত্রে, সেই প্রচণ্ড ঝড়বাদলের মধ্যেও পাগলা গান গেয়ে উঠছিল মাঝে মাঝে, কথাও কইছিল নাটকের ভাষায়, আপনি কি শুনেছিলেন কিছু?

—হ্যাঁ শুনেছিলাম। অনেক রাত পর্যন্ত শুনেছিলাম—

—আমাদের একটু ডিটেলে বলুন না প্লিজ, সব। আপনি যা যা শুনেছেন। ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে জানতে।

পল্লবী কোনও উত্তর দেয় না। মাথা নিচু করে বসে থাকে তেমনি। মনে মনে ভেবে নিচ্ছে হয়তো।

দেবদত্ত আবার বলে, প্লিজ পল্লবী—

পল্লবী চেখে তুলে তাকাল অবাক দৃষ্টিতে। তারপর কাঁপা কাঁপা গলায় সব কথা বর্ণনা করে যায়। সঙ্কোচটা যেন কেটে যাচ্ছে একটু একটু করে। তার গানের লাইনগুলো বলে, নাটকের সংলাপ, হা-হা অট্টহাসি, সেই প্রচণ্ড হুঙ্কার ; কে? কে রে তুই দুরাত্মা পামর? এবং সব শেষে সেই বিকট আতঙ্ক জড়ানো, আঁ-আঁ চিৎকার। প্রচন্ড বাজ পড়ার শব্দ, ঝম ঝম বৃষ্টির ধারা···

তারপরই হঠাৎ চুপ করে যায় পল্লবী। গা ছমছমে একটা পরিবেশ ঘরের মধ্যে। দেবদত্ত নিস্তব্ধ হয়ে ভাবে, চন্দ্রগুপ্ত নাটকের দ্বিজেন্দ্রগীতিটা আয় চলে আয়—বলে কী অদ্ভুতভাবে পাগলাকে মহাসিন্ধু ওপারেই ডেকে নিয়ে গেল। এর সঙ্গে কি জীবনের কোনও গূঢ় যোগসূত্র জড়িয়ে আছে ওর। কে জানে।

নিস্তব্ধতা ভেঙে গেল হঠাৎ। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। আস্তে আস্তে কে উঠে এসে দাঁড়াল দরজার সামনে। চমকে ফিরে তাকাল সবাই। আর কোনও সাড়া নেই। একেবারে চুপচাপ। বাইরে কান পেতে আছে কি কেউ।

দেবদত্ত উঠে পড়ল। চটপট গিয়ে দরজাটা হাট করে খুলে দিল। খুলেই অবাক, এ কি আপনি এখানে দাঁড়িয়ে।

সুখেন্দুও সবিস্ময়ে কথাটা বলে ওঠেন একসঙ্গে।

১৪

দরজার সামনেই সরকারমশাই। একেবারে স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে। সুখেন্দু আবার বললেন, এ কী, আপনি!

কোনও উত্তর নেই। ভীত দৃষ্টিতে ফ্যালফ্যাল করে দেখছেন।

ভীষণই অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছেন যেন ভদ্রলোক। আচমকা দরজা খুলে হঠাৎ তাঁকে এমনি দেখবে সবাই, ভাবতেও পারেননি। বিবর্ণ দেখায় তাঁর মুখটা। কিছু একটা বলতে গিয়েও পারছেন না।

—আজ্ঞে, আমাকে, আ-আ—

বাকিটা আর স্পষ্ট হয় না। নার্ভাস হয়ে কাঁপেন থরথর করে।

রাতুল আপাদমস্তক লক্ষ করে তাঁকে। রীতিমত সন্দেহজনক ব্যাপার! লোকটা কি কারও চর? আড়ি পেতে কথা শোনার চেষ্টা করছিল কি তাদের? তাছাড়া আর কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে।

দেবদত্তর মনে হয়, এই লোকটাকেই এখন দরকার। দত্তভিলার হাঁড়ির মুখের সরাটি হয়ে বসে আছেন সরকারমশাই। পেট বোঝাই হয়ে আছে হাজার রকম গোপন খবরে। একবার ঠিকমতো ঘা মারতে পারলে অনেক কথা বেরোবে।

কিন্তু লোকটা বড় হুঁশিয়ার। সাক্ষাৎ বিনয়ের অবতার সেজে মুখে কুলুপ এঁটে আছে।

একগাল হেসে বিগলিত হয়ে বলল, আরে, কী আশ্চর্য সরকারমশাই! কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন? একবার বলবেন তো, আপনি।

সরকার কাঁপতে কাঁপতেই উত্তর দিলেন, স্যার পুলিশ! কর্তাবাবু খবর দিতে বললেন আ-আমাকে। মানে—

—পুলিশ? কোথায় পুলিশ এল আবার? দেবদত্ত বুঝেও অবাক হয়।

—আজ্ঞে থানা থেকে সেই অফিসারটি এসেছেন আবার। আ-আপনার কথা শুনে বসে আছেন...কর্তাবাবু খবরটা দিতে বললেন তাই—

—তাতেই আপনার এত ভয়? মহীতোষবাবু এসেছেন এনকোয়ারি করতে, তাতে আপনার চিন্তা কী? আপনি একজন নিরীহ নিরপরাধ মানুষ!

সুখেন্দু বললেন, তা আমাদের না ডেকে, দরজার সামনে এইরকম চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন কেন? ব্যাপারটা কি ভাল!

—আজ্ঞে হুজুর, একটু বাধো-বাধো ঠেকছিল দরজায় টোকা দিতে, আপনারা সব গোপনীয় বিষয় নিয়ে আলোচনায় বসেছেন—

—না না, দেবদত্ত মাথা নাড়ল, তাই বলে আপনি ডাকবেন না কেন ? আপনার কাছে তো আর গোপন কিছু নেই—

—আজ্ঞে ? সরকার কেমন সন্দেহের চোখে দেখেন দেবদত্তর দিকে।

দেবদত্ত হাসল, আপনি ছাড়া দত্তবাড়ি যে অন্ধকার! যাক। নীচে গিয়ে বলুন আমরা এখনই আসছি, যান—।

দরজাটা আবার মুখের ওপর বন্ধ হয়ে যায় তাঁর।

নীচে বৈঠকখানা ঘরে ওদিকে মহীতোষবাবু স্টেটমেণ্ট নিতে শুরু করে দিয়েছেন।

অপ্রসন্ন মুখে সামনাসামনি বসে পুরন্দর দত্ত, রাজেশ অ্যাণ্ড কোম্পানির প্রথম টার্গেট হয়েছিলেন যিনি। এ যাত্রা তিনি রেহাই পেয়েছেন অন্তত। তাঁকেই ইণ্টারোগেট করা হচ্ছে খুব জোর এখন।

ভদ্রলোকের চেহারা দেখে মনে হয়, পুরোপুরি সুস্থ নন। চোখ দুটো লাল। জ্বর গায়েই একটা চাদর জড়িয়ে নেমে এসেছেন হয়তো, পুলিশের তলব পেয়ে। বেশ বিরক্ত মুখেই উত্তর দিচ্ছেন মহীতোষবাবুর প্রশ্নের। কথা বলতে বলতে মাথাটাও টিপে ধরছেন এক একবার।

আর দরজার বাইরে সরকারমশাই যেন পাহারায় দাঁড়িয়ে।

দেবদত্ত আসতেই উঠে দাঁড়ালেন মহীতোষবাবু, আসুন স্যার, আসুন। আমি ইণ্টারোগেশানটা সেরেই ফেলছি চটপট। আপনারও যদি থাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার করে নিতে পারেন—

—অবশ্যই। কিন্তু মিঃ দত্তর শরীরের যে হাল দেখছি, তাতে এই অবস্থায় ওঁকে আর কষ্ট দিতে ইচ্ছে করছে না। কী বলেন আপনি ?

পুরন্দর মাথা নাড়লেন, না না, কোনও অসুবিধে নেই, আমার। সামান্য ইনফ্লুয়েঞ্জা মতো হয়েছে, মাথাটা একটু টিপ টিপ করছে। আপনিও বলুন না, কী জানতে চান।

কিন্তু তার আগেই চা এসে গেল ঘরে। শ্রীমন্ত একটা লোক সঙ্গে নিয়ে চায়ের পট আর জলখাবারের প্লেট সাজিয়ে দিয়ে গেল পর পর। পুরোবাবুর জন্যে আলাদা এক মগ কফি।

দেবদত্ত বলল, বাঃ চমৎকার। থ্যাঙ্ক য়ু মিঃ দত্ত। আসুন সবার আগে বরং এই কাজটাই সেরে ফেলা যাক।

পুরন্দর মৃদু হাসলেন বলার ভঙ্গিটা দেখে দেবত্তর।

মহীতোষবাবু খাবারের প্লেটটা টেনে নিয়ে চটপট দুটো মিষ্টি মুখে ফেলে তারপর এক গ্লাশ জল খেয়ে বললেন, সুন্দর! হ্যাঁ, ডেডবডির রিপোর্টটা পেয়ে গেছি স্যার।

দেবদত্ত তার লাল চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, পেয়ে গেছেন। কী বলছে ?

—ঠিকই ছিল আমাদের অনুমান, ডেথ বাই স্ট্র্যাংগুলেশান। শ্বাস রোধ করেই মারা হয়েছে লোকটাকে। আর সময়টা হল, আপনার দশটা থেকে বারোটা সাড়ে বারোটার মধ্যেই।

দেবদত্ত মনে মনে ভাবল সময়টা। তারপর বলল, অর্থাৎ সেই ঝড়বৃষ্টির দাপটটা চলছে যখন—

—ঠিক তাই। সেই সুযোগটাই নিয়েছে কালপ্রিট। এই সময়ের মধ্যে যারা ঢুকেছে বাড়িতে, তাদেরই জবানবন্দিটা নিচ্ছি আগে। সবার প্রথমে সরকারমশাই, তারপর পুরন্দরবাবু, সবশেষে পরিক্ষিৎবাবু। আপনি কী বলেন, স্যার ?

—নিশ্চয়ই ! তাই তো করা উচিত।

—সরকারমশাইয়েরটা অবশ্য নোট করা হয়ে গেছে। উনি তো বেশ সতর্ক লোক, ডেডবডিটা প্রথম দেখেছিলেন। কিন্তু বলছেন, তখন নাকি কিছুই বুঝতে পারেননি। কোনও শব্দটব্দও পাননি।

দেবদত্ত সরকারের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়ল, খুবই স্বাভাবিক। ঘোর দুর্যোগের রাত, তার মধ্যে বাড়ি ফেরার তাড়া। তখন কি আর খেয়াল থাকে কারও !

—সরকারমশাইয়ের পর পুরন্দরবাবুর বক্তব্যটা শুনছি। নকুলবাবুর খবরটা এখনও পাইনি। শুনলাম আপনি স্টেটমেণ্ট নিয়ে এসেছেন একটা এর মধ্যে ? কী বলেন তিনি, নতুন কিছু ?

—নাহ্। দেবদত্ত মাথা নাড়ল, পৈতে ছুঁয়ে বার বার দিব্যি গেলে বলছেন, তিনি এর বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানেন না। কল্পনাই করতে পারেননি এমন একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড !

পুরন্দরের চোখ দুটো হঠাৎ জ্বলে উঠল যেন, কথাটা কি আপনি বিশ্বাস করলেন, মিঃ চ্যাটার্জি ?

দেবদত্ত মাথা নাড়ল, না, মিঃ দত্ত। বিশ্বাস অবিশ্বাস কোনওটাই এখনও করিনি। আমার কাছে এগুলো শুধু এক-একজনের বক্তব্য। পরে সব পাশাপাশি মিলিয়ে বিচার করে একটা সিদ্ধান্তে আসতে চেষ্টা করব, আর কি।

—অ্যাঁ ! আসল কথাটা বলেছেন স্যার ! আগে শুধু তথ্যগুলো জোগাড় করে যাওয়া—তারপর হল ডিডাকশান। আমিও সেই পথেই এগোচ্ছি। এসেই আগে একদফা পন্নগবাবুর সঙ্গে কথা বলে তাঁর বক্তব্যটা জেনে নিয়েছি, তারপর ধরেছি সরকারমশাইকে। এখন পুরন্দরবাবুর সঙ্গেও হয়ে গেল, বাকি পরিক্ষিৎবাবু।

—সাংঘাতিক কাণ্ড ! আপনি তো দেখছি ঝড়ের বেগে এগোচ্ছেন !

—এক ঝড়ের রাতের আততায়ীর খোঁজে। রাতুল যোগ করল।

মহীতোষবাবু হাসলেন, যা বলেন আপনারা ! আমাদের কাজ কি একটা ?

তারপর চারদিক থেকে প্রেসার নানারকম। এই তো এখান থেকেই ওয়ারেণ্ট নিয়ে আবার অ্যারেস্ট করতে যেতে হবে একজন পলিটিক্যাল লিডারকে—বহুত ঝামেলার কাজ । যাকগে, তাহলে পরিক্ষিৎবাবুকেই ডাকি এবার, না কি ?

—পুরন্দরবাবুকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না ?

—না, আমার জানা হয়ে গেছে, যা জানার। আপনি যদি জিজ্ঞাসা করতে চান কিছু, করে নিন।

—হ্যাঁ, দেবদত্ত বলল পুরোবাবুকে, সামান্য একটা দুটো প্রশ্ন মিঃ দত্ত। বেশিক্ষণ আর আটকাব না আপনাকে।

—নিশ্চয়ই। বলুন না !

—প্রথম কথা, আপনি ঠিক কটায় বাড়ি ফিরেছিলেন সেদিন ?

—ধরুন এগারোটা নাগাদ।

—না, একজ্যাক্ট টাইমটা চাইছি। ঘড়ি দেখেছিলেন কি তখন আপনি ?

—আজ্ঞে না। একটু আগে পরে হতেই পারে।

—এত দেরি হল আপনার ফিরতে ?

—একটা আড্ডায় জমে গিয়েছিলাম, তারপর হঠাৎ তুমুল ঝড়বৃষ্টি। থামার কোনও লক্ষণ নেই দেখে শেষে সাড়ে দশটা নাগাদ একটা' ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

—জায়গাটা কদ্দুর এখান থেকে ?

—সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউ।

—ও। বাড়ির আশেপাশে রাস্তায় কোনও লোক দেখেননি তখন ?

—না, মিঃ চ্যাটার্জি। তখন আর লোক কোথায় ! যা দুর্যোগের রাত, যে যার বাড়িতে ঢুকে পড়েছে সকাল সকাল।

—অবশ্যই। কিন্তু আপনি যখন এসে পৌঁছুলেন, পোড়ো বাড়ির দিক থেকে কোনও সাড়াশব্দ আপনার কানে যায়নি ? কোনও গান, বা অন্য কোনও রকম স্বর—

—হ্যাঁ। পুরন্দর মাথাটা টিপে মনে করতে চেষ্টা করেন মুহূর্তটা, হ্যাঁ, হ্যাঁ, একবার যেন চিৎকার করে কী একটা বলে উঠেছিল সে, ঠিক বুঝতে পারিনি। ঝোড়ো হাওয়ার শব্দে চাপা পড়ে গিয়েছিল, তাছাড়া, খুব একটা মনোযোগও ছিল না আমার সেদিকে তখন।

—খুব স্বাভাবিক। আচ্ছা বাড়িতে ঢুকে সরকারমশাইকে দেখেছিলেন কি আপনি ?

—না। শ্রীমন্ত দরজা খুলে দিয়েছিল। তারপরই ঘরে গিয়ে জামাকাপড় ছেড়ে, চান করে শুয়ে পড়লাম।

—খাওয়া দাওয়া করলেন না ? শুধু চান ?

—না, খাওয়াটা বন্ধুর বাড়িতেই সেরে এসেছিলাম। আর শোয়ার আগে চান আমার অভ্যেস।

—ওকে ; থ্যাঙ্ক য়ু মিঃ দত্ত। আর ডিস্টার্ব করব না আপনাকে। আপনি বিশ্রাম করুন এবার।

পুরন্দরবাবু চলে গেলেন ওপরে।

ক্ষিতিবাবুকে জেরা করা নিয়েই মনে মনে একটা সংকোচ ছিল দেবদত্তর।

বলতে গেলে এই পরিবারের সবচেয়ে রাশভারী আর মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিটিই হলেন পরিক্ষিৎ দত্ত। চলাফেরা, ওঠাবসা যাঁদের সঙ্গে তাঁরাও সব উঁচু ঘরনার লোক। এবং তিনি নিজেও তাঁর পারিবারিক আভিজাত্য বিষয়ে সদা সচেতন। কথাবার্তা বা আচরণের মধ্যেও সেটা ফুটে ওঠে।

তাছাড়া মাত্র কয়েকদিন আগেই তাঁর পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশার সুযোগ হয়েছে। নিজেই ডেকে নিয়ে বসিয়েছেন তাঁর অন্দরমহলে। সেখানে কাটানো সেই উপভোগ্য একটি সন্ধ্যা। একসঙ্গে বসে গল্পগুজব, খাওয়াদাওয়া আর হাসিঠাট্টা সবার সঙ্গে।

সেই সবকিছু মিলেই মনে মনে একটা সংকোচ।

কিন্তু আজ ক্ষিতিবাবুর চেহারাটা দেখে যেন সম্পূর্ণ অন্যরকম লাগে। এ কী! মাত্র দুদিনের মধ্যেই কী ভীষণ বদলে গেছেন ভদ্রলোক! চোখমুখের সেই তেজি ভাবটা একেবারেই নেই। তার বদলে একটা মুষড়ে পড়া আর মিইয়ে যাওয়া ভঙ্গি। শরীরটাও সুস্থ বলে মনে হয় না। কেমন শুকনো শুকনো ভাব। চোখের কোণে কালি। রাত্তিরে ঠিকমতো ঘুমুতে পারছেন বলেও তো মনে হয় না!

ব্যাপারটা একটু অদ্ভুতই লাগে দেবদত্তর!

মুখোমুখি চেয়ারে বসে শুকনো মুখে একটু হাসবার চেষ্টা করলেন ক্ষিতিবাবু। বললেন, গুডমর্নিং এভরিবডি।

—গুডমর্নিং মিঃ দত্ত, দেবদত্ত মাথা ঝাঁকাল সামনে, আয়াম অফুলি সরি টু ডিসটার্ব য়ু ইন দিস কানেকশান।

—নো নো, ইটস অল রাইট! প্লিজ ক্যারি অন—খুব সংযতভাবেই যেন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করেন পরিক্ষিৎ। একটা সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেটটা বাড়িয়ে ধরেন সামনের দিকে।

—এটা কিন্তু নেহাত ফর্মালিটি একটা—যাকে বলে পেশাগত কর্তব্য আমাদের। হয়তো এর জন্যে দু একটা ব্যক্তিগত প্রশ্নও এসে যেতে পারে, আশা করি তার জন্যে আপনি কিছু মনে করবেন না।

প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট টেনে নিতে নিতে বলল দেবদত্ত।

মহীতোষ বললেন, তদন্তের প্রয়োজনে আমাদের অনেক সময় ইচ্ছের বিরুদ্ধেও যেতে হয়। এমনি কাজ আমাদের।

পরিক্ষিৎবাবু চোখ দুটো বড় করে দেখলেন একবার পুলিশ অফিসারটিকে। তারপর বললেন, ঠিক আছে।

দেবদত্ত বলল, আচ্ছা, ওই পাগল লোকটার কথা বা গান আপনি কখনও শুনেছেন খেয়াল করে?

—অনেকবার শুনেছি।

—একটু বলবেন আমাদের দু-একটা।

পরিক্ষিৎ ভাবলেন যেন একটু। পরে বললেন, সবই অসংলগ্ন আর উল্টোপাল্টা কথা। গানগুলোও এলোমেলো, বলার মতো কিছু মনে পড়ছে না। অবশ্য আমি তেমন খেয়াল করে কখনও শুনিওনি।

—কিন্তু আপনার ঘর থেকেই সবচেয়ে ভাল শোনা যেত পাগলার গলা। দু একটা ছোটখাট জিনিস নিশ্চয়ই মনে পড়া উচিত।

—অল রাবিশ! হঠাৎ যেন বিরক্ত হয়ে উঠলেন পরিক্ষিৎ। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, নাটক করতে বসে বসে। যত সব থিয়েটারি গান আর সংলাপ ছিল পাগলের প্রলাপ, আর নীচের ওই ইডিয়েট নকুলবাবুর সঙ্গে হরদম কথা কাটাকাটি, হইহল্লা-চিৎকার। ওহ্ লাইফ হেল করে ছাড়ত এক একদিন।

রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন পরিক্ষিৎ। একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন যেন।

—আচ্ছা! বেশির ভাগই ছিল থিয়েটারি সংলাপ আর থিয়েটারের গান। তাই না?

—ঠিক। দ্যাটস ট্রু।

দেবদত্ত ওপরের দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই বলতে থাকে, লোকটা কি তাহলে থিয়েটারের দলের কেউ ছিল কখনও! নাটক করত?··পরে পাগল হয়েও মনে মনে ঘুরে বেড়িয়েছে সেই জগতের মধ্যে!···

—আপনার কি কখনও মনে হয়েছে, কথাটা? হঠাৎ প্রশ্নটা পরিক্ষিতের দিকেই ছুঁড়ে দিল।

—না। এ সব নিয়ে কখনও মাথা ঘামাইনি আমি। তবে আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে হতেও পারে—অসম্ভব কিছু নয়। ইয়েস, ইট ওয়জ কোয়াইট পসিবল!

মহীতোষ পাশ থেকে বলে উঠলেন, চেহারাটা তো নাটক করবার মতোই! কী বলেন—

পরিক্ষিৎ আবার তাকালেন পুলিশ অফিসারটির দিকে। কিন্তু মন্তব্য করার প্রয়োজন বোধ করেন না কোনও

দেবদত্ত হঠাৎ বলল, আপনি আগে কখনও মুখোমুখি হয়েছেন লোকটার ? মরা মানুষটাকে এক ঝলক দেখে কি একটুও চেনা-চেনা মনে হয়নি ?

পরিক্ষিৎ উদভ্রান্ত দৃষ্টিতে মাথা নাড়লেন, নোও, নেভার।

—কখনও কৌতূহলও হয়নি দেখতে ?

—মিঃ চ্যাটার্জি, আপনি হয়তো জানেন, কৌতূহল দেখাবার মতো আরও অনেক জিনিস আছে আমার। একটা বিকৃতমস্তিষ্ক ভবঘুরের জন্যে তা নষ্ট করার প্রয়োজন হয়নি কখনও।

চোখ দুটো সহসা প্রখর হয়ে ওঠে পরিক্ষিতের। সেইভাবেই দেয়াল ঘড়ির দিকে দেখলেন এবার।

দেবদত্ত বুঝেও আমল দেয় না ব্যাপারটা।

বলল, মিঃ দত্ত, সেদিন আপনি অনেক রাত পর্যন্ত বাইরে ছিলেন। গাড়িটা আগে ফেরত পাঠিয়ে নিজে বাড়ি এসেছেন রাত বারোটার পর। কথাটা কি ঠিক ?

—না, একেবারেই না। আমি যখন বাড়ির গেটে, তখনও বারোটা বাজতে কুড়ি মিনিট বাকি।

—তবুও অনেক রাত। এত দেরি কেন হল, বলবেন একটু কারণটা ?

—ব্যাপারটা খুবই পার্সোনাল। তবুও বলছি, এডওয়ার্ড কোর্টে আমার এক বন্ধুর হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল, হঠাৎ খবর পেয়ে ক্লাব থেকে সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে যাই আমি তার স্ত্রীর সঙ্গে। সেখানেই ছিলাম, প্রায় এগারোটা পর্যন্ত।

—সরি মিঃ দত্ত, প্রশ্নটা করার জন্যে আমি দুঃখিত। কিন্তু এটা একটা রুটিন। তা, আপনার বন্ধুটি ভাল আছেন তো ?

পরিক্ষিৎ উদাস চোখে মাথা নাড়লেন দুপাশে, নোও—হি হ্যাজ এক্সপায়ার্ড।

—মারা গেছেন ! ওহ্ হো ! এক্সট্রিমলি সরি এগেইন। আফসোসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে দেবদত্ত।

কিছুক্ষণের জন্যে থমথমে হয়ে গেল পরিবেশটা। শূন্যের দিকে দৃষ্টি মেলে থাকেন পরিক্ষিৎ। ভাবছেন যেন কিছু নিজের মনে।

একটু ইতস্তত করেও আবার মুখ তুলল দেবদত্ত। বলল, আর একটা প্রশ্ন মিঃ দত্ত। যখন বাড়ির দিকে আসছেন আপনি, কোথাও সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়েনি আপনার ? মানে তেমন কোনও লোকজন বা গাড়ি-টাড়ি ?

—হ্যাঁ, পার্কের কোণের দিকে দেখেছিলাম। দুটো লোক মুড়িসুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়েছিল গ্যারাজের শেডের নীচে, দৃশ্যটা দেখে আমার খটকা লেগেছিল একটু... অবশ্য খুব ভাল করে লক্ষ করিনি যদিও···

—সে কী। রাত বারোটার সময় বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে দুটি সন্দেহজনক চরিত্র ! আর আপনি খেয়াল করলেন না !

—সরি ! আমার মনের অবস্থা সেরকম ছিল না, মিঃ চ্যাটার্জি।

—আর বাড়িতে ঢুকলেন যখন? একটু কি অন্যরকম লাগেনি। কোনও আওয়াজ বা সাড়াশব্দ কিছু কানে আসেনি! পোড়ো বাড়ির ভেতর থেকে?

—মনে পড়ছে না তো। পুরোপুরিই নিস্তব্ধ তখন চারিদিক···ব্যাঙ ডাকছিল মাঝে মাঝে...একটা গাড়ি ছুটে গেল হর্ন বাজিয়ে···

—আই সি, দেবদত্ত বিড়বিড় করে নিজের মনে, ইন ফার ডিসট্যানসেস্, দা সঙ অফ ফ্রগলিংগুস! হয়তো নিস্তব্ধ মধ্যরাতের প্রহরীরা কিছু বলছিল, বলতে চেয়েছিল···

পরিক্ষিৎবাবু অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে থাকেন দেবদত্তর দিকে। হঠাৎ যেন ধাঁধার মতো লাগে তাঁর। গলগল করে ঘামতে থাকেন আবার। মোটাসোটা ভারিক্কি চেহারার মানুষটা। খুবই অস্বস্তি হচ্ছে যেন এভাবে জেরার মুখোমুখি হয়ে।

দেবদত্ত বলল, থ্যাঙ্ক য়ু মিঃ দত্ত। আর বিরক্ত করব না আপনাকে, অনেক সময় দিয়েছেন আমাদের।

ঘর থেকে বেরিয়ে প্রায় ছুট লাগালেন মহীতোষবাবু। কোথায় পলিটিক্যাল নেতাকে অ্যারেস্ট করতে যাবেন। সেই দিকে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে একবার বললেন, এখানে জেরার কাজ তো মোটামুটি হয়েই গেল স্যার। বাকিটা আপনার কাছ থেকে জেনে নেব।

দেবদত্ত রাতুলকে দেখায়, ওটা তো সব রাতুলবাবুর ডিপার্টমেন্ট।

—হ্যাঁ স্যার। মিঃ সেনের ডায়েরি তো একটা খনি। তা কি আর জানি না!

বলতে বলতেই মাথায় টুপিটা চাপিয়ে গাড়ির দিকে এগোলেন মহীতোষ।

দেবদত্ত বলল, মিঃ ঘোষাল, ফোরেনসিক রিপোর্টের একটা কপি।

—পেয়ে যাবেন স্যার, আজ কালের মধ্যেই···

গাড়িটা স্টার্ট নিয়ে বেরিয়ে গেল।

রাতুল আর দেবদত্ত পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হাত নাড়ে তাঁকে। দত্তবাড়ির আর কেউ নেই আশেপাশে। সুখেন্দু ওপরে হয়তো এখনও সান্ত্বনা দিয়ে যাচ্ছেন পল্লবীকে। সেই তখন থেকে বসে আছেন সেখানে।

একমাত্র একজনকেই দেখা যায়। সরকারমশাই। একাচুপচাপ দাঁড়িয়ে বৈঠকখানার সামনে। নিরীহ গোবেচারার মতো মুখটা নামিয়ে।

রাতুল বলল, এ কী, আপনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে কেন এখানে?

—আজ্ঞে, যদি কোনও প্রয়োজন হয় আপনাদের।

—ও আচ্ছা। সত্যি আপনার কর্তব্যের কোনও তুলনা নেই।

দেবদত্ত বলল, সরকারমশাই! এবার যে আপনার সঙ্গে বসতে হবে একটু!

—অ্যাঁ? স্যার, আ-আমি? আমি আর কী নতুন কথা বলব হুজুর?

—নতুন কথা নয়। আপনি বলবেন আমাকে আসল কথাটা এবার। অ্যান্ড য়ু মাস্ট টেল।

—না স্যার, আমি কোনও খবর রাখি না এসবের, সত্যি বলছি স্যার, আমি একজন কর্মচারী দত্তবাড়ির—

বলতে বলতে সরকারবাবুর মুখটা যেন একেবারে চুপসে যায়। কাঁপছেন থরথর করে। চোখের দৃষ্টিতে একটা অদ্ভুত আতঙ্কের ছায়া। যেন কোনও ঘটনা এখনই ঘটতে চলেছে তাঁর সামনে।

দেবদত্ত হাসল, আমাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই আপনার সরকারমশাই। কিন্তু সাবধান, খুব সাবধান। বিপদ বোধহয় আপনার আশেপাশেই ঘুরছে। যে কোনও মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

সরকারবাবুর চোখে যেন আর পলক পড়ে না। মড়ার মতো স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন দেবদত্তর দিকে।

১৫

দেবদত্ত আবার বলল, না-না, সরকারমশাই ; এক্ষুনি আপনার এত ভেঙে পড়ার কোনও কারণ নেই। রিল্যাক্স—জাস্ট রিল্যাক্স। আর, আমার কাছে আপনি স্বচ্ছন্দে খুলে বলতে পারেন সব কথা। কাকপক্ষীও টের পাবে না। এটাই আমাদের কাজের অলিখিত চুক্তি একটা।

কিন্তু লাভ হয় না। তাঁর চোখেমুখে সেই ভীত-বিহ্বল ভাব। মুখ খুলতেই ঘাবড়াচ্ছেন। কী বলতে কী বলে ফেলেন, তার জন্যেই যেন আরও আতঙ্কিত।

কিন্তু দেবদত্ত রেহাই দেয় না। রাতুলও না। ঘুরে-ফিরে সেই একটাই প্রসঙ্গ টেনে আনছে বারবার। আর ভূপাল সরকারও নাজেহাল দুই ডিটেকটিভের চোখা চোখা জেরার মুখে পড়ে।

রাতুল বলল, তো গাড়িটা আপনার চোখে মুখে জল ছিটিয়ে বেরিয়ে গেল!

—আজ্ঞে।

—ছাতা ছিল তো হাতে, আটকাতে পারলেন না?

—আজ্ঞে, দেখতে দেখতেই ঘটে গেল, কিছু বোঝার আগেই—

দেবদত্ত বলল, হ্যাঁ, আপনি তাকিয়েই রইলেন ; অথচ কিছুই দেখলেন না। এটা কি বিশ্বাসযোগ্য, ভূপালবাবু?

—মাথাটা কেমন গোলমাল হয়ে গিয়েছিল, হুজুর। বিবেচনা করুন, চোখের ওপর দুটো চড়া হেডলাইটের আলো, কোমরে অনেকগুলো টাকা কর্তাদের, খালি

ভাবছি কী করব এবার ? এগোব না পিছোব ? আর কোনও দিকে হুঁশ ছিল না আমার।

—কিন্তু পায়ের শব্দটা পেয়েছিলেন ঠিক। ছপ্ ছপ্ করে জল ভেঙে কেউ এগোচ্ছে ? রেনকোট পরা একটা লোক ?

—হ্যাঁ হুজুর।

—লোকটার কাঁধে একটা ঝোলা ছিল ? একজন না দুজন লোক ?

সরকারমশাইয়ের চোখেমুখে যেন আবার আতঙ্ক। প্রবল বেগে মাথা নাড়তে থাকেন, না-না, আমি দেখতে পাইনি কিছু। শুধু শব্দ পেয়েছিলাম—

—তাই হয় নাকি ? রাতুল বলে উঠল, অন্ধকার ঝড় বৃষ্টির রাত, কোমরে অতগুলো টাকা, মনে ভয়—দৃষ্টিটা তো আপনার নিশ্চয়ই গিয়েছিল সেইদিকে।

—গিয়েছিল হুজুর। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে ছায়া ছায়া একটা কী দেখতে না দেখতেই হেডলাইটের আলোটা পড়ল মুখের ওপর, চড়াং করে। আর সব গোলমাল হয়ে গেল আমার। চোখের সামনে শুধু গোলা গোলা আলো, আর কিলবিলে বৃষ্টির ধারা—

—তাহলে ছায়ার মতো কিছু দেখেছিলেন ? তা সেই ছায়ামূর্তিটা গাড়িতেই উঠল তো ?

সরকার চুপ।

—বলুন, ঠিক করে বলুন।

—আজ্ঞে সেটা কিছু দেখতে পাইনি। আমার ধাঁধা লেগে গেছে তখন, তার মধ্যেই হুস করে বেরিয়ে গেল গাড়িটা।

—বেরিয়ে যাবার পর ? গাড়ির নাম্বারটা দেখলেন না ?

—না হুজুর। আর কোনও দিকে না তাকিয়ে, সোজা বাড়িতে চলে এসেছি।

—এবং রাত তখন দশটা-সওয়া দশটা। কর্তাবাবু শুয়ে পড়েছেন, কাউকে কথাটা না বলে আপনি চুপচাপ সারারাত কাটিয়ে দিলেন। অথচ সন্দেহটা আপনার মাথায়ই প্রথম এল এবং পরদিন সকালে গিয়ে দেখলেন লোকটা গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে, আপনি চুপচাপ আবার ঘরে এসে বসে রইলেন......বেশ অনেকটা সময় কেটে গেল।......তারপর সুখেন্দুবাবুকে টেলি-ফোন করলেন......মোটামুটি বৃত্তান্তটা এই তো ?

—আজ্ঞে যথার্থ হুজুর।

—কিন্তু আপনি তো প্রায় কিছুই দেখেননি, তবু সন্দেহটা কেন আপনার মনে এল ? এবং মনে মনে যা ভেবেছেন তাই ঘটে গেল ? একটু ভেঙে বলবেন আমাদের কারণটা।

সরকারমশাই চুপ একেবারে। চোখে সেই অদ্ভুত আতঙ্কিত দৃষ্টি। তার মধ্যেও পিটপিট করে দেখছেন এদিকে ওদিকে। পালাবার পথ খুঁজছেন যেন।

দেবদত্ত বলল, ভূপালবাবু, আপনি যা জানেন, এখনও বলে দিন আমায় সাফ সাফ। দেরি করে অযথা নিজের বিপদ ডেকে আনবেন না।

সরকারমশাই আবার চমকে উঠলেন! প্রায় কাঁদো-কাঁদো গলায় বললেন, দোহাই হুজুর। আমাকে ছেড়ে দিন—আমি আর কিছু জানি না! মিথ্যে আমাকে জড়াবেন না এর মধ্যে—দোহাই হুজুর।

দেবদত্ত মাথা নাড়ল, আপনি নিজেই যে জড়িয়ে আছেন। আমি কে রেহাই দেবার আপনাকে ?

সরকারমশাই আবার চুপ। অদ্ভুত কঠিন আর গম্ভীর দেখায় মুখটা।

চোখে চোখে কী কথা হয় যেন দেবদত্ত আর রাতুলের। রাতুল আঙুল তুলল একটা ওপরের দিকে। ভূপালবাবু মুখ নিচু করেই আছেন।

দেবদত্ত বলল, আচ্ছা সরকারমশাই, সুধাকান্ত বাবুর একটা ছবি দেখাবেন, আমাদের ?

—আজ্ঞে, ছবি তো নেই।

—সে কী বলছেন! এত বড় বনেদি বংশের বাবার একমাত্র ছেলে, তার একটা ছবি থাকবে না বাড়িতে ?

—আমি বলতে পারব না। আপনি কর্তাবাবুর কাছে খোঁজ করে দেখতে পারেন।

—ঠিক আছে, তাই হোক। আপনি ওপরে খবর দিন, আমরা যাচ্ছি।

নিশ্চয়ই স্যার!

সরকার সঙ্গে সঙ্গেই তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন। যেন আর এক মুহূর্তও নয় এদের খপ্পরে।

—হ্যাঁ, আর সুখেন্দুবাবুকেও একবার আসতে বলবেন আমাদের কাছে। কথা আছে কিছু।

—যে আজ্ঞে।

মাথা হেলিয়ে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন সরকার।

বড় শক্ত ধাতের মানুষ বটে পন্নগভূষণ! এ বাড়ির সবার থেকে আলাদা।

প্রথমে কিছুতেই আমল দিতে চান না তাদের। ডিটেকটিভরা কেন তাঁর ঘরের মধ্যে ঢুকে এই সব পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে টানাটানি করবে ? পাগল খুনের সঙ্গে এর সম্পর্কটা কী ? ভীষণ বিরক্ত হয়ে ব্যাজার মুখে বসে থাকেন ভদ্রলোক।

রাতুল লক্ষ করে, পায়ে না হেঁটে গমন করেন যিনি—এই সেই পন্নগবাবু। তাঁর কথাবার্তা, ভাবভঙ্গি চাউনির মধ্যেই যেন সেই চরিত্রটির বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠছে।

দৃষ্টিতে হঠাৎ হঠাৎ একটা চাপা হিংস্র ভাব। অনেক কিছুই সম্ভব এ ধরনের মানুষের পক্ষে !

দেবদত্ত খুব সাবধানে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক রকম প্রশ্ন করে। কিন্তু আসল খবর কিছু পায় না। ঘটনার দিন সন্ধে থেকে রাত পর্যন্ত কীভাবে তিনি কাটিয়েছেন, কিছুতেই তার একটা ঠিকমতো বিবরণ আদায় করা গেল না মুখ থেকে। পুরু লেন্সের আড়াল থেকে উল্টে তাঁর চোখ দুটোই যেন একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে ভিতর পর্যন্ত দেখে নিতে চায় তাদের।

একবার বলে উঠলেন, আমাদের এভাবে আপনারা ব্যতিব্যস্ত করে তুলছেন কেন মিঃ চ্যাটার্জি। আপনার কি ধারনা এটা আমাদেরই কাজ ?

—ছি ছি, এ কী বলছেন মিঃ দত্ত ? বরং আপনি যা ভাবছেন ঠিক তার উল্টো। আসলে কার কার পক্ষে এর সঙ্গে যুক্ত থাকা সম্ভব নয়, কে কে সন্দেহের বাইরে—সেটা বোঝার জন্যেই এত পরিশ্রম আমাদের। যাকে বলে মেথড অফ এলিমিনেশান। অনেকটা তাই আর কি।

সন্দেহের ঘোরটা তবু কাটে না পন্নগবাবুর। ক্ষণে ক্ষণে রঙ পাল্টায় যেন চোখের মণি দুটো।

বললেন, সত্যি করে বলুন তো, কী চান আপনি।

—একখানা ছবি আপাতত। সুধাকান্তবাবুর ছবি। দেখব পাগলার সঙ্গে কোথাও মিল আছে কি না।

—বোগাস্ ! ওই হামবাগ্ রঞ্জুর গাল-গল্পটা আপনিও বিশ্বাস করেন ? সুধা হলে আমি চিনব না হয় নাকি ?

—আমরা কোনও কিছুই বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করি না, মিঃ দত্ত। শুধু তথ্য জোগাড় করা এবং তাকে যাচাই করে যাওয়া—এই হল আমাদের পদ্ধতি। কাজেই কথাটা যখন উঠেছে, তখন একবার দেখা তো দরকার·····

—একখানা ছবি দেখলেই আপনি সব বুঝে ফেলবেন ?

—আজ্ঞে না। জানি, কাজটা এত সহজ নয়। হয় তো কোনও মিলই পাওয়া যাবে না, তবু দেখতে হবে। এবং একাজে আপনিই একমাত্র ভরসা আমাদের।

কর্তাবাবু মাথা নাড়তে নাড়তে স্বগতোক্তি করেন, বুঝলাম আপনাদের উদ্দেশ্যটা। কিন্তু ······ সুধার ছবি কি আছে আমার কাছে ? না, মনে তো হচ্ছে না। বউমণি মারা যাবার পর ও তো ওর ন দিদার সঙ্গেই লেগে থাকত সব সময়······ শৈলরও তখন মাথার ঠিক নেই ······ আমাদেরও মন মেজাজ ভাল না··· ছবি কি ছিল ওর কোনও··· কী জানি···

না, ছবিটা পাওয়া গেল না।

অনেক ছবি ঘাঁটাঘাঁটি করেও তার সন্ধান মেলে না। পন্নগবাবুর সংগ্রহে পারি-

বারিক ছবির কোনও অভাব নেই। নানা ধরনের ছবি, ছবির অ্যালবাম, অয়েল পেইন্টিং, গ্রুপ ফটো—সবই দেখা হল। কিন্তু সুধাকান্ত কোথাও নেই।

—নাহ্! আফসোসের সুরে মাথা নাড়লেন কর্তাবাবু, হল না। শৈলর অ্যালবামটা পেলে হয়তো দেখাতে পারতাম। কিন্তু সে সব তো আমার কাছে কিছু নেই ……

ঘরে ঢুকলেই সামনে একটা প্রকাণ্ড অয়েল পেইন্টিং। সেই দিকেই আর একবার দেখছিল ওরা। কর্তাবাবু বেশ মেজাজি ভঙ্গিতে পরিচয় দেন, আমার বাবা পর্জন্যভূষণ আর মা প্রসন্নময়ী। বড় পুণ্যাত্মা ছিলেন! মাত্র এক মাসের মধ্যে পর পর দুজনে গত হলেন—।

হালকা হলুদ আর খয়েরি মেশানো জমির ওপর বসে আছেন সম্ভ্রান্তদর্শন এক প্রৌঢ় দম্পতি। চমৎকার কাজ। হিরে মুক্তো ভরা মহার্ঘ অলঙ্কার, ঝলমলে পোশাকের দ্যুতি যেন পট ছেড়ে বেরিয়ে আসছে। প্রসন্নময়ীর শাড়ির পাড়, কপালের সিঁথি-মউড়, গলার সাতনরী হার, কর্তার কাশ্মীরি শালের ডিটেল, সব যেন তাক লাগিয়ে দেবার মতো। সেকালের বিখ্যাত সেই আর্টিস্টের নামও বলতে থাকেন পন্নগবাবু পাশে দাঁড়িয়ে।

রাতুল একবার ক্যামেরাটা ফোকাস করতে গিয়েও করে না। দেখতে থাকে একদৃষ্টিতে। সেকালের এই সাজগোজ আর জড়োয়া অলঙ্কারের বিচিত্র প্রদর্শনীর মধ্যে যেন ইতিহাস ইতিহাস গন্ধ লেগে আছে একটা।

পন্নগভূষণ বাঁ পাশের দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেলেন। বললেন, আর এই যে, এটাই হল সুধাকান্তর বাবা আর মায়ের ছবি। এই দেখুন—

ছবিটা দেখতে হয় ভাল করে। দামি কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো প্রকাণ্ড গ্রুপ ফোটো একখানা। বিয়ের পর নাকি তোলা হয়েছিল শৈলভূষণের। যুবক শৈলভূষণ আর সদ্য বিয়ে হওয়া কনে মণিমালা পাশাপাশি বসে। অন্য আর এক পাশে বসেছেন, পন্নগভূষণ আর সুবর্ণময়ী। দুজনের কোলে তাঁদের দুটি সন্তান-বালক পরিক্ষিৎ আর শিশু পুরন্দর। সবার ওপরের সারিতে তাঁদের পূর্বপুরুষ—পর্জন্যভূষণ ও প্রসন্নময়ী। দুইধারে দুই পুত্র আর পুত্রবধূকে নিয়ে যেন গর্বিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছেন।

রূপ এ পরিবারের বংশগত ধারা। ছবিটা পুরনো হয়ে গেছে অনেক, তবু সেদিকে তাকালে কথাটা আর একবার মালুম করতে হয়। বিশেষ করে শৈলভূষণ ও মণিমালাকে দেখলে। সন্দেহ নেই, সুধাবাবুর আমাদের 'রাজপুত্রের মতো চেহারা' কথাটা উড়িয়ে দেবার নয়।

পন্নগভূষণ পিছন ফিরে গড়গড় করে ইতিহাসটা বলতে থাকেন ছবির।

বলেন, বোর্ন অ্যান্ড শেফার্ড কোম্পানির একজন সাহেব, ডগলাস হ্যারিসন্—

খুব নামকরা ফোটোগ্রাফার সেকালের, নিজে বাড়িতে এসে এই ছবিটা তুলে দিয়েছিলেন ······

পিছনে দাঁড়িয়ে রাতুল আর দেবদত্ত কোনও কথা না বলে দুজনেই ছবিটা দেখছে মনোযোগ দিয়ে। রাতুল টুক করে তার ক্যামেরাটা একবার টিপে নিল এই ফাঁকে।

সুখেন্দু নির্বাক দর্শক একজন। সব দেখেও মুখ এঁটে আছেন সারাক্ষণ।

ছবির পর্বটা শেষ হল আপাতত।

কর্তাবাবুর মেজাজটা হঠাৎ দরাজ হয়ে উঠল যেন। বললেন, আজ দুপুরে খাওয়াদাওয়াটা আপনারা এখানেই সেরে যান না, দয়া করে। সুখেন্দু, তুমি কী বলো ?

—না মেসোমশাই, আমার একটু অসুবিধে আছে। দেবদত্তও মাথা নাড়ে, থ্যাঙ্ক য়ু মিঃ দত্ত। কিন্তু আজ সম্ভব নয়। অন্য আর একদিন।

—তাহলে একটু চা খেয়ে যান, আমার সঙ্গে।

—উইথ প্লেজার। সেটা হতেই পারে।

একটুক্ষণের মধ্যেই চা এসে গেল ? শ্রীমন্তর সঙ্গে সুবর্ণময়ীও এসে দাঁড়ালেন তদারক করতে। চায়ের সঙ্গে ঘরে ভাজা মুচমুচে নিমকি আর প্লেটভর্তি টাটকা মতিচুর। খাঁটি ঘিয়ের গন্ধে খাবার ইচ্ছেটাও যেন জেগে উঠল সবার।

খেতে খেতেই হালকা মেজাজে গল্পগুজব করে দেবদত্ত। রাতুলও যোগ দেয় সঙ্গে। সুখেন্দু এখনও সেই চুপচাপ।

কর্তাবাবুর থমথমে গোমড়া ভাবটা কেটে যাচ্ছে, একটু একটু করে। দেবদত্ত সেটা আরও কাটিয়ে দেয়।

রসিকতা করতে করতে একবার বলল, সন্দেহটা বুঝলেন, একটা বাতিক আমাদের। কোথাও কিছু নেই। হঠাৎ এসে হাজির হয় মনে।

—মানে ?

—এই যেমন, একটা খুব নিরীহ সরল মানুষ হাঁটছে আমার পিছনে, হঠাৎ সন্দেহ হতে শুরু করে, লোকটা ফলো করছে না তো ? আস্তে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি একবার।

সুখেন্দু হাসেন মিটিমিটি কথাটা শুনে।

—তারপর ধরুন, কেউ হয়তো খুব প্রশংসা বা খাতির করছে আমার, সঙ্গে সঙ্গে ভাবি লোকটারও কোনও মতলব নেই তো ? বুঝি, এটা ভাল নয়, কিন্তু কী করব, পেশাটাই যে এই রকম—

বলার ভঙ্গিটা দেখে সুখেন্দু হো হো করে হেসে ওঠেন এবার। অনেকক্ষণ পরে যেন সহজ হতে পারলেন তিনি।

কর্তাবাবুর মুখেও যেন ক্ষীণ হাসির আভাস একটা।

—এই যে সেদিন পোড়ো বাড়ির মধ্যে লোকটা খুন হল, আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, খুনি ওখানেই থামতে চায়নি। হয়তো সে এ বাড়ির মধ্যেও আসতে চেয়েছিল।

কর্তামশাই হঠাৎ চমকে উঠলেন, সে কী! সে কী বলছেন?

—আজ্ঞে হয়তো, অন্য কোনও গুরুতর মতলব ছিল।

—তার মানে, আমার বাড়িতে ঢোকার কথা বলছেন?

—হতেও তো পারে। ছাতের ওপর থেকে নেমে এসে···

পন্নগবাবু ভ্রূ কোঁচকালেন, চোখ দুটো স্থির।

মাথা নেড়ে বললেন, না না, সিঁড়ির দরজা বন্ধ থাকে ভেতর থেকে, পাশে দুটো লোক ঘুমোয় আমার—

—আজ্ঞে দরজাটা ভেঙে ফেলা কোনও অসম্ভব ব্যাপার নয়। তারপর রিভলভার হাতে দু তিনজন ঢুকলে—চূড়ান্ত কিছু করাও···

—আপনি কি রাজেশ ঠাকুরের কথা বলছেন? মুখের চেহারাটা একেবারেই পাল্টে যায় কর্তাবাবুর।

—আজ্ঞে, আমার সন্দেহ একটা, আর কি। ভুলও হতে পারে।

পন্নগভূষণ এবার সত্যিই মুষড়ে পড়লেন।

বললেন, এ তো বড় ভয়ানক কথা। কী করতে চান, এখন তাহলে আপনি?

—আপনার ওপরের ছাতটা ভাল করে ঘুরে দেখতে চাই একবার। কতটা কি সম্ভাবনা আছে বা না আছে এমন, দেখে নিশ্চিন্ত হতে চাই। দরকার হলে কয়েকটা গাছও কেটে ফেলতে হতে পারে বাগানের।—

—নিশ্চয়ই-নিশ্চয়ই। আপনি যেমন বিবেচনা করবেন তাই হবে। আপনি নিজের চোখেই দেখে আসুন। আমি ভূপালকে ডাকছি।

সেই সদাসতর্ক অনুগত সরকারমশাই। আবার এসে দাঁড়ালেন কাছে। এতক্ষণ আশেপাশেই যেন কোথাও অপেক্ষা করছিলেন। হাতে লম্বা লম্বা দুটো চাবি। মাথা চুলকে বললেন চলুন হুজুর।

সুন্দর প্রশস্ত ছাদ দত্তভিলার। বেশ খোলামেলা চারদিক। ওপরে দাঁড়ালে অনেক দূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে যায়। ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকে দেবদত্ত।

পুরনো আমলের ঢেউ খেলানো বাহারি কার্নিশ। কার্নিশের ধারে দাঁড়িয়ে জঙ্গলের দিকে দেখে। হাওয়া উঠেছে বাগানে। গাছের মাথাগুলো দুলছে। পোড়ো বাড়িতে ঢোকার রাস্তাটা লক্ষ করে। গাছ-গাছালি ঢাকা ভাঙা সিঁড়িটা। সব শুনশান নির্জন এখন। পাশেই সেই দাপিয়ে ওঠা প্রকাণ্ড কৃষ্ণচূড়া গাছটা। থোকা থোকা ফুলগুলো জ্বলছে সকালের রোদে।

গাছটা দুলতে দুলতে কোন ইঙ্গিত করে কি! খুনি একবার নাকি ফিরে আসে

তার খুনের জায়গায়। অনেকেই বিশ্বাস করে কথাটা, একবার সে ফিরে আসবেই··· কৃষ্ণচূড়ার ডালটা কি দুলতে দুলতে নিঃশব্দে তাকেই ডাকছে এমন করে? কে জানে।

ভাবতে ভাবতে উল্টোদিকের কার্নিশে এসে দাঁড়ায় দেবদত্ত। ভিতরের উঠোনটার দিকে দেখল। নকুলবাবু। চান করে আকাশের দিকে সূর্যপ্রণাম করছেন বিড়বিড় করে। ঘন ঘন হাত ঠুকছেন কপালে আর বুকে। পাশ দিয়ে ছুটকি এক বালতি জল নিয়ে দুলতে দুলতে ঢুকে গেল।

এ পাশে জানলার ফ্রেমে জুঁইয়ের মুখ। সদ্য ফোটা ফুলের মতো দেখায়। অথচ একটু যেন বিমর্ষ। চুপচাপ দেখছে পোড়ো বাড়ির দিকে।

ক্ষিতিবাবুর ঘরের একেবারে সোজাসুজি ওদিকটা। পাগলার কথা তাঁরই জানা উচিত সবার চেয়ে। অথচ ভদ্রলোক একেবারে এড়িয়ে গেলেন ব্যাপারটা। কেন? বোঝা দরকার ঠিকমতো।

চিলে কোঠার ঘরটার সামনে এসে দাঁড়ায় এবার। সরকারমশাই খুলে দিলেন দরজা। ভেতরে ছোটখাট একটা জিমন্যাসিয়ামের চেহারা। নানা ধরণের উপকরণ শরীরচর্চার। ডাঁই হয়ে পড়ে আছে এখানে ওখানে। লম্বা লম্বা বাঁশের লাঠি। লম্বা একটি মহাবীরের পট।

সরকার বললেন, সব আমাদের পুরোবাবুর সম্পত্তি।

দেবদত্ত বলল, আর ওই সিঁদুর লাগানো হনুমানের ছবিটা?

—আজ্ঞে, ওটাও পুরোবাবু এনেছিলেন। এখন রামদয়াল পুজো করে।

—রামদয়াল কে?

—ড্রাইভার আমাদের।

পোড়ো বাড়ির সঙ্গে সরাসরি কোনও যোগ নেই এদিকের ছাতটার। এক সময় হয়তো ছিল। এখন মাঝখানে টানা পাঁচিল তুলে সীমানা ভাগ করা। তবুও চেষ্টা করলে টপকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পাঁচিলের ধারে এসে দাঁড়ায় দেবদত্ত।

কৃষ্ণচূড়ার লম্বা ডালটা ঝুঁকে এসে পড়েছে এদিকে। আর একটু নামলেই পোড়ো বাড়ির ছাত থেকে নাগাল পাওয়া যেত। ছমছমে বাগানটার দিকে তাকিয়ে থাকতে তবু ভাল লাগে। 'কৃষ্ণচূড়ার ফুলে বনানী গিয়াছে ছেয়ে'

দুটো ইট জড়ো করে পা বাধিয়ে এবার লাফ দিয়ে পাঁচিলের ওপর উঠে বসে দেবদত্ত। তারপর ওপাশের ছাতের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, এ কি সুখেন্দুবাবু!

—কী হল? সুখেন্দুবাবু অবাক হয়ে এগিয়ে এলেন।

রাতুলও লাফিয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে, কী দাদা?

—দেখ, তাকিয়ে একবার। এখানে এত ফুল পাতা ছিঁড়ে পড়ল কী করে।

—ঝড়ে ভেঙে পড়েছে নিশ্চয়। তাছাড়া আর কি। সুখেন্দুবাবু বললেন।

—না মিঃ বোস। এগুলো ছেঁড়াই হয়েছে। ডালটার দিকে লক্ষ করুন, বাড়ি মেরে যেন ভেঙেছে কেউ। এবং ঝড়ের আগেই হয়তো সেটা করা হয়েছে…কিন্তু কেন?

সরকারমশাই বড় বড় চোখ করে বললেন, কী বলছেন হুজুর? ওখানে আবার কে যাবে?

—সেটাই তো জানতে চাইছি। ইটের ওপর পা দিয়ে উঠে আসুন না, দেখুন একবার নিজে।

একে একে সবাই ওপরে উঠে ঝুঁকে দেখতে থাকে এবার।

সত্যিই তো! ছাতময় ছড়ানো এলেমেলো রাশি রাশি কৃষ্ণচূড়ার ডাল আর ফুল। অনেকদিন ধরেই যেন কোন খ্যাপা লোক ভাঙছে একটা একটা করে। পড়ে পড়ে শুকিয়েও এসেছে অনেক। দলা পাকিয়ে পড়ে আছে একধারে। অদ্ভুত কাণ্ড!

কারও মুখে কথা সরে না। ভেবেও পায় না, কে এসেছিল এখানে।

কোন্ পুষ্পপ্রেমিক পাগল ফুল পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেলা করেছে আপন খেয়ালে!

১৬

বুধু পাগলা কে? কেন সে এসেছিল এখানে?

এবং কোথায় চলে যেত সে, রাতের এই আস্তানা ছেড়ে?

প্রশ্নগুলোর সব জবাব চাই এখন। না পাওয়া পর্যন্ত কোনও স্বস্তি নেই দেবদত্তর। কাঁটার মতো বিঁধছে মনের মধ্যে। কপালে চিন্তার ভাঁজ, ঠোঁটে সিগারেট।

একটার পর একটা ডায়েরির পাতাগুলো উল্টে যাচ্ছে। নিজের এবং রাতুলের। মার্জিনে অনেক প্রশ্ন চিহ্ন, ছোট ছোট মন্তব্য। রাতুলের নোটের পাশে পাশে একটা দুটো স্কেচ। মজা করেই আঁকা। সেগুলোও লক্ষ করে খুঁটিয়ে।

পাগলের আসল পরিচয় ঠিক ঠিক জানা গেল না এখনও! এখানেই সবচেয়ে বড় খটকা। কাছাকাছি এসেও যেন লোকটা ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে। অদ্ভুত এক ধাঁধার মতো ঘুরছে মুখটা চোখের সামনে:

রহস্যময় এক ভাবুক…থিয়েটার-প্রিয় এক অন্ধকারের পাগল…কথায় কথায় শুধু নাটকের গান, সংলাপ…কখনও চমকভরা দার্শনিক উক্তি, ভাঙা সুরেলা গলায় গম গম করে ঘুরছে পোড়ো বাড়ির অন্ধকারে…ভোর হলে যে পাখির ডাক শুনে

বাইরে এসে দাঁড়ায়, তাকিয়ে দেখে চারদিকে ··সোনা বউ ডাকল কি। অস্থির উদভ্রান্ত লোকটা ছটফট করে কী এক চাপা দুঃখে···সুগঠিত মজবুত শরীর, চোখ দুটো লাল···

কে সে ? তাকে না চেনা পর্যন্ত যে আর সব কিছুই অস্পষ্ট, অন্ধকার !

পাগলের তো শত্রু থাকে না। কিন্তু বন্ধু পাগলার ছিল। এক বা একাধিক। অন্তত একজন যে তাকে খুন করবার জন্যেই ওত পেতে ছিল, সে বিষয়ে এখন আর কোনও সন্দেহ নেই। দিনের পর দিন গোপনে গোপনে প্রস্তুতি চলছিল যার জন্যে। কিন্তু একটা পাগলাকে খুন করে কী লাভ ? কী উদ্দেশ্য ছিল পিছনে···

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে ঘরময় পায়চারি করে দেবদত্ত! হাত দুটো পিছনে মুঠো করা, মাথাটা নোয়ানো। আর কোনও দিকে খেয়াল নেই। এক একবার ঘুরে এসে জবানবন্দির কপিগুলো দেখে উল্টেপাল্টে, খুবই আশ্চর্য লাগে তার। আবার চক্কর কাটে ঘরময়, নিজের মনে কথা বলতে বলতে।

বাইরে ক্রমশ নিশুতি হয়ে আসছে পাড়াটা। ঘন অন্ধকার রাত। টং টং করে একটা দমকলের গাড়ি ছুটে গেল ঊর্ধ্বশ্বাসে।

হুঁ্যা, জেরা থেকে জানা যাচ্ছে, একটা ঝোলার কথা। মুখ বাঁধা ঝোলা। যার মধ্যে নাকি নিজের সংসারটা বয়ে নিয়ে বেড়াত পাগল। ছুটকি নিজের চোখে দেখেছে। কিন্তু তা পাওয়া যায়নি। পেলে হয়তো খুবই সুবিধে হত। হত্যাকারী বুঝেই সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে নিয়ে গেছে সেটা। কোনওরকম সূত্রই ফেলে যায়নি পেছনে।

এখন সম্বল শুধু পোড়ো বাড়ি থেকে কুড়িয়ে পাওয়া কিছু ছেঁড়াখোড়া ময়লা কাগজ, পুরনো থিয়েটার-সিনেমার হ্যান্ডবিল। নায়ক-নায়িকাদের ঝাপসা ধূসর ছবির কাগজ, টুকরো টুকরো করে ছেঁড়া চিঠি, ছাপানো বিয়ের পদ্য, বাসের টিকিট আরও কিছু হাবিজাবি।

কে জানে, এর মধ্যেই লুকোনো আছে কিনা কোনও গোপন সংকেত !

ঘরের আর এক কোণে বসে রাতুল সেই চেষ্টাই করছে পর পর সব সাজিয়ে। যেন ছাই উড়িয়ে অমূল্য রতন খোঁজার বাসনা তার। মেঝের ওপর ছড়ানো আবর্জনাগুলোর ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। লাল কারে বাঁধা একটা ছোট্ট মাদুলি, কয়েকটা লাল পুঁতির দানাও বাদ যায়নি সেই প্রদর্শনী থেকে।

আপাতদৃষ্টিতে কোনও গুরুত্ব নেই এর। নিতান্তই কিছু আবর্জনা। তবু তন্ন তন্ন করে খুঁটিয়ে দেখছে ম্যাগনিফাইং গ্লাস ধরে। বিশেষ করে হাতে লেখা কাগজ বা চিঠির টুকরোগুলো···

বাইরে রাত. বেড়ে চলে। নিস্তব্ধ ঘরের দু পাশে দুজন—গুরু আর শিষ্য। দুজনেই গম্ভীর। একমনে নিজের নিজের কাজ করে চলেছে নিঃশব্দে···।

ওদিকে সুখেন্দু ফোন করছিলেন শাস্ত্রীকে।

দেবদত্তর কথামতো রাত্তিরে ফিরেই ক্লাবের নাম্বারটা ডায়াল করলেন। কয়েকটা জরুরি খবর আছে জানার। অনেকদিন আর ওমুখো হননি। এখন আর হচ্ছেও না যাওয়া।

লাইনটা ধরেই আছেন সুখেন্দু। ওপাশ থেকে সাড়াও পাওয়া গেছে। কিন্তু সুরেশের পাত্তা নেই। হয়তো পিক আওয়ার্স'টা আজ এখনও চলছে ক্লাবের।

একটু পরেই শোনা গেল পরিচিত সেই রসালো গলাটা, বোস, সাব ?

—জি, শাস্ত্রীজি।

—বান্দা হাজির মালিক। কহিয়ে ক্যা সেবা কর সকতা হুঁ ম্যায় ?

—কী বলব সুরেশ, তুমি আজকাল কোনও খবরটবর নিচ্ছ না আমার !

—আরে রাম, রাম ! ইয়ে আপ কহে রহে সাব ? সুরেশ হরবখৎ আপনার কথা ইয়াদ করে। লেকিন আপনিই আসছেন না এদিকে—টলির দিকেই ছুটছেন কেবল।

সুখেন্দু হাসলেন, না না, ভুল শুনেছ তুমি। কোথাও আর যাচ্ছি না তেমন। একটু ব্যস্ত হয়েই আছি কয়েকটা দিন।

—তো ফিফটিনথ চলে আসুন এখানে। বহৎ বড়া পার্টি অ্যারেঞ্জ হচ্ছে একটা। আপনার কাছে ইনভিটেশান লেটার যাবে।

—পার্টি ? হঠাৎ আবার কীসের পার্টি তোমাদের !

—বৈশাখী ফেস্টিভ্যাল পার্টি, স্যার। এ রিয়েল সারপ্রাইজ ! এ বছরই প্রথম চালু হচ্ছে। জয়সোয়ালজি আর মাথুরসাব মিলে সব প্রোগ্রাম করছেন। ভাটিয়া আর ব্যানার্জিসাহেবও আছেন সঙ্গে।

—গুড গড ! তোমাদের দেখছি উপলক্ষের কোনও অভাব হচ্ছে না আর।

—আরও আছে স্যার। বেস্ট লেডি গলফার অব দ্যা ইয়ার-এর অনারে সঙ্গে একটা ককটেলেরও ব্যবস্থা থাকছে। তারপর শুরু ভ্যারাইটি প্রোগ্রাম, নাচ-গান, লাকি প্রাইজ ড্রয়িং, স্পেশাল ডিনার অ্যান্ড এ লট অব হল্লাগুল্লা। অ্যান্ড প্লেণ্টি অব ফানস। চলে আসুন, স্যার।

—বেশ বড় ব্যাপার মনে হচ্ছে যেন। ভালই। তা বেস্ট লেডি গলফার কে হচ্ছেন এবার ?

—মিস সোহাগ সেন। ঊর্মিলাজির সঙ্গে প্রায় নেক টু নেক ফাইট হল এবার। ম্যাডাম সারাও খুব লড়েছেন।

—আর তোমার নীনা মাথুর ?

—বহৎ পিছে। লেকিন ইস উমর মে ভি, কোশিস বহৎ কী। স্টিল এ টাফ ফাইটার।

—ও ইয়েস। শি ইজ ভেরি এনার্জেটিক ইনডিড!

একটুক্ষণ ভাবলেন সুখেন্দু। পরে হঠাৎ বললেন, তুমি রাজেশ কোম্পানির হালচাল কিছু বলো।

—বহুৎ খুশ নজর আতা আজকাল। আয়া থা দু চার রোজ পহেলে, পুরা পার্টি ইধার।

—কোনও পরিবর্তন চোখে পড়ল না? আই মিন, ডু দে লুক উয়োরিড?

—বিলকুল নেহি। হামে তো খুশ নজর আয়া সব কো। পি রহা থা গার্ডেন মে। লেকিন এক বাত, শিশির নামের যে শাগরিদ আছে না ওর?

—হাঁ, হাঁ, শিশির—

—ও একটা মার্ডারের বেপার নিয়ে কী যেন বলছিল। আর ওরা সবাই শুনছিল

—হোয়াট! কী বলছ শাস্ত্রী? টেল মি দ্যা হোল স্টোরি!

—পুরা তো নেহি শুনা সাব। লেকিন রাজেশের জানাশুনা কোই ফ্যামিলি হোগা, একটা গাণ্ডগোলও সেখানে চলছে। এটা বুঝতে পারছিলাম··

—হোয়াট এ ব্লাণ্ডার! দাঁড়িয়ে একটু শুনলে না কথাগুলো?

—নেহি সাব।

—সুরেশ য়ু হ্যাভ মিসড এ গোল্ডেন অপারচুনিটি। আই ওয়াণ্ট দ্যাট ইনফর্মেশান, ভেরি ব্যাডলি! তুমি কাছে দাঁড়িয়ে শুনবে তো ঘটনাটা।

—উখানে দাঁড়ালে শক হবে না ওদের? শেরাজাদি ক্লাবের কথাটা ভুলে গেলেন এতো তাড়াতাড়ি?

—ইয়েস, কারেক্ট! আচ্ছা, তুমি কি তখন ওদের মুডটা লক্ষ করেছিলে? স্পেশালি রাজেশ? ওয়জ হি প্যানিকি?

—বিলকুল নেহি। উসকো দিল মে তো আভি খুশি কা লহর চল রহা।

—কেন, হঠাৎ? লটারি পেয়েছে নাকি?

—নেহি সাব, প্যার কা নয়া তুফান। ক্যাপ্রি বার রেস্তোঁরার যে মডেল সিঙ্গার আছে না। সাহেলি সমাদ্দার। ওর সঙ্গে এখন জবরদস্ত প্যার মুহব্বত চলছে।

—রিয়েলি! এটা তো দারুণ খবর একটা।

—তো অউর শুনিয়ে। আজকাল রাজেশ ওকে নিয়ে সিনেমায় যাচ্ছে, হোটেলে সুইট বুক করছে। প্রোগ্রামও করছে গানের এখানে ওখানে।

—বাঃ! ভালই হয়েছে ব্যাপারটা তাহলে, বল? এতদিনে একজন যোগ্য পার্টনার জুটিয়েছে ছোকরা।

সুখেন্দু যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন। মনটা কেন যেন হালকা লাগে হঠাৎ।

অন্তত পল্লবীর দিক থেকে ছোকরা নিয়ে ততটা ভয় রইল না হয়তো।

—আপ পার্টি মে চলা আইয়ে সাব। ওদের প্রোগ্রাম দেখবেন সামনে বসে—সাহেলি সমাদ্দার অ্যান্ড রাজেশ ঠাকুর!·

—ভাবছি শাস্ত্রী। সময় হলে চলে যেতেও পারি। কিন্তু তোমার কাছে আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে। লিসন কেয়ারফুলি—

—হুকুম বোলিয়ে, জনাব।

—বেশ তাই হল। রাজেশ অ্যান্ড পার্টির সঙ্গে তোমাকে একটু ঘনিষ্ঠতা রাখতেই হবে। ইটস ফর মাই সেক। বিশেষ করে পার্টির দিনে—লেট আওয়ারে। ড্রাঙ্ক হলেই আবার অনেক কিছু বেরোবে হয়তো। খুনের কথাটা কিছু উঠলেই শোনার চেষ্টা করবে। অ্যাট এনি কস্ট। জাস্ট দু একটা কমেন্ট জানলেই কাজ চলে যাবে আমার। অ্যান্ড য়ু উইল বি রিওয়ার্ডেড ফর দ্যাট। ডু য়ু ফলো মি?

—বিলকুল। ডাল মে ফির কুছ কালা নিকলা, এহি না? ঠিক হ্যায় কোশিস করেঙ্গে হাম জরুর।

—থ্যাঙ্ক য়ু সুরেশ, য়ু আর গ্রেট। গুড নাইট!

—গুড নাইট স্যার। সুরেশ ইজ অলওয়েজ অ্যাট ইয়োর ডিসপোজাল।

কাগজের টুকরোগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে অবশেষে আস্ত একটা ঠিকানা বেরোল। কার, বোঝা যায় না। তবু পাশাপাশি জোড়া দিয়ে পাওয়া গেল। আর, এলোমেলো নাম কয়েকটা—অভয়, আলপনা, শুরবাবু, আত্রেয়ী, ঝড়ু, বেন্দামাসি···

আলপনা! আলপনা নামটাই ঘুরেফিরে আসে। কোনও বিশেষ যোগ আছে কি তার সঙ্গে? কিছুই স্পষ্ট নয়।

রাতুল চটপট নামগুলো তুলে নেয় ডায়েরির পাতায়। আলপনার নামটা বড় করে একপাশে। ধারে দুটো জিজ্ঞাসা চিহ্ন। আর একদিকে ঠিকানাটা। গোল করে বর্ডার টানে তারও চারপাশে।

তারপর দেবদত্তকে দেখায়, এই যে, এগুলো উদ্ধার হল পাগলার সম্পত্তি থেকে, দাদা।

—বাহ্, ফাইন! দেবদত্ত মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকে নামগুলো।

—এই ঠিকানায় একবার হানা দিয়ে দেখা যেতে পারে।

—অফকোর্স। চলো কাল সকালেই যাব।

—আলপনা নামটা কিন্তু অনেকবার আসছে দাদা। মনে হয়, কোনও আলাদা মানে আছে এর। আলপনা আর আত্রেয়ী।

—আই সি!

রাতুলের দিকে তাকিয়ে একবার ব্যাপারটা অনুমান করে দেবদত্ত। ঠিকানা যে অঞ্চলের, কলকাতার সে পাড়াটার খুব সুনাম আছে বলে মনে হয় না। হয়তো অস্বস্তিকর কোনও পরিস্থিতির মধ্যেও পড়তে হতে পারে। তবুও উপায় নেই।

রাতুল বলল, মনে হয় না-একটা হদিস পাওয়া যাবে ?

—পেতেই হবে। রাতুলের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে দেবদত্ত।

রাত্তিরে শুতে যাবার আগে সুখেন্দুর ফোন এল। এই রকমই কথা ছিল। অনেকক্ষণ ধরেই কথা হয় দুজনের। শাস্ত্রীর কাছে পাওয়া খবরগুলো সুখেন্দু পর পর সব জানালেন। বিশেষ করে রাজেশের কথাটা।

দেবদত্ত শুনতে শুনতেই ভাবে। তাহলে? ঘটনাটা অন্য দিক মোড় নিচ্ছে যেন। ভালই হল। ভার নামল হয়তো মনের অন্য আর একজনের। কিন্তু পুষ্পপ্রেমিক পাগল! সে কি আরও অন্ধকারে চলে যাচ্ছে না ?

হঠাৎ চিন্তাটা সরিয়ে দিয়ে বলল, মিঃ বোস, এদিকে আমরা একটা ঠিকানা পেয়েছি। আপনি চেনেন নাকি জায়গাটা ?

—ঠিকানা ? কার ঠিকানা মিঃ চ্যাটার্জি ?

দেবদত্ত তাকে খুলেই বলে সব।

সুখেন্দু বললেন, মাই গুডনেস। ব্যাপারটা তো বহুদূর গড়াচ্ছে দেখছি। আপনি জানেন, রাস্তাটা কোথায় ?

—ও আমরা ঠিক চিনে নেব। অসুবিধে হবে না।

সুখেন্দু হাসলেন, সন্ধের পর হাতে বেলফুলের মালা জড়িয়ে লোকে যায় ওদিকে। এবং ফেরে মধ্যরাতের পর। সেটা জানেন কি ?

—জানলাম। চিন্তা নেই, আমরা সকালের দিকেই যাব। আপনি যাবেন কি ?

—সরি। পারছি না, এমন একটা ইন্টারেস্টিং অভিযানে আপনাদের সঙ্গী হতে কাল। তবে সকালেই একটা চেক যাচ্ছে, আপনার পারিশ্রমিকের কিছু আগাম। প্লিজ অ্যাকসেপ্ট দ্যাট।

—থ্যাঙ্ক য়ু মিঃ বোস।

—আর একটা কথা, পারলে সঙ্গে মহীতোষবাবুকেও নিয়ে যান। পুলিশ সঙ্গে থাকলে অনেক সুবিধে হবে ও পাড়ায়।

—থ্যাঙ্ক য়ু। চেষ্টা করব।

সকাল ঠিক দশটার মধ্যেই পৌঁছে গেল ওরা। বাড়ি খুঁজে পেতেও খুব দেরি হয় না। কিন্তু চারদিক এখনও যেন কেমন নিঝুম। মনে হয় পুরোপুরি যেন জেগে ওঠেনি পাড়াটা। রাতভর জাগরণের পর সবে আড়ামোড়া ভাঙছে সকালের

মহীতোষবাবুও সঙ্গে এসেছেন। অভিজ্ঞ লোক এ লাইনের! একনজর দেখেই হাল হকিকতটা বুঝে ফেলেন মহল্লার। দুপাশে সরু সরু অন্ধকার গলি। গটগট করে হাঁটতে হাঁটতে নজর রাখেন চারিদিকে। দাগি কোনও ক্রিমিন্যাল আছে কি না ওত পেতে কোথাও।

পকেট থেকে কাগজটা বের করে, আর একবার ঠিকানা মেলায় দেবদত্ত। হ্যাঁ এই-ই-ই। অদ্ভুত চেহারার একটা পুরনো আমলের দোতলা বাড়ি। একসময় খুবই জৌলুস ছিল হয়তো। এখন দুপাশে অনেকগুলো খোপ খোপ ঘর। প্রয়োজনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে উঠেছে। কিন্তু কোথাও কোনও সাড়াশব্দ নেই।

অনেক ভিতর থেকে যেন এটা গানের সুর ভেসে আসছে। মিহি চিকন গলায় আশাবরী ঠুংরির আলাপ। সঙ্গে কাঁপা কাঁপা করুণ সুরে সারেঙ্গির যুগলবন্দি। মিঠে গলায় কোনও বাইজির রিওয়াজ শুরু হল হয়তো। কান পাতলে পাশে অন্য কোথাও যেন ঘুঙুরের বোলও শোনা যাচ্ছে……

তার সঙ্গেই হঠাৎ বেসুরো আওয়াজে খটখট করে দরজার কড়া নাড়েন মহীতোষবাবু। গমগমে গলায় হাঁকও দেন একটা, অ্যাই, কে আছ?

দরজা ফাঁক করে উঁকি দেয় একটা লোক। বেশ গাট্টাগোট্টা ঘোড়ামুখো চেহারা। পুলিশ দেখেই লোকটা চমকায়।

দরজাটা হাট করে খুলে হাতজোড় করে বলল, স্যার। কিছু গোলমাল হয়েছে?

দেবদত্ত বলল, শোনো, আলপনা বলে কোনও মহিলা এখানে আছে?

—না হুজুর। এ নামে তো কেউ নেই।

মহীতোষ ধমক দিলেন, অ্যাই ব্যাটা, এখানকার মাসি কে আছে?

—আজ্ঞে সিতারাবাই। দাঁড়ান আমি ডেকে আনছি।

—দাঁড়াব কী রে ব্যাটা, মহীতোষ গর্জন করে ওঠেন, তোর বাপের চাকর? আগে বাবুদের বসার ব্যবস্থা করে দে—

লোকটা ঘাবড়ে গিয়ে হাত দুটো কানে ঠেকায় একবার, একবার কপালে। বলল, আসুন হুজুর, আসুন—

ভিতরে বাঁ দিকের একটা ঘর খুলে দেয়। সুন্দর ছিমছাম করে সাজানো ঘরটা। ওপরে ঝাড়লণ্ঠন, নীচে ধবধবে তাকিয়া পাতা ফরাস। ফুলতোলা জাজিম। অন্য আর একদিকে হাল ফ্যাশানের ছোট ছোট বেতের চেয়ার। দেয়ালে নানা ধরনের দেশি বিদেশি ছবি। নবাবি পোশাকপরা এক বাবুরও অয়েল পেইন্টিং ঝুলছে একখানা। হয়তো এই বাবুদেরই পয়সায় এত জাঁকজমকে ভরে উঠেছে পরিবেশটা। ভেসে গেছে ভোগবিলাসের স্রোতে, দিনের পর দিন!

—ভেতরে তো দেখছি বেশ খানদানি ব্যবস্থা। মহীতোষ বললেন।

দেবদত্ত মাথা নাড়ে মুজরো মাইফেলের আসর বোধহয়।

লোকটা ফিরে এল। সঙ্গে একজন বছর চল্লিশমতো বয়সের অবাঙালি মহিলা।

ঠোঁটে সামান্য রঙের ছোঁয়া, চোখে সুরমা টানা। বেশ একটা ব্যক্তিত্ব যেন চেহারায়। মাথা নুইয়ে কুর্নিশ করে সে সবাইকে।

দেবদত্ত বলল, নমস্কার। আমরা এসেছি আলপনা নামে একটি মেয়ের খোঁজে। আপনি কি একটু সাহায্য করতে পারেন আমাদের ?

বড বড় চোখ মেলে কী যেন চিন্তা কবে সিতারাবাই। লোকটাকে বলে, লছমি কো বোলাও।

দেবদত্তর দিকে তাকিয়ে বলল, থোড়া ইন্তেজার করুন বাবুজি—লছমি এ কোঠির সবচেয়ে পুরনো মেয়ে। সায়েদ ও বলতে পারবে।

লছমি এল। হাসিখুশি গোল মুখ, একেবারেই ঘরোয়া চেহারা। দেখলে বেশ সরল আব খোলামেলা স্বভাবেব মহিলা বলেই মনে হয়। বয়েসে সিতারাবাইয়ের প্রায় কাছাকাছি।

সব শুনে সে বলল, আলপনা ? হ্যাঁ চিনি। সে তো অনেককাল আগে এখানে ছিল।

—আপনি তাহলে চিনতেন তাকে ? দেবদত্ত দাঁডিয়ে পড়ে হঠাৎ, বলুন আর কী জানেন তার সম্বন্ধে ?

—সে সব কতকাল আগেব কথা। কী সুন্দর চেহারা ছিল তার! গান জানত ভাল, লেখাপড়াও করেছিল। দিদি বলে ডাকত আমাকে। কিন্তু শুরবাবু সেই কচি মেয়েটাকে নিয়ে থিয়েটারের প্লেতে নামাল একবার। বাস, সেই যে একবার নাম হয়ে গেল, আর থামানো গেল না আলপনাকে। থিয়েটারই হল ধ্যানজ্ঞান। শেষে একদিন এপাড়া ছেড়ে পুরোপুরি চলে গেল।

—কোথায় গেল ? ঠিকানাটা দিতে পারেন একটু ?

—হুজুর সে তো অনেকদিন হয়ে গেল। তবে আমার কাছে লেখা ছিল বোধ-হয়। দয়া করে আপনারা একটু বসুন। আমি খুঁজে দেখছি।

—খুব ভাল হয় তাহলে। একটু চেষ্টা করে দেখুন আপনি।

বেশ দেরী হল না।

ঠিকানা লেখা একটা কাগজের চিরকুট নিয়ে লছমি উপস্থিত হল একটু পরেই। বলল, এই নিন বাবু। খুঁজে পেয়েছি।

দেবদত্ত কাগজটা নিয়ে বলল, অশেষ ধন্যবাদ। হঠাৎ বিরক্ত করলাম বলে, আশা করি মনে কিছু করবেন না।

লছমি কানে হাত ছুঁইয়ে জিভ কাটে, ছি! ছি! এ কী বলছেন বাবু! আমার কত বড় ভাগ্য যে, আপনাদের পায়ের ধুলো পড়ল এখানে।

—আর একটা কথা। আত্রেয়ী বলে কাউকে চেনেন আপনি ?

—আত্রেয়ী ? হায় কপাল ! লছমি হাসল একটু, ওই পার্টটাই তো সে করেছিল প্লেতে। তারপর থেকে আলপনাকে সবাই ওই নামেই ডাকতে থাকে। খুব নাম হয়েছিল। গানও করেছিল খুব সুন্দর। এক বাবু তো সেই প্লে দেখে আত্রেয়ী আত্রেয়ী করে পাগল হয়ে গিয়েছিল।

—এক বাবু, না ? বাবুকে আপনি দেখেছিলেন ? মনে আছে ?···

—হ্যাঁ। গোরাপানা মুখ। বেশ সুন্দর চেহারা। আত্রেয়ীর টানেই দু-চারবার এসেছিলেন।

—আই সি ! ঠিক আছে, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ সিতারাবাই—অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।

—মেহেরবানি আপকি হুজুর। সেলাম করে সিতারাবাই।

রাস্তার মোড়ে দাঁড়ানো জিপটা মহীতোষবাবুর। উঠতে গিয়ে পিছন ফিরে আর একবার দেখে দেবদত্ত। কেউ নেই আর তারা ! না আলপনা, না আত্রেয়ী। শুধু অদ্ভুত চেহারার বাড়িটা তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। কার্নিশ জুড়ে সার সার পায়রার দল। তারাও যেন চুপচাপ।

—রাতুল তোমার মনে আছে, দেবদত্ত হঠাৎ বলল, পাগলার সেই অদ্ভুত সংলাপটা ?

—কোনটা দাদা ?

—খুন হবার আগের মুহূর্তে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে চিৎকার করতে করতে চন্দ্রগুপ্ত নাটকের যে সংলাপটা বলছিল ?

—ওহ্ হো। 'শুনেছ কাত্যায়ন বলেছে আত্রেয়ী ! আত্রেয়ী !' এইটা ?

—ঠিক তাই। কী আশ্চর্য, না ? হয়তো আততায়ীকে উদ্যত দেখেও সে শেষবারের মতো চিৎকার করে বলে গিয়েছিল কথাটা। আমরা কেউ বুঝিনি তখন।

—বোঝার উপায় ছিল না আমাদের !

—কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যেন বুঝতে পারছি। চন্দ্রগুপ্ত নাটকের সঙ্গে কোথায় যোগসূত্র বুধু পাগলার ! গোরাপানা সুন্দর বাবুটা কে ? মহাসিন্ধুর ওপারে চলে গেলেও পাগল যেন সেই ইঙ্গিতটা রেখে গেছে পিছনে······

—ঠিক বলেছেন দাদা।

—ইয়েস রাতুল। এই পথটা ধরেই এখন এগোতে হবে আমাদের।

১৭

রাত্তিরে সুখেন্দু ফোন করলেন। দেবদত্ত আশাই করেছিল এটা। ফোন ধরে বলল, থ্যাঙ্ক য়ু মিঃ বোস। চেকটা পেয়ে গেছি আপনার। কিন্তু এ তো দেখছি অনেক টাকা।

—না না, আপনাদের নানারকম ঝুঁকি ও কাজের দক্ষতার তুলনায় এটা খুবই সামান্য। সুখেন্দু হাসলেন বিনয় করে। পরে বললেন, ও সব থাক। আপনাদের সকালের অভিযানের কথা কিছু বলুন। ইণ্টারেস্টিং অভিজ্ঞতা কিছু হল ওখানে ?

—ও ইয়েস, অফকোর্স। আপনি গেলে ভালই হত। দারুণ একটা ক্লু-ও পেয়েছি। নাটক করা পাগলাকে আপনাদের, বোধহয় এবার চিনে ফেলব।

—আর তার হত্যাকারীকে ?

—মুশকিল। সেখানেই যে একটা জট পাকিয়ে আছে।

—কেন ?

—'হত্যাকারী কে ?' এই নামে সেকালে একখানা বিখ্যাত ডিটেকটিভ বই ছিল, আপনি জানেন ?

—জানি মিঃ চ্যাটার্জি।

—আমাদের তদন্তের বিষয়টাও যদি তাই হত কেবল, খুব খুশি হতাম। কিন্তু দেখুন, আমাদের সমস্যা হল, 'হত ব্যক্তি কে ?' আগে তাই বের করা।

—তা অবশ্য ঠিক। আপনি আগেও বলেছেন কথাটা।

—এখন প্রথমজনকে চিনে ফেলতে পারলে পুরোপুরি, দ্বিতীয়জনকে ধরতে আর দেরি হবে না। আপনার কী মনে হয় ?

সুখেন্দু কোনও মন্তব্য করেন না। চুপচাপ কিছুক্ষণ।

তারপর হঠাৎ বলেন, মিঃ চ্যাটার্জি, একটা কথা জিজ্ঞেস করব আপনাকে ?

—নিশ্চয় করবেন। বলুন কথাটা—।

—খুনের ব্যাপারে আপনি কি কাউকে সন্দেহ করছেন ? মানে, মোটামুটি একটা আন্দাজ করেছেন কি ?

—এই কথা ! হাসল দেবদত্ত, অবশ্যই করছি। তবে একজনকে নয়, এই মুহূর্তে সন্দেহভাজন ব্যক্তির সংখ্যা বেশ কয়েকজন। তার মধ্যে থেকেই আসল লোকটিকে টেনে বের করতে হবে।

—লিস্টে কি আমার নামটাও আছে নাকি ?

—আপনি? আপনি আপাতত রিজার্ভে আছেন। দেবদত্ত হেসে উঠল শব্দ করে, দরকার হলে টান পড়তেও পারে দলে।

সুখেন্দুও হাসেন। হাসতে হাসতে বলেন, কোনও বিশ্বাস নেই আপনাদের। কোন্ দিকে যে এগোচ্ছেন আপনারা, কখন যে কাকে খপ্ করে চেপে ধরবেন, কিছুই বুঝতে পারছি না।

—না, আপনাকে ধরছি না আপাতত। অ্যাসিওরড্। দেবদত্ত মজা করে।

—থ্যাঙ্ক য়্যু। টাকাটা ওই জন্যেই তো তাড়াতাড়ি পাঠালাম।

—আপনার বন্ধু কিন্তু আমাদের সাহায্য করলেন না, মিঃ বোস। পাগলার আস্তানাটা একেবারে ওঁর ঘরের মুখোমুখি, অথচ উনি মুখ খুলতে চাইলেন না। এড়িয়েই গেলেন একটু—।

—কার কথা বলছেন, ক্ষিতি?

—ইয়েস। ওই ঘরের মধ্যে পাগলার যত অদ্ভুত অদ্ভুত কথা, গান, নাটকের সংলাপ, দিনের পর দিন ক্ষিতিবাবুই শুনেছেন সব চেয়ে বেশি। সেগুলো খুবই জানার প্রয়োজন ছিল আমার·· ···। আর একবার চেষ্টা করে দেখব নাকি আপনাকে সঙ্গে নিয়ে?

—কিন্তু ক্ষিতি তো থাকছে না। কালকেই ও কলকাতার বাইরে চলে যাচ্ছে।

—কালই? ওহ্ হো! কোথায় যাচ্ছেন?

—প্রথমে খড়্গপুর। শৈলীকে পৌঁছোতে যাবে শ্বশুরবাড়িতে। সেখানে একদিন কাটিয়ে পরে অফিসের কাজে ভাইজ্যাগ। পাঁচ ছ' দিনের মধ্যে আর দেখা পাচ্ছেন না।

—আই সি।

—খুবই কি দরকার ছিল আর একবার কথা বলার?

—বলতে পারলে ভাল হত। তাছাড়া ড্রাইভার রামদয়ালকেও একটু বাজিয়ে দেখতে হবে। এই একটা বড় ভুল হয়ে গেছে আমার। আপনি চেনেন লোকটাকে?

—নিশ্চয়ই। কিন্তু হঠাৎ রামদয়ালকে সন্দেহ, কী ব্যাপার?

—এমনিই।

—ও কেন করতে যাবে, এই সব কাজ?

—করতেও তো পারে, অসম্ভব কি? ওর দিকে কারোরই নজর পড়বে না অবশ্য সাধারণভাবে। বাড়ির ছাতের সিঁড়িতে রাত্তিরের আস্তানা। মহাবীরের ভক্ত··· ডন বৈঠক দেয়, মুগুর ভাঁজে, এক আধ ঘণ্টা রোজ···আশ্চর্য! আমারও নজর এড়িয়ে গেল। ওর পক্ষেই তো সবচেয়ে সুবিধে···।

—না না, আমি ভাবতে পারছি না এটা।

—খুব স্বাভাবিক। আচ্ছা লোকটা কতদিন আছে এ বাড়িতে বলতে পারেন?

—তা প্রায় বিশ-বাইশ বছর। খুবই বিশ্বাসী আর অনুগত কর্মচারী একজন দত্তদের।

—তাই? অর্থাৎ ভূপাল সরকারের মতোই আর একজন। এ জন্যেই তো সন্দেহটা আরও বেশি। লোকটাকে একবার দেখতেই হচ্ছে. সুখেন্দুবাবু। আপনাকে নিয়েই যাব। কী বলেন?

সুখেন্দু চুপ। কোনও উত্তর দেন না সরাসরি।

একটুক্ষণ থেমে পরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আমি আর ভাবতে পারছি না। আই ফিল সো টেন্‌স মিঃ চ্যাটার্জি। কিছুতেই যেন স্বাভাবিক হতে পারছি না, ওদের ওখানে রোজ যাওয়াও হচ্ছে না আর—

—জানি মিঃ বোস। তাব কাবণ বোধহয়, মনে মনে আপনিও কাউকে সন্দেহ করছেন। অথচ কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না সেটা!

—না না, সে কী! চমকে উঠলেন সুখেন্দু, এ সব কিছু মনে হচ্ছে না আমার। এ ব্যাপারে আমি এখনও কনফিউজড্‌ হয়ে আছি—টোটালি কনফিউজড্‌!

—কনফিউজড, তো আমিও সুখেন্দুবাবু। মূল সমস্যাটা আমার এখনও ধোঁয়াটে আর রহস্যময়। সামনে শুধু একটার পর একটা প্রশ্ন, কেন…কেন? · কেন? তবু তার মধ্যেও কি একটা মুখ মাঝে মাঝে ভেসে উঠছে না? শুধু আর একটু সময়ের অপেক্ষা। দরকার আরও একটু নিশ্চিত হয়ে বুঝে নেওয়া··

—তাই করুন, মিঃ চ্যাটার্জি। আমি জানি আপনি পারবেন। থ্যাঙ্ক য়ু অ্যান্ড গুড নাইট।

—গুড নাইট।

একটু যেন অবাক লাগে। কথা বলতে বলতে সুখেন্দু হঠাৎই টেলিফোনটা ছেড়ে দিলেন। কেতাদুরস্ত এটিকেট মানা সুরসিক মানুষটির পক্ষে যেটা স্বাভাবিক নয়। হয়তো সত্যিই টেন্‌স্‌ হয়ে আছেন কোনও কারণে।

অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম আসে না দেবদত্তর চোখে। নানা রকম এলোমেলো চিন্তা। হঠাৎ যেন নতুন দিকে মোড় নিচ্ছে হত্যা রহস্যটা! হত্যাকারীরা অন্ধকারে আত্মগোপন করে একের পর এক সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। উপযুক্ত মুহূর্তে শুধু মুখের ওপর আলোটা ফেলে তাকে সনাক্ত করা এখন।…কিন্তু তার উদ্দেশ্যটা? স্পষ্টভাবে বোঝা চাই আগে।…হয়তো তারও দেরি নেই আর। সেই সম্ভাবনাও উঁকি ঝুঁকি মারছে··

একটা অন্যরকম ছক ভেসে উঠছে মনের মধ্যে…এক অচেনা নতুন জগতের ছক। পর্দার আড়াল থেকে আলপনা!·· আলপনা, আত্রেয়ী, লছমি, অভয় আর শুরবাবুদের

জগৎ। ভোগবিলাস আর ফুর্তিতে ভরা পুরনো কলকাতার এক অদ্ভুত নৈশ জীবন। বুঝতে হবে ব্যাপারটা আরও ভাল করে··· ।

আলপনা থেকে আত্রেয়ী! সেই অল্পবয়েসি সুশ্রী ফুটফুটে মেয়েটা! শুরবাবু নিয়ে থিয়েটারে নামাল তাকে। মিষ্টি গানের গলা দেখতে সুন্দর।···

চন্দ্রগুপ্ত নাটকের দৃশ্য ঃ গাইতে গাইতে ভিক্ষুক ও ভিক্ষুকবালার প্রবেশ।··· ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে···

চাণক্য। কেন এমন হয়! এই বালিকার স্বর শুনে কেন এমন হয়!···

আত্রেয়ীর গলায় অপূর্ব মিষ্টি সুর। নবীন যৌবনের উচ্ছ্বাসভরা এক মাদকতা ঃ ওরে আয় চলে আয় আমার পাশে·· ।

গাইতে গাইতে ফুটলাইটের সামনে এসে দাঁড়ায়। মুখে জ্বল জ্বলে ফোকস···। সামনেই বক্সে বসা এক বাবু। মুগ্ধ কিশোরী আত্রেয়ীকে দেখে! অভিভূত তার গান শুনে। চোখ ফেরে না বাবুর!···

সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা, গোরাপানা মুখ, থিয়েটার পাগল এক বাবু···। আত্রেয়ীর জন্যে পাগল হয়ে ওঠা এক বাবু।···বার বার ঘুরে ফিরে আসে আলপনার দরজায়। নাটক জমে উঠল এবার মঞ্চের বাইরে, অন্য এক নাটক! ··

কিন্তু তারপর? সুতোটা ছিঁড়ে গেল। অন্যভাবে মোড় নিল কি গল্পটা?

আলপনা চলে গেল নতুন এক ঠিকানায়। জানা যাচ্ছে না, নাটকের পরিণতিটা কী।···কোথায় সেই বাবুটা? একটা পরিষ্কার ছবি না পাওয়া পর্যন্ত যেন কিছুতেই স্বস্তি নেই দেবদত্তর।

কেবলই ছটফছ করে। গভীর রাত পর্যন্ত চোখ বুজেও সে ছটফট করে বিছানায়।···

না আর দেরি নয়। পরদিন সকাল হতেই রাতুলের সঙ্গে আলপনার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে দেবদত্ত। পকেটে লছমির দেওয়া ঠিকানাটা। দুজনে গিয়েই খুঁজতে শুরু করে! আজ আর মহীতোষবাবু নেই।

অপরাধপ্রবণ অঞ্চল বলতে যা বোঝায় এ পাড়াটা ঠিক তার মধ্যে পড়ে না। তবুও কেমন গোলমেলে। পাঁচ মেশালি লোকের বাস চারদিকে। গোলক ধাঁধার মতো ঘোরানো গলি। অবশেষে খুঁজতে খুঁজতে তার মধ্যেই এক জায়গায় পাওয়া যায় ঠিকানাটা।

কিন্তু আলপনা নামে কেউ থাকে না এখানে·।

বাড়ির মালিক করমচাঁদ মেহমানি। এক বাঙালি বাবুর কাছ থেকে তিনি এটা খালি অবস্থায়ই কিনেছেন। এখন ওপরতলায় তিনিই আছেন পরিবার নিয়ে। নীচে চলছে তার মোটর পার্টসের কারবার। এর আগে কে ছিল, তিনি কিছুই জানেন না। আলপনা বাই নামে কোনও আউরত? তিনি নামও শোনেননি।

রাতুল পিছন ফিরে বলল, যাচ্চলে! শেষে তীরে এসে তরী ডুবল নাকি! লোকটা যে ধোয়া তুলসীপাতা একেবারে।

দেবদত্ত চুপ। মনে মনে ভেবে নিচ্ছে যেন কিছু একটা।

হঠাৎ বলল, চলো ঠাণ্ডা কিছু খাওয়া যাক, রাতুল। তেষ্টা পেয়েছে।

—ঠিক বলেছেন, আমারও। ওই তো দোকান, চলুন।

মোড়ের মাথায় বড় দোকান সোডা, লেমনেড, পান-বিড়ির। স্টেশনারিও আছে নানা রকম। রেডিও সিলোনের গান বাজছে।

জাঁদরেল চেহারার মালিক সামনেই বসে জলচৌকিতে। মস্ত বড় পাকানো গোঁফ। মাথা জোড়া টাক। মুখে তৃপ্তি ভরা অদ্ভুত হাসি হাসি ভাব।

দেবদত্তও হাসে একটু সামনে এসে, দুটো আইসক্রিম সোডা, লালাজি। ঠাণ্ডা হবে তো?

—জরুর বাবুজি। আভি দেতে হ্যায়।

—এই সকালেই আজ কী গরমটা পড়েছে, বলুন তো?

—হাঁ বাবুজি, বহত গরমি।

ছোট একটা ছেলে বোতল দুটো বের করে খুলে দেয় ফট্‌ফট্‌ করে। ভেতরে ডোবানো হলুদ স্ট্র।

দেবদত্ত স্ট্র ফেলে দিয়ে আস্তে আস্তে চুমুক দিয়ে গলা ভেজায়। আর টুকটাক আলাপ জমায় লালাজির সঙ্গে।

খাওয়া শেষ হলে দুটো মশলা পানেরও অর্ডার দেয় দরাজ ভঙ্গিতে। পরে এক প্যাকেট দামি ব্র্যাণ্ডের সিগারেট। এবং সব শেষে সিগারেটটা ধরিয়ে বলে, আলপনার কথা। আলপনা বাই।

লোকটা অবাক হয়ে দেবদত্তর দিকে তাকায়।

মতলব? আপ কিসকি বাত কর রহে?

—আপনি চিনতেন না? থিয়েটারের অভিনেত্রী। এখানেই ছিল অনেকদিন।

পিছনে একটা ট্যাক্সি ব্রেক করল বিকট শব্দে। দেববত্ত ফিরে তাকায়। ড্রাইভার নেমে এক প্যাকেট সিগারেট কিনল পাশে দাঁড়িয়ে। আর একটা লোক তালাচাবির খোঁজ করছে।

দেবদত্ত চুপ। লালাজি এদিক ওদিক সবার কথা শুনছে। তার মধ্যেও ঠিক লক্ষ দেবদত্ত আর রাতুলের দিকে।

ফাঁক দেখে দেবদত্ত আবার বলল স্বরটা নামিয়ে, আপনি তো নিশ্চয়ই চিনবেন। নাম করা অভিনেত্রী একজন, দেখতে শুনতেও ভাল। আমাদের খুব দরকার একবার দেখা-করার···অথচ দেখছি এখান থেকে চলে গেছে। যদি একটু সাহায্য করতেন।···

—আপনারা কি সিন্‌মা থিয়েটারের লোক আছেন বাবুজি ?

—হ্যাঁ ওই রকমই আর কী। ওই জন্যেই তো···।

লালাজি হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে থাকে একটু। কথাটা বিশ্বাসযোগ্যই যেন মনে হয় বাবুদের।

মাথা নেড়ে বলল, হাঁ বাবুজি মালুম হ্যায় হামকো। বহুৎ জান পহেচান ছিল আমার সঙ্গে। অনেক মাল কিনত বাই আমার এখান থেকে। বাজার থেকেও মাঙ্গাতে হত—সবই হামি করতাম।

—ও। তাহলে আপনি চেনেন !

—লেকিন থাকতে পারল না এখানে। দু একটা বাবু বড় তাঙ করত এসে। হল্লা শোর মচাত যখন তখন। তো বাই একদিন চুপচাপ মহল্লা ছেড়ে চলে গেল। বহুবাজারে। যাবার সময় শুধু আমাকে বলে গেল। সিন্‌মা থিয়েটারের কোই শরিফ আদমি হোনেসে উধার পাঠিয়ে দিতে। তো সাচ্চা আদমি কেউ খোঁজ খবর নিলে, হামি ভেজে দি।

—কৃপা করকে আমাদেরও তাহলে একটু সাহায্য করুন, লালাজি।

—হাঁ। বহুবাজার আর ওয়েলিন্‌টন কা মোড় পর বাঁ দিকের গলিতে ঢুকবেন। উত্তর দিকে—উখানে ছটুলালের পানের দোকান। বহুৎ বড়া দোকান আছে—উখানেই খোঁজ পাবেন।

—সুক্রিয়া লালাজি। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।

—শুধু বলবেন নীলা দেবীর সঙ্গে দেখা করব। সিন্‌মার লোক আছি আমরা।

—নীলা দেবী ! সে আবার কে ?

—হাঁ বাবুজি। ওটাই এখন নতুন নাম আছে আলপনা দেবীর।

রাতুল বলল, চিত্রতারকা নীলা দেবী বাহ্‌ ! বেশ চটকদার নাম নিয়েছেন তো মহিলা। হ্যাঁ হ্যাঁ একজন আছেন এই নামে !

দেবদত্তরও মনে হয় নামটা যেন দেখেছে দেখেছে। সিনেমার কোনও বিজ্ঞাপনে কি ?

নীলা দেবীর বাড়িটা খুঁজে পেতে খুব অসুবিধে হল না এবার। লালাজির নাম করে বলতেই ছটুলালের এক কর্মচারী উঠে দেখিয়ে দিল।

ট্যাক্সিটা ছেড়ে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল দুজনে।

ছাই রঙের পুরনো একতলা বাড়ি। শাড়ি ঝুলছে একখানা বেগনি রঙের ছাতের কার্নিশ বেয়ে। কোনও সাড়া শব্দ নেই ভিতরে। সাদা পাথরে লেখা বাড়ির নাম ঃ কুসুম কুটির।

দরজার আশে পাশে তাকিয়ে দেখে দেবদত্ত। না, কোথাও কোনও ডোরবেলের সুইচ চোখে পড়ে না। অগত্যা ভারী কড়াটা ধরেই নাড়ল খট্‌খট্‌ করে।

একটু পরেই দরজা খুলে দাঁড়ালেন মাঝবয়েসি এক চশমা পরা মহিলা। মার্জিত চেহারা। বললেন, কাকে চাই?

দেবদত্ত সোজাসুজি নিজের পরিচয় দেয় এবার।

—ও আচ্ছা। ভদ্রমহিলার মুখটা যেন শুকিয়ে গেল হঠাৎ, তবুও হাতজোড় করে হাসলেন, নমস্কার। আসুন, ভেতরে আসুন আপনারা—।

ঘরের মধ্যে সোফায় বসিয়ে ফ্যানটা খুলে দিলেন চটপট। নিজেও বসলেন সামনাসামনি।

তারপর চোখ তুলে বললেন, কিন্তু এখানে কী চান আপনারা?

—আমরা এসেছি এখানে, আলপনা মানে, নীলা দেবীর খোঁজে, আপনিই কি—।

—না না, আমি নই, ভদ্রমহিলা বেশ বিব্রত হয়ে বলেন, আমি শকুন্তলা; শকুন্তলা সেন। বলতে পারেন নীলার দিদির মতো। ওই কাজ-টাজ, অ্যাপয়েন্টমেন্ট, সামলাই আর কী।

—ওহ্‌ হো। নমস্কার। নীলা দেবীকে একটু ডাকুন তাহলে।

—কিন্তু নীলা তো এখানে নেই স্যার। পুরীতে গেছে—।

—পুরীতে? কবে ফিরবেন কলকাতায়?

—বলা মুশকিল। একটা নতুন ছবির শুটিং চলছে পুরীতে—তিন চার দিনের কাজ। কিন্তু কদিন লাগে শেষ পর্যন্ত ।

—পুরীতে শুটিং চলছে, না! দেবদত্ত নিজের মনেই বিড় বিড় করে, কিন্তু আমাদের প্রয়োজনটা যে খুবই জরুরি। তাহলে?

রাতুলের দিকে ফিরে বলল, সো, মাই ফ্রেন্ড। হোয়াট টু ডু নাও?

রাতুল কাঁধ ঝাঁকাল স্মার্ট ভঙ্গিতে, আর কী। লেটস্‌ গো দেয়ার।

—দ্যাটস্‌ ইট! শকুন্তলা দেবীর দিকে তাকাল দেবদত্ত, ওদের পুরীর ঠিকানা জানেন আপনি?

—আজ্ঞে কোন্‌ হোটেলে উঠবে তা তো জানি না। তবে সি-বিচেই যখন শুটিং হচ্ছে, খোঁজ পেয়ে যাবেন ঠিক আপনারা।

—কী ছবি, কিছু বলতে পারেন।

—বাংলা। নাম ঠিক হয়েছে আপাতত সাগরকন্যা।

—থ্যাঙ্ক য়ু ম্যাডাম! দেবদত্ত উঠে দাঁড়াল, প্রয়োজন হলে হয়তো আবার আসতে হবে আমাকে আপনার কাছে।

—নিশ্চয় আসবেন। হাত তুলে নমস্কার করলেন শকুন্তলা।

দেবদত্ত বলল, এবার তাহলে কোনদিকে, রাতুল?

—সোজা বুকিং অফিস, দাদা। টিকিট পেলে আজ রাত্তিরের ট্রেনেই উঠে পড়ব। না হলে কাল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পুরীর সি-বিচে। শুটিং দেখার চান্সটা আর মিস করতে চাই না, 'সাগরকন্যা'র।

দেবদত্ত হাসল, বেশ তাই চলো। ট্যাক্সি তো দাঁড়িয়েই আছে একটা তোমার জন্যে। আর দেরি কীসের?

কিন্তু তড়বড় করে এক পা এগিয়েই থেমে দাঁড়াল রাতুল। ট্যাক্সির ড্রাইভার অদ্ভুত দৃষ্টিতে এই দিকেই তাকিয়ে আছে। লোকটাকে যেন চেনা মনে হচ্ছে। তখন দুজন ছিল পাশাপাশি। এবার একজন। সেই গাড়িটাই কি?

দেবদত্তের হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বলে, দাদা ট্যাক্সিটা একটু ঝিন্‌চ্যাক্‌ মনে হচ্ছে।

—গোলমেলে? কী বলছ রাতুল!

—দেখুন একটু খেয়াল করে, লালাজির দোকানের সামনে এই গাড়িটাই দাঁড়িয়েছিল। আমরা এলামও এটায় করেই। তারপরও এখানে দাঁড়িয়ে আছে! নট্‌ নড়ন চড়ন! বেশ ফিশি ব্যাপার মনে হচ্ছে!

—ও ইয়েস, য়ু আর রাইট! তাই তো!

—আবার দেখছে কেমন বেবুনমুখো, কুত্‌কুত্‌ করে আমাদের।

দৃষ্টিটা সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ন হয়ে ওঠে দেবদত্তর। মুখের মাংসপেশিগুলো টান টান আর কঠিন।

এক পলক নজর করেই চিনতে পারে। হ্যাঁ! এই লোকটাই তো তখন সিগারেট কিনছিল তার পাশে দাঁড়িয়ে লালাজির দোকানে। এখন ভোল পাল্টে ফেলেছে। তখন টুপি ছিল একটা মাথায়, সামনের দিকে টানা। এখন সেটা নেই।

সঙ্গের ছোকরা দোসরটিও বেপাত্তা। রাস্তা দেখার ভান করে তাদের দিকেই দেখছে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে। লোকটা কে?

দেবদত্ত এগোতে এগোতে বিড়বিড় করে নিজের মনে, লোকটা কি তাহলে সকাল থেকেই পিছনে পিছনে ঘুরছে···শ্যাডো করছে আমাদের!···আশ্চর্য। কিন্তু ও কার লোক? ··হু ইজ দ্যাট কালপ্রিট?···

রাতুলও পাশ থেকে স্বর নামিয়ে বলতে থাকে নিজের মনে,···পার্টি যেই হোক, খুবই ধুরন্ধর একজন, দাদা···বোধহয় কাল থেকেই এই বেবুনমুখোকে পিছনে লাগিয়ে রেখেছে আমাদের···আগে জানলে ডজ্‌ করে বেরিয়ে যেতাম···।

—দাঁড়াও, আমি এখনই বার করছি সব। চলো রাতুল, এই ট্যাক্সিটাকেই ধরতে হবে আমাদের—উই মাস্ট। কাম অন্‌, কুইক—।

দুজনেই চলার বেগ বাড়ায়। লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলে।

তাদের এইভাবে আসতে দেখে বেবুনমুখো লোকটাও তড়াক করে সোজা হয়ে

বসল। কিছু যেন আঁচ করে সে। কটমট দৃষ্টিতে দেখল দেবদত্তকে একবার। তারপরই হঠাৎ গাড়িতে স্টার্ট দিল।

দেবদত্ত দৌড়ে এসে দরজাটা ধরবার আগেই ধোঁয়া ছেড়ে হুস করে বেরিয়ে গেল। ঝড়ের বেগে সোজা ওয়েলেসলির দিকে ছুটে যায় গাড়িটা।

১৮

অবশেষে পুরী।

মাঝখানে একটা দিন কেটে গেছে। দুটো রাত একটা দিন। তবু টান টান উত্তেজনায় ভরপুর দুজনে।

সন্ধের পুরী এক্সপ্রেস ছাড়ল কাঁটায় কাঁটায় সময় মিলিয়ে। দুজনেই সতর্ক। লক্ষ রাখতে ভোলে না, নতুন কেউ আবার নজর রাখছে কি না তাদের। পরদিন ভোরে স্টেশনে পৌঁছেও চুপচাপ বসে থাকে। নিশ্চিন্ত হয়ে নেয় একটু। তারপর একই হোটেলে আগে পিছনে আলাদা আলাদা হয়ে পৌঁছয়।

দূর থেকেই চোখে পড়ে য়ুক্যালিপটাসের ফাঁকে দিগন্তজোড়া বিশাল সমুদ্র। জমাট মেঘের মতো নীল। টলমল করে দুলছে। সেই চিব পরিচিত দৃশ্য!

আজ সকালবেলাতেই যেন খেপে উঠেছে সমুদ্র। দুরন্ত ঝোড়ো হাওয়ায় গোঁ গোঁ করা ডাক। বিশাল বিশাল ঢেউ ভাঙছে পাড়ে এসে। চারদিকে জমজমাট ট্যুরিস্টদের ভিড়। হই হই করে ঘুরছে দল বেঁধে। ঢেউয়ের ফেনায় পা ডোবাতে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটছে সামনে পিছনে। পাগলের মতো ছবি তুলছে পরপর। কেউ কেউ এমনিই বসে আছে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে। পাশাপাশি চুপচাপ।

নিঃশব্দে সেই ভিড়ের মধ্যে এসে এবার ওরাও মিশে যায়।

স্বভাবে তারা দুজনেই প্রকৃতি প্রেমিক। কিন্তু আজ আর সৌন্দর্য উপভোগের অবকাশ নেই। চোখ সেদিকে গিয়েও ফিরে ফিরে আসছে। চারদিকে সুন্দর সুন্দর তরুণ তরুণীদের ভিড়। মাতামাতি হট্টগোল! মন টানছে না তারাও।

লক্ষ্য তাদের এখন একটাই আপাতত। সেটা নীল সমুদ্র নয়। নীলা দেবী নামে এক চিত্রতারকা। এই সমুদ্রের পাড়েই যার ঠিকানা। এবং যার সন্ধানেই তাদের ছুটে আসা এতদূর।

হোটেল থেকে মুখ হাত ধুয়েই চটপট বেরিয়ে পড়েছে। রাস্তায় দাঁড়িয়েই খেয়ে নল হালকা কিছু সকালের খাবার। তারপর আর এক মুহূর্ত নষ্ট না করে

খোঁজা শুরু করেছে। সি-বিচের এক মাথা থেকে আর আর এক মাথা পর্যন্ত। কোথায় নীলা দেবী! কোথায় শ্যুটিং চলেছে সেই সাগরকন্যার?

চক্রতীর্থ থেকে শুরু করে স্বর্গদ্বারের শেষ পর্যন্ত পেঁছে যায়। ওপর-নীচে নজর রাখতে রাখতে তারপরও এগিয়ে যায় খানিক। সামনে শেষে শুধুই ঢেউ খেলানো বালির ঢিবি। বুনো ঝোপ-ঝাড়, ভগ্নস্তূপ। আর ধু ধু নির্জনতা। কোনও সাড়া নেই মানুষের। গুম্ গুম্ করে বুক কাঁপানো গর্জন শুধু সমুদ্রের।

সান হ্যাট পরা একটি মেয়েকে দেখা যায়। হাত ধরাধরি করে এক যুবকের সঙ্গে আরও দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার পিছনে ফেরে দেবদত্ত। একটা তাঁবু খাটানো চোখে পড়ে নীলাচলের দিকে। কিন্তু কাছে এসে দেখে ফাঁকা। হাওয়ায় পত্‌পত্‌ করে উড়ছে সামিয়ানার ঝালর। কেউ ছিল হয়তো, এখন আর নেই।

তবে কি সাগরকন্যার শ্যুটিং শেষ হয়ে গেছে, সি বিচে? ইউনিট প্যাক্ আপ করে চলে গেছে অন্য কোথাও? অসম্ভব নয়।

রোদের তেজ বেড়ে উঠল দেখতে দেখতে। তবুও হাল ছাড়ে না দেবদত্ত। ঘুরে ঘুরে খোঁজটা চলতেই থাকে। আলাপ জমিয়ে কথায় কথায় খবর নেয় সমুদ্র সৈকতের ফিরিওয়ালাদের কাছে। নুলিয়াদের কাছে।

বলে, সিনেমার শ্যুটিং কোথায় হচ্ছে, ভাই? বাংলা সিনেমার শ্যুটিং। দেখেছ নাকি। কোথাও। আজি বা কালি?

এভাবেই একসময় খোঁজ পাওয়া গেল হঠাৎ। জানা গেল, হ্যাঁ হ্যাঁ। শ্যুটিঙের জন্যে একটা পার্টি এসেছিল কলকাতা থেকে। সি-বিচে কাজও হল একদিন। ভোরবেলা ভিড় সামলাতে পুলিশে ভরে গিয়েছিল স্বর্গদ্বার···কিন্তু তারপর আর কিছু হল না।

—একদিন শ্যুটিং করেই চলে গেছে তারা। আর নেই এখানে।

—চলে গেছে! গুড গড! কোথায় চলে গেছে?

লোকটা বলল, সে খবর তো আমি জানি না বাবু। তবে ম্যানেজার বিনোদ পণ্ডা বলিতে পারিবে। জগন্নাথের মন্দিরের কাছে গিয়ে খোঁজ করুন, ম্যানেজার বিনোদ পণ্ডা। নামটা বললেই সবাই দেখিয়ে দেবে।

সঙ্গে সঙ্গেই মন্দিরের দিকে ছোটে দুজনে। কোথায় ফিল্ম কোম্পানির সেই স্থানীয় ম্যানেজার বিনোদ পণ্ডা। সাগরকন্যার শ্যুটিঙের দায়িত্বে যিনি ছিলেন এখানে।

সহজেই অবশ্য পাওয়া গেল তাঁকে। বেশ সজ্জন ব্যক্তি। সকালবেলায় চান টান করে ফোঁটা-তিলক কেটে বসে আছেন অফিসে। কলকাতা থেকে শ্যুটিঙের

সঙ্গে জড়ানো ব্যাপারেই লোক এসেছে জেনে খুবই খাতির দেখালেন। বললেন, আসুন, আসুন, নমস্কার। কী খাবেন বলুন আপনারা ?

দেবদত্ত ধন্যবাদ দিয়ে আগে শ্যুটিং ইউনিটের খবরটা জানতে চায়। কোথায় গেল তারা ! আসতে দুদিন লেট করে ফেলেছে। এখন আর কোথাও খোঁজ পাচ্ছে না অথচ খুবই জরুরি একটা কাজ···যদি অনুগ্রহ করে পণ্ডাবাবু একটু সাহায্য করেন

—নিশ্চয় ! কী বলছেন আপনি ! এই তো আমাদের কাজ আছে, স্যার। বিনোদবাবু খুবই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন যেন।

তারপর খুলে বললেন এখানকার সব ঘটনাটা। ছবিতে একটা জেলেদের গ্রাম চাই সমুদ্রের পাড়ে। স্ক্রিপ্টে তাইই আছে। যেখানে 'সাগরকন্যা' মানে আপনাদের নীলা দেবীর সঙ্গে দেখা হবে ওদের। সি-বিচে বেড়াতে আসা নায়ক-নায়িকা জুটির। গ্রামটাই আসল·· । ভিলেজ থেকে বেরিয়ে ছুটতে ছুটতে এগিয়ে যাচ্ছে সাগবকন্যা···সমুদ্রে ঝড উঠেছে···নৌকোগুলো ডুবে যাচ্ছে। ভেসে উঠছে—। সেই দিকেই ছুটছে দুহাত মাথার ওপর তুলে চারদিকে বালিয়াড়ি, বালির ঝড় ;··· ঝাউবন, নায়িকা···সমুদ্র···উত্তাল সমুদ্র··

এই রকমই একটা সিকোয়েন্স আছে আপনাদের। ভীষণ ড্র্যামাটিক একটা শট। ক্যামেবা প্যান করতে করতে সমুদ্রের ওপর স্থির হয়ে যাবে। তারপরই আবার ঝড়ের মধ্যে একা সাগরকন্যা···। তা এখানে ঠিক সুবিধে হল না পুরোটা। সি খুবই রাফ ছিল। অন্য অনেকগুলো শট হল অবশ্য। ভালই হল। কিন্তু গ্রামের দৃশ্যটার জন্যে আমি বললাম গোপালপুরের কথা।

—গোপালপুর ! দেবদত্ত বলল।

—গোপালপুর-অন-সি। রাতুল স্বগতোক্তি করে সঙ্গে।

—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। গোপালপুবে ব্যাকওয়াটারের পিছনে জেলেদের সুন্দব সুন্দর গ্রাম আছে। একটা ঝাউবনের মধ্যে, একেবারে সমুদ্রের কিনারে।

—ব্যাকওয়াটারের পিছনে ?

—হ্যাঁ। সেখানেই মনে হল, দারুণ খুলবে শট্‌টা। তাই বললাম। লোকাল কালারও আসবে সুন্দর। তাছাড়া এখানকার মতো পাবলিকেরও কোনও ভিড়ভাট্টা নেই। ট্যুরিস্টদেরও ডিস্‌টার্ব্যানস নেই। একদম আইডিয়াল লোকেশান ··। তখন সর্বদিক ভেবেচিন্তে হেমন্তবাবু ইউনিট নিয়ে সেখানেই চলে গেছেন। আমি আর যেতে পারিনি কাজের চাপে···

—গোপালপুরে ওরা কোথায় উঠবে, জানেন কিছু।

—পামবিচ হোটেলে আর্টিস্টরা। বাকিরা অন্য কোথাও।

—আই সি !

—একটা জিপ নিয়ে আপনারাও বেরিয়ে পড়ুন। দেখা হয়ে যাবে। আমিই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

পরে হাতঘড়ি দেখে বললেন, সোজা লোকেশানেই চলে যাবেন একেবারে। মনে হয়, ওখানেই ধরতে পারবেন সবাইকে।

—থ্যাঙ্ক য়ু মিঃ পণ্ডা। তাহলে তো খুবই ভাল হয়।

একটুক্ষণের মধ্যেই সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। জিপ নিয়ে হাজির হল হাসিখুশি এক যুবক। মাথায় টুপি, চোখে শৌখিন সানগ্লাস।

দেবদত্ত খুঁটিয়ে লক্ষ করে ছেলেটাকে।

পণ্ডা বললেন, করিম, আগে তুমি ব্যাকওয়াটারে লোকেশানেই নিয়ে যাবে সাহেবদের। তাড়াতাড়ি করলে পেয়ে যাবে।

করিম ঘাড় নাড়ল।

পণ্ডা বললেন, যান, কোনও চিন্তা নেই আপনাদের। করিম আমাদের পাকা ড্রাইভার। ঠিক পেঁছে দেবে।

পণ্ডা ভুল বলেননি। করিম ঝড়ের গতিতে প্রায় উড়িয়েই নিয়ে এল জিপটা। তিনটে বাজতে তখনও প্রায় আধ ঘণ্টা বাকি। রাস্তায় খাওয়ার জন্যে মিনিট কুড়ি না থামলে আরও আগে পেঁছে দিত। সত্যিই খুব পাকা ড্রাইভার!

ভাড়া মিটিয়ে দেবদত্ত বেশ মোটা বখশিস করে ছেলেটাকে। করিম এক গাল হেসে লম্বা সেলাম করে সাহেবদের।

কাছেই সমুদ্রের ব্যাকওয়াটার। কবে একদিন গোপালপুরের সমুদ্র ফুলে ফেঁপে উঠে পিছনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ডুবিয়ে দিয়েছিল। পরে আবার শান্ত হয়ে নেমে গেছে সমুদ্র। কিন্তু পশ্চাৎভূমির বিরাট অঞ্চল জুড়ে সেই জল এখনও রয়ে গেছে প্রকাণ্ড এক বাঁওড়ের মতো।

অথবা সুন্দর এক সরোবর যেন সি-বিচের পিছনে। সমুদ্রের সঙ্গে যার যোগ আজও বিচ্ছিন্ন হয়নি। সি-বিচ থেকে নীচে নেমে এই ব্যাকওয়াটারের পাশেও ঘুরতে আসে ট্যুরিস্টরা। জেলেরা মাছ ধরে দল বেঁধে। মিঠে জলের মাছ। এ এক আলাদা আকর্ষণ গোপালপুরের।

করিমকে ছেড়ে দিয়ে এবার সেই ব্যাকওয়াটারের পাড়েই এসে দাঁড়াল ওরা।

এখানেও সমুদ্রের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে চলেছে যেন। ব্যাক ওয়াটারের পাশে বেগটা সামান্য কম। তবু হু হু করে তীব্র হাওয়া দিচ্ছে পিছন থেকে। কানে-মুখে এসে বিঁধছে তপ্ত বালির ঝড়। কথা বলতে বলতে সমুদ্রের দিকে ফিরলে, কথা উড়ে যায়। দম আটকে আসে হাওয়ায়।

সমুদ্রের চেহারা সত্যিই বড় উত্তাল আজ। যতদূর দৃষ্টি যায় ফেনায় আর ঢেউয়ে মাখামাখি হয়ে শুধুই গজরাচ্ছে ক্রমাগত।

ব্যাকওয়াটারের জলেও বেশ ঢেউ ভাঙছে এদিকে। তার মধ্যেও জেলেরা মাছ ধরছে ছিপ নিয়ে। জাল টেনে টেনে।

একটা নৌকো আসছে যাত্রী নিয়ে ব্যাক ওয়াটারের ওপারের গ্রাম থেকে। তার জন্যেই অপেক্ষা। ওটাতেই পার হয়ে যেতে হবে তাদের। তারপর সেই গ্রাম। বাচ্চা একটা ছেলেকে সঙ্গে জুটিয়ে ফেলেছে রাতুল। দশটা টাকা হাতে পেয়ে খুব খুশি। ছিপ বঁড়শি ফেলে উঠে পড়েছে। সে-ই পথ ঘাট সব চিনিয়ে দেবে সঙ্গে থেকে।

নৌকোটা পাড় পর্যন্ত এল না। ছেলেটা অবলীলাক্রমে পেণ্টুল খুলে জলে নেমে ছপ ছপ করে এগিয়ে গেল। একলাফে চড়ে বসল, গলুইয়ের ওপর।

রাতুল আর দেবদত্তকে অগত্যা প্যাণ্ট গুটিয়ে জুতো হাতে এগোতে হল। মাঝিরা হাত বাড়িয়ে উঠতে সাহায্য করে বাবুদের। তারপর এক ঠেলায় আবার ভাসিয়ে দেয় নৌকো। জলের ওপর বেশ ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা। মাছ লাফিয়ে উঠছে টুপটাপ। তারপর দেখতে দেখতেই ওপার!

এক অন্যরকম সুন্দর দৃশ্য এদিকে। ঢেউ-খেলানো ছোট ছোট টিলা পাহাড়ের মতো বালিয়াড়ি। থোকা থোকা বুনো কাঁটা ঘাস। আর তার চারিদিকে বিচিত্র নকশার মতো সোনালি বালির আঁচড়। হওয়ার তোড়ে নকশাটা বদলে যাচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। ওদিকে ঝাউবনের শেষে সমুদ্রের উন্মত্ত গর্জন। আর এ পারে এক খেয়ালি শিল্পীর বালির আঁচড় টেনে টেনে নিরন্তর ছবি বানানোর খেলা! চলছে তো চলছেই। কত কাল ধরে চলছে!

টিলাটা পার হতেই দেখা গেল একটা গ্রাম। গাছগাছালি ভরা। তার এ পাশেই তাঁবু পড়েছে। লোকজন ঘোরাঘুরি করছে। ঝাউবনের দিকে লম্বা এলো-চুলে দুলতে দুলতে হাঁটছে কপালকুণ্ডলা স্টাইলের একটি মেয়ে। সমুদ্র দেখছে। সঙ্গে বড় বড় রিফ্লেক্টর কাঁধে দু তিন জন লোক। পিছনে আরও একটা দল।

ছেলেটা হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠল হুই—সেইটা অছি!

—সাবাস জোয়ান। রাতুল পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল। চল্ এইবার তোকে বাংলা সিনেমার শ্যুটিং দেখাব। দেখেছিস কখনও?

ছেলেটা মাথা নাড়ে দুপাশে হাসতে হাসতে।

খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেল শ্যুটিংয়ের কাজ আজকের মতো প্রায় শেষ। সূর্যাস্তের ব্যাকগ্রাউণ্ডে নায়ক-নায়িকার কয়েকটা শট নিয়ে প্যাক আপ করবে ইউনিট।

নীলা দেবীর কোনও কাজ নেই আর। সকাল থেকে প্রায় একটানা শ্যুটিং করছেন। জলে ঝাঁপিয়ে নায়ককে বাঁচানোর দৃশ্যটাই টেক হয়েছে প্রায় দশ বারোবার। কাল সকালেই শুরু হবে আবার গানের সঙ্গে তাঁর নাচের একটা টেক। এখন

বিশ্রাম নিচ্ছেন আলাদা ঘরে বসে। খুবই পরিশ্রান্ত। না, বাইরের কোনও ভিজিটারের সঙ্গে এখন দেখা-টেখা করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

রাতুল হাত কচলে বলে, খুবই খাঁটি কথা। কিন্তু আমরা যে অনেকদূর থেকে ছুটে এসেছি দাদা। দেখা যে করতেই হবে।

ম্যানেজার মুরারি হালদার মেজাজ দেখিয়ে বলেন, তার জন্যে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করে হোটেলে আসতে হবে। যদি ম্যাডাম অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দেন। লোকেশানের মধ্যে কিছু হবে না। বাইরের কোনও লোককে ঢুকতে দেবার নিয়ম নেই এখানে

দেবদত্ত বলল, আই সি! তাই নাকি?

হালদার এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, কিছু মনে করবেন না ভাই। বোঝেন তো, আমাদের সব নানারকম নিয়ম কানুন মেনে চলতে হয়। সবার আগে হল ডিসিপ্লিন। ইউনিটে যদি ডিসিপ্লিন না থাকল, তবে জানবেন ছবির ভবিষ্যৎও অন্ধকার। দেখছেন না, আজকাল বাংলা ছবির হাল আপনারা? এই জন্যেই তো।

রাতুল হাসল, তা আর বলতে? চোখ বন্ধ করেও দেখতে পাচ্ছি!

—অ্যাঁ? হেঁ-হেঁ, যা বলেছেন। তা মশাই আপনারা কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছেন, নিশ্চয় দেখা করবেন নীলা দেবীর সঙ্গে।

হালদার মুঠো করে লম্বা টান দেন সিগারেটে। যেন চিন্তা করলেন বিষয়টা।

তারপর বললেন, আপনারা মশাই রাতের দিকে হোটেলেই চলে আসুন। তবে বেশি রাত করবেন না যেন। তাহলে কাকে যে কী মুডে দেখবেন, কোনও ঠিক নেই।

বলেই একটু মুচকি হাসলেন।

দেবদত্ত মাথা নাড়ল, না, তা হচ্ছে না মিঃ হালদার। অপেক্ষা করা আর সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে। এখনই করতে হবে যা করার।

বাধ্য হয়ে নিজের কার্ডটা তুলে দিল এবার ভদ্রলোকের হাতে।

চেষ্টা করছিল এতক্ষণ তার উদ্দেশ্য এবং পরিচয়টা গোপন রাখতে। কিন্তু মুরারিবাবুর খবরদারিতে বাধ্য হয়েই সরাসরি জানিয়ে দিল সব। এবং ফলও ফলল হাতে হাতে।

একেবারে ফিউজ হয়ে গেলেন ম্যানেজারবাবু। চোখে মুখে ভয়।

বললেন, কী সর্বনাশ! সে কী বলছেন, স্যার! কী সর্বনাশ!

—এতে আপনার সর্বনাশের কোনও কারণ নেই, মিঃ হালদার। আপনার ছবিরও নয়। শুধু খানিকক্ষণের জন্য নীলা দেবীর সঙ্গে একটু আলাদা কথা বলব আমি। তারপর যেমন চলছে, চলবে আপনার ছবির কাজ।

ভড়কে যাওয়া ভাবটা তবু কাটে না হালদারবাবুর। বুঝতে পারছেন না, কোথা থেকে কতদূর গড়াবে শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা। মাঝপথেই ভণ্ডুল না হয়ে যায় সাগরকন্যার কাজ! ফ্যাল ফ্যাল কবে তাকিয়ে থাকেন ভদ্রলোক।

দেবদত্ত বলল, এবার একটু তাডাতাড়ি করুন হালদারবাবু। খবর দিন নীলা দেবীকে। বলবেন, কলকাতা থেকে দুজন লোক এসেছেন, জরুরি কিছু কথা বলতে।

—হ্যাঁ স্যার, নিশ্চয়ই! আমি এখনই যাচ্ছি।

রাতুল ততক্ষণে টিলার মাথায় দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখছে। অদ্ভুত লাগছে এখান থেকে। দারুণ! দারুণ। নিজেব মনেই বলল একবার। ছেলেটা ঝিনুক কুড়োতে শুরু কবেছে বালির মধ্যে। জঙ্গলের মধ্যে ক্যামেরা ঘাড়ে ঘুরছে ওরা। অ্যাঙ্গেল খুঁজছে হয়তো পছন্দমতো। অসম্ভব টালমাটাল হয়ে যেন এখানে ফুলে ফুলে উঠছে সমুদ্র। ঝাউবনের শাঁ শাঁ শব্দের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে তার অদ্ভুত গর্জন।

একটু পরেই হালদার ঘুরে এসে বললেন, আসুন স্যার। আসুন—।

নীচে নেমে গ্রামের দিকেই চললেন। একটা টিনের চালা ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। খড়ের ওপর গোল ছাতার মতো টিনের ছাউনি। দরজায় নকশা করা নতুন ভারী পর্দা ঝুলছে। মনে হয় সিনেমা কোম্পানি ভাডা নিয়ে ঘরটা নিজেদের মতো সাজিয়ে নিয়েছে।

- ম্যাডাম আমরা আসছি—

বাইরে থেকে সাড়া দিলেন হালদারবাবু। তারপর আগে আগে ঢুকলেন। পিছনে দেবদত্ত আর রাতুল।

তাদের ঢুকতে দেখেই উঠে দাঁড়ালেন একজন মহিলা। বেশ সুশ্রী সুন্দর চেহারা। চোখে পড়ার মতোই শরীরের গড়ন। ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে একটা সিনেমা পত্রিকা ওলটাচ্ছিলেন!

হালদার বললেন, এই, ইনিই নীলা দেবী, স্যার।

নীলা দেবীর চোখে কটাক্ষ। মৃদু হেসে বললেন, নমস্কার।

হালদার বললেন, কলকাতা থেকে দেখা করতে এসেছেন। ইনি হলেন মিঃ দেবদত্ত চ্যাটার্জি, আর ইনি হলেন···

—রাতুল সেন। রাতুল হাসল, সপ্রতিভ ভঙ্গিতে নমস্কার করে।

নীলা দেবীও হাসলেন হাত জোড় করে। বললেন, বসুন আপনারা, প্লিজ। এ ঘরে তো পাখা নেই, আপনাদের কষ্ট হবে। এটা নিন বরং···

একখানা সুন্দর শৌখিন হাত পাখা বাড়িয়ে দিলেন।

দেবদত্ত অবাক হয়ে দেখছিল। ইনিই সেই আলপনা! চন্দ্রগুপ্ত নাটকের

সেদিনের পাগল করা কিশোরী নায়িকা—আত্রেয়ী! দর্শকরা উচ্ছ্বসিত, গোরা-পানা এক বাবু পাগল, যাকে দেখে। এখন প্রায় মধ্যতিরিশে পৌঁছানো এই অদ্ভুত পোশাক পরা সাগরকন্যার মধ্যে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তা সম্ভবও নয়।

তবু যেন কিছু আছে! নদী মরলেও যেমন তার রেখাটা ফেলে যায় পিছনে। নীলা দেবীর দৃষ্টিতে হাসির মধ্যে যেন তেমনি কী এক আকর্ষণ জেগে আছে এখনও।

হালদারবাবু বললেন, আমি যাই। আপনাদের একটু চায়ের ব্যবস্থা করি।

দেবদত্ত কোনও উত্তর দেয় না। মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে সম্মতি জানায় শুধু।

নীলা দেবীও অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তার দিকে। মুখে মুছে ফেলা মেক আপের রঙ। পটের মতো আঁকা দুটো গভীর চোখ। একই সঙ্গে কৌতূহল আর অজানা কোনও আশঙ্কায় টল টল করে কাঁপছে।

দেবদত্ত বলল, আপনাকে বোধ হয় একটু বিরক্ত করলাম, আলপনা দেবী! কিন্তু এ ছাড়া কোনও উপায় নেই আমার। ক্ষমা করবেন—।

হঠাৎ যেন চমকে উঠলেন নীলা দেবী। ভ্রূ দুটো ঝাঁকুনি খেয়ে টান টান। বললেন, আপনি বোধ হয় ভুল করছেন। আমার নাম নীলা।

—না ম্যাডাম, দেবদত্ত মৃদু হাসল, আমি ভুল করিনি। আমি জানি আপনি আলপনা! চন্দ্রগুপ্ত নাটকে এককালের সাড়া জাগানো অভিনেত্রী—আত্রেয়ী!

নীলা দেবীর জ্বল জ্বলে মুখটা বিবর্ণ দেখায় সহসা, না না, এ সব কী বলছেন আপনি? আমি···

—যা সত্যি তাই বলছি। ভুল বুঝবেন না আমাকে, আমি কোনও ক্ষতি করতে চাই না আপনার। শুধু কয়েকটা কথা জানতে চাই। তার জন্যেই আপনাকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছি আমরা।

—কেন বলুন তো? নীলা দেবীর চোখ দুটো ফেটে পড়ছে কেতৃহলে, কী চান আপনারা আমার কাছে!

—একটাই প্রশ্ন আলপনা দেবী, আপনি বুধু পাগলাকে চিনতেন?

—বু-ধু পা-গ-লা! না তো, মনে করতে পারছি না। সে কে? কার কথা বলেছেন আপনারা?

ব্যাগ থেকে রাতুলের তোলা ছবিটা বের করল দেবদত্ত। বলল, এটা দেখুন তো আপনি।

মাটিতে শোয়ানো মৃত পাগলার একটা এনলার্জ করা ছবি। চোখ দুটো বুজিয়ে স্বাভাবিক করে দেওয়া।

নীলা দেবী ভীষণ কৌতূহলে তাড়াতাড়ি ছবিটা নিয়ে দেখতে থাকেন। মুখে কোনও কথা নেই। অবাক হয়ে দেখছেন। চোখ দুটো স্থির, পলকহীন। হঠাৎ গভীর নিশ্বাস ফেললেন যেন।

দেবদত্ত বলল, ম্যাডাম, আপনার কথার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। ঠিক করে বলুন, আপনি কি চেনেন এই পাগল লোকটা কে?

চোখ দুটো ততক্ষণে ঝাপসা হয়ে এসেছে আলপনার। ধরা গলায় বললেন, এ তো পাগল নয়, এ যে সুধাবাবু! সুধাকান্ত দত্ত! উঃ মাগো! ওঁর এই দশা কী করে হল?

দেবদত্ত বলল, ওঁকে খুন করা হয়েছে নীলা দেবী।

১৯

সামনে রাখা চায়ের কাপটা কখন জুড়িয়ে জল হয়ে গেল। নীলা দেবী একবারও চুমুক দিলেন না। কোনও খেয়াল নেই।

নিস্পন্দ স্থির দৃষ্টিতে কোথায় কত দূরে যেন ভেসে বেড়াচ্ছে তাঁর মন।

দেবদত্ত অপেক্ষা করে। সময় দেয় তাঁকে সামলে নিতে একটু। ব্যাপারটা যে শেষে এত দূর গড়াবে ভাবতে পারেনি।

ছবিটা দেখতে দেখতে হঠাৎই যেন ভেঙে পড়লেন তিনি। লাস্যময়ী সাগরকন্যার চোখের কোণ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে নামতে লাগল। দীর্ঘ নিশ্বাসও পড়ল ঘন ঘন। চোখ দুটো লাল, ছলছলে। বারবার রুমাল চাপা দিচ্ছেন।

দেবদত্ত, রাতুল দুজনেই যেন অপ্রস্তুত। কেউ কোনও কথা বলে না।

কিন্তু তারপর হঠাৎ করেই একসময় তিনি সামলে নিলেন নিজেকে। চোখ মুছে বেশ শান্ত হয়েই তাকালেন। বললেন, সরি, কিছু মনে করবেন না। একটু আপসেট হয়ে পড়েছিলাম।

—না জেনে, বোধ হয় আমিই কষ্ট দিলাম আপনাকে, মাপ করবেন। দেবদত্ত বলল মৃদু গলায়।

—না, না, ঠিক আছে। বলুন, আর কী জানতে চান। আজ আর কোনও কথাই গোপন করব না আপনার কাছে।

—থ্যাংক য়ু ম্যাডাম। আমার সবচেয়ে বড় প্রশ্নের উত্তরটা তো আমি পেয়েই গেছি।

—কোনটা?

—এই ছবিটা যে সুধাকান্তবাবুর সে বিষয়ে আপনার কোনও সন্দেহ নেই। ঠিক তো?

—হ্যাঁ। আমার কোনও দিন ভুল হবে না ওই মুখটা চিনতে। তা সে যতই

বদলাক···আমার যে সব জানা···বলতে বলতে আবার ফোঁস করে নিশ্বাস ফেললেন।

দেবদত্ত কিছু বলতে গিয়েও থামল। চোখদুটো আবার চিক চিক করে উঠেছে নীলা দেবীর। শূন্য উদাস দৃষ্টিতে কী ভাবছেন যেন মনে মনে।

কিন্তু মাত্র মুহূর্তের জন্যেই। পরক্ষণেই আবার স্বাভাবিক কথাবার্তা বলতে লাগলেন। পাকা অভিনেত্রী বটে। মনের আবেগটা চেপে আবার হাসলেনও একটু। পরের পর প্রশ্নের জবাব দিতে শুরু করলেন।

অনেকক্ষণ ধরেই তাঁকে জেরা করে দেবদত্ত। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক প্রশ্ন। কিন্তু নীলা দেবীকে আর দুর্বল হতে দেখা যায় না। সব সংকোচ ঝেড়ে ফেলেই নিজের কথা অকপটে বলতে থাকেন।

রাতুল যেন দম ফেলতে পারছে না। অদ্ভুত অদ্ভুত সব কাহিনী। মাথা নামিয়ে ডায়েরির পাতায় একমনে খসখস করে লিখে চলেছে।

প্রশ্ন করতে করতে দেবদত্ত একবার নিজেই থমকাল, সে কী! আপনি আগে কিছুই জানতেন না, ব্যাপারটা ?

নীলা মাথা নাড়লেন, না। আর বিয়ে মানে, সে এক অদ্ভুত বিয়ে! ভাবলে এখনও অবাক লাগে আমার···

—কী করে তা হলে হল, ব্যাপারটা ?

—সুধাবাবু মাঝে মাঝেই বেড়াতে নিয়ে যেতেন আমাকে, চিড়িয়াখানা, জাদুঘর, গঙ্গারঘাট, দক্ষিণেশ্বর··· । তা একদিন সকালে বললেন, চলো আত্রেয়ী, কালীঘাটে নিয়ে যাব আজ তোমাকে। যাবে ?

মনটা খুশিতে ভরে গেল আমার। এর আগেকখনও কালীঘাট যাইনি আমি···

—তারপর কী হল ?

—সকালবেলায় চানটান করে বাবুর সঙ্গে কালীঘাটের মন্দিরে গেলাম। পুজো দেওয়ার ডালা কিনলাম। কিন্তু হঠাৎ কী হয়ে গেল! একটা পাণ্ডা ঠিক করা ছিল আগে থেকে। হঠাৎ সে কোথা থেকে এসে আমার মাথায় সিঁদুর লেপে মন্ত্র পড়তে লাগল। বাবুর হাত ধরেও সিঁদুর পরাল। মালা বদলও করিয়ে দিল প্রায় জোর করে·· তারপর বলল, এসো এবারজোড়ে প্রণাম করো মাকে। তারপর প্রসাদ পাবে···

—কী করলেন তখন ?

—আমরা জোড়ে প্রণাম করলাম মাকে···একটা অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে যেন ঘটে গেল সব···বুকের মধ্যে ঢিব ঢিব করছে ভয়। উত্তেজনা···অথচ আমি কিছুই জানি না এর। ভাবতেও পারছি না···

—আপনার ইচ্ছেটা তো ছিল মনে মনে বিয়ের ? না, কি ?

—বোধ হয়, না। আমি কখনোই চাইনি এটা।

—কেন? বিয়ে-থা করে একটা সুন্দর সুখের সংসার পাততে ইচ্ছে হত না আপনার?

নীলার মুখে ম্লান হাসি ফোটে এক টুকরো।

মাথা নেড়ে বললেন, না। চাইলেই কি পাওয়া যায় সব জিনিস? না আমিই পেয়েছিলাম। থাক ও সব কথা। অন্য কথা বলুন।

—অভিনেত্রী হওয়ার শখটাই বোধ হয় বরাবর বড় ছিল আপনার।

—ঠিক বলেছেন। সবাই বলত আমি খুব নাম করা শিল্পী হবো একদিন। স্টেজে দাঁড়িয়েও টের পেতাম দর্শকদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেছে। ঘন ঘন হাত-তালিতে ফেটে পড়ছে হাউস·· ওহ্! এক স্বপ্নের মতো ছিল যেন সব···তার মধ্যে শুরবাবু আবার কানের কাছে সমানে মন্ত্র পড়ে চলেছেন, ওরে আরও দরদ ঢেলে দে গানে, ডায়লগের ওঠানামার সঙ্গে লাস্য ফুটিয়ে তোল চোখে মুখে আগুন ছিটিয়ে দে · তুই পারবি রে একদিন ঠিক পারবি

—শুরবাবু কে?

—থিয়েটারের লোক। তিনিই আমাকে স্টেজে নামিয়েছিলেন। মাঝে মধ্যে ছোটখাট পার্ট করতেন। গান শেখাতেন নাটকের, বাজনাও বাজাতে পারতেন সব রকম। আসলে এটাই ছিল তাঁর ঘরবাড়ি

—একটা কথা। সুধাবাবুর সঙ্গে যখন এত মেলামেশা আপনার, তখন শুরবাবু কিছু বলেননি? মানে, কোনও ঝগডাঝাটি বা রেষারেষি দুজনের মধ্যে? কিছু মনে করবেন না, প্রশ্নটা করলাম বলে।

—না. না, নীলা ম্লান হাসলেন মাথা নেড়ে, এত অল্পেতে কিছু মনে করলে কি আমাদের চলে! গায়ের চামড়াটা অনেক পুরু হয়ে গেছে, চ্যাটার্জিবাবু!

—ছি ছি! আমি সেভাবে কিছু বলতে চাইনি আপনাকে।

—জানি। আপনি তা বলছেন না। মনের দুঃখেই বলে ফেলি।

একটু চুপ করে থাকেন নীলা। চোখদুটো উদাস। দরজার বাইরে সমুদ্রের চাপা গর্জন হেঁকে যাচ্ছে। কোন্ দূর অতীতের এক গোপন হাহাকারের মতো। কিন্তু সেদিকে আর কারও কান নেই এখন।

হঠাৎ নিজের মনেই আবার বলতে থাকেন নীলা দেবী, সুধাবাবু একা কেন, প্লে ভাঙলে অনেক বাবুই ঘুরেছেন আমার আশেপাশে···কজনের কথা বলব? কারও মোটরগাড়ি, কারও জুড়ি গাড়ি,···কেউ বাড়িরও লোভ দেখাচ্ছেন একখানা বরানগরে···শুরবাবু আর কজনের সঙ্গে লড়বেন। আর কার জন্যেই বা লড়বেন। আত্রেয়ী তো আর কচি মেয়েটি নেই তখন ··সে অনেক কিছু বুঝতে শিখেছে··· শুরবাবুও বুঝে নিয়েছেন যা বোঝার···

—তবু তার মধ্যে, সুধাকান্তবাবুর সঙ্গেই আপনার সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠ হল কেন? কোনও কারণ ছিল নিশ্চয়?

—জানি না। আজ আর বলতে পারব না সে কথা। তবে তিনি সবার চেয়ে একটু আলাদাই ছিলেন…শিল্পী মনের মানুষ। গান, নাটক, অভিনয়…সব প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন।……

—স্টেজে দেখেই কি প্রথম আলাপ আপনার সঙ্গে?

—হ্যাঁ, সেই প্রথম। তারপর দিনের পর দিন বক্সে বসে অভিনয় দেখেছেন আমার। সত্যি, কী পাগল লোক ছিলেন! রোজ দেখতাম সেই দুটো চোখ তাকিয়ে আছে আমার দিকে। বুকের মধ্যে কেঁপে উঠত যেন মাঝে মাঝে। তারপর অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। শেষে তাঁকে না দেখলেই খালি খালি মনে হত হাউস… মন বসত না আমার প্লেতে…

—কিন্তু আপনি কি তখন জানতেন, সুধাবাবু মানুষটা কে? কোথায় তাঁর বাড়ি?

—না, কিছুই না। পরে আস্তে আস্তে জেনেছিলাম। জমিদার বংশের ছেলে, অল্প বয়েসেই মা বাবাকে হারিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন লখনউ…। সেখানে এক উস্তাদের কাছে গান শিখেছিলেন। খুব ভাল লখনউয়া ঠুংরি গাইতেন!…তখন বিডন স্কোয়ারে নন্দাবাইয়ের বাড়িতে মাইনে করা গানের মাস্টার। আত্মভোলা ভাবুক মানুষটা সেখানেই থাকেন…লাইনের মেয়েরা তালিম নিয়ে যায় এসে। আর নন্দাদি খুব ভালবাসেন তাঁকে। বোধ হয় একটু বেশিই ভালবাসেন…

—আপনি যেতেন সেখানে?

—না। কিন্তু যেতে হয়েছিল…। সে অনেক দুঃখের কথা। যেমন দুঃখের, তেমনি অপমানের। নাই বা শুনলেন, সে কথাগুলো আর…

…একান্ত বাধা না থাকলে, একটু খুলেই বলুন না ম্যাডাম, প্লিজ—

সুধাকান্তবাবুর খুনিকে ধরতে, আমাদের এ সবই কাজে লাগবে। সব কিছু শুনে, তবে একটা কিনারা করতে পারব।

নীলার মুখটা যেন থমথমে হয়ে ওঠে হঠাৎ। দৃষ্টিতে আগুনের ঝলক।

বললেন, খুনিকে ধরতে চান? তার জন্যে এত দূরে ছুটে এসেছেন আপনারা! সুধাবাবুর খুনিরা তো কলকাতায়ই বসে আছে। সেখানে যান—।

—কলকাতায় বসে আছে! কোথায়! একটু স্পষ্ট করে বলুন না, কথাটা ম্যাডাম।

—কেন, সুধাবাবুদের বাড়িতে। সেটাই তো আসল ডেরা খুনিদের। তাঁর ঘরবাড়ি, সোনাদানা যেখানে যা কিছু আছে—সব কেড়ে নিয়ে যারা মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে আমাদের—তাদের চেয়ে বড় শত্রু আর কে থাকতে পারে সুধাবাবুর! বলুন, আপনিই বলুন…

চাপা উত্তেজনায় মুখটা লাল হয়ে উঠেছে নীলার। নিশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন। ফণা তোলা একটা হিংস্র সাপের মতো যেন।

দেবদত্ত হতবাক! নতুন এক রহস্যের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যেন হঠাৎ। দারুণ নাটকীয় কোনও ঘটনার।

দেবদত্ত আবার অপেক্ষা করে। ধীরে ধীরে শান্ত হতে দেয় নীলা দেবীকে।

তারপরই জানা গেল মূল ঘটনাটা ঃ

বিয়ের পরপরই আলপনা চেয়েছিল এক নতুন জীবন। মেয়েরা যেমন চায়। স্বামীর সঙ্গে নতুন সংসার পাততে শ্বশুরের ভিটেয় এসে। স্বপ্নটা সুধাবাবুই দেখিয়েছিল তাকে···পুরনো আমলের জমিদার বাড়িতে···বিরাট মহলটা খালি পড়ে আছে তাঁদের। পরিবারের সিন্দুকে জমা এখনও তাঁর মায়ের অনেক দামি গয়না··· তাঁর বউয়ের প্রাপ্য মহামূল্যবান জড়োয়া মুকুট···গিনি, আরও কত কী···!

নীলা দেবী নিশ্বাস ফেললেন একটা, কিন্তু টাকা পয়সার জন্যে নয়, একটা নতুন সামাজিক পরিচয়, একটা সুখের সংসারই আলপনার মন টেনেছিল। সেই লোভেই একদিন সন্ধেবেলায় তারা স্বামী-স্ত্রীতে দুজনে দত্তবাড়িতে পা দিয়েছিল। আর নিয়ম অনুযায়ী আগে জ্যাঠামশাই জ্যাঠাইমাকে প্রণাম করতে গেল দুজনে···

আর তখনই সেই জঘন্য কাণ্ডটা ঘটল। বলতে ঘেন্না করে আমার, আজ। ওরা বোধ হয় আঁচ করেছিল কিছু। দুজনকে দেখামাত্রই বাপ ছেলে, কর্মচারী হই হই করে ঝাঁপিয়ে পড়ল এসে। বেরিয়ে যাও, গেট আউট, স্কাউণ্ড্রেল, লোফার··· আরও অনেক অকথ্য ভাষায় অবিশ্রান্ত গালাগালি। তাই দিয়েই অভ্যর্থনা শুরু হল ছেলে-বউকে। বিশেষ করে নতুন বউকে লক্ষ করে। কুৎসিত কুৎসিত সব ইঙ্গিত! সুধাবাবু হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে রুখে দাঁড়ালেন তখন। এক লাফে সামনের লোকটার কলার চেপে ধরলেন। আলপনা দিশেহারা! প্রায় অন্ধকার ঘর! তখনই পিছন থেকে কে যেন মাথায় ঢাঁই করে হাণ্টার মারল বাবুর···

···ওহ্! ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয় এখনও! এক পাক ঘুরে সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে মাটিতে পড়ে গেলেন তিনি। রক্তে ভিজে উঠছে মাথাটা। কেউ এসে ধরল না একবার। কর্তাবাবু শুধু দূর থেকে আহা-হা-আহা-হা করো কি! করো কি! করে যাচ্ছেন···

নীলার চোখদুটো ঝাপসা হয়ে আসে বলতে বলতে। তার মধ্যেও যেন আগুনের ঝলক বেরোয়, জানেন, কী শয়তান ওরা! আমার গায়েও হাত তুলতে বাকি রাখেনি। শেষে চুলের মুঠি ধরে প্রায় মুখ চাপা দিয়ে একটা ট্যাক্সির মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। তারপর সেই রাতের অন্ধকারে চুপি চুপি বের করে দিল আমাদের বাড়ি থেকে···দাঁত মুখ চেপে সব সহ্য করে গেলাম···

—তারপর ? দেবদত্ত অবাক হয়ে প্রশ্ন করে।

—তারপর আর কী! কোথায় যাব তখন আমরা। মাথায় রক্তছোটা বাবুকে নিয়ে টলতে টলতে শেষে নন্দাবাইয়ের কোঠিতে গিয়েই উঠতে হল। নন্দাদি অবশ্য খুব সেবা করল বাবুর। ডাক্তার ডাকল। আমাকেও অনেক ভরসা দিল। কিন্তু মাথার চোটটা আর সহজে ভাল হল না। একটু যেন গণ্ডগোল থেকেই গেল···

—মাই গুডনেস্! এ যে কল্পনাই করা যায় না! দেবদত্ত উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল।

নীলার মুখে ব্যঙ্গের হাসি, বলছিলেন না আপনি, স্বামীর সঙ্গে সুখের সংসার পাতার কথা! তো, এই আমার সেই সুখের সংসারের কাহিনী! শেষ পর্যন্ত বাইপাড়ার কোঠিতে স্বামীর সঙ্গে ঘর করা। ছিঃ! আমার সব মোহ ঘুচে গেল। এর থেকে আমার পুরনো জীবন, আমার স্টেজ, শতগুণে ভাল। সেই মুহূর্তেই সব সম্পর্ক ছিঁড়ে আমি বেরিয়ে পড়তে চাইলাম। কিন্তু পারলাম না। আটকে গেলাম অন্য জায়গায়।

—সুধাবাবুর মায়ায় ?

—উঁহু! সুধাবাবুর বাচ্চার মায়ায়। ভুলটা আগেই হয়ে গেছে। অবশ্য আমি খুব চেষ্টা করেছিলাম এর থেকে ছাড়া পেতে। ডাক্তারও রাজি ছিল। আমি চাইনি, আমার মতোই আর একটা অভিশপ্ত জীবন আসুক এই পৃথিবীতে। কিন্তু সুধাবাবুর জন্যেই হল না। ছেলেমানুষের মতো কান্নাকাটি জুড়ে দিল হাতদুটো ধরে···এটা তার চাই-ই চাই···আর কি করি।

—বাচ্চা হল আপনাদের ?

—হ্যাঁ। একটি মেয়ে। পাঁচ মাস হতেই নন্দাদির কাছে তাকে রেখে আমি চলে গিয়েছিলাম।

—এখন কোথায় মেয়েটি !

– সে আর নেই ! মাথা নাড়লেন নীলা, চোখের দৃষ্টিটা ঘন হয়ে আসে তাঁর, বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সে চলে গেল। সুধাবাবু বাঁচল, আমিও বাঁচলাম। পাগলামিটাই আরও পেয়ে বসল তখন বাবুর···

—আচ্ছা একটা প্রশ্ন, সুধাবাবুর মাথায় যে হাণ্টার মেরেছিল, তাকে দেখেছিলেন আপনি ? নামটাম কিছু শুনেছিলেন তাঁর ?

—না, না। ঘরের বড় লাইটা নিবিয়ে দিয়েছে তখন। দরজা বন্ধ। আবছা অন্ধকার। তার মধ্যেই জোয়ান মদ্দ কয়েকটা লোক···মেয়ে কেউ ছিল না বোধ হয়। পাশের ঘরে জোর ভল্যুমে রেডিওর গান বাজছে···

—আই সি। খুব খারাপ লাগছে নীলা দেবী, আপনার কথাগুলো শুনে। কিন্তু কী করব, না শুনেও যে উপায় নেই আমাদের।

—আমার জন্যে ভাববেন না। এ সব আর আমার গায়ে লাগে না এখন। আমি এখন শুধু নীলা। আর কেউ নয়।

—আর একটা কথা, সুধাবাবুর নামটা বুধু পাগলা হল কী করে?

—এটা আমার জানা নেই। শুনিওনি কখনও। তবে নন্দাদি আদর করে ওকে কখনও কখনও 'বুদ্ধুভাই' বলে ডাকতেন। জানি না, সেই থেকেই এটা হয়েছে কি না।

—কিন্তু সুধাকান্তবাবু কি সত্যি সত্যি পাগল হয়ে গিয়েছিলেন?

—না, ঠিক পুরোপুরি তা নয়। একটা খেয়ালি আর পাগলাটে ধরনের আর কি, তবে জানি না শেষ পর্যন্ত কী হয়েছিল। একবার নাকি বিষ খেয়েছিলেন তিনি সিদ্ধির সঙ্গে। তাই নিয়ে অনেক হুলস্থুল। শুনেছি মাথাটা নাকি তারপর থেকে আরও বিগড়েছিল।

—আপনি যাননি দেখতে?

—না। আমার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। বাড়ি ছেড়ে আমি তখন নতুন ঠিকানায়। পুরনো নামটাও আর নেই।

—কিন্তু হঠাৎ বিষ খেলেন কেন সুধাবাবু? পাগলামি করে?

—কারণটা ঠিক বলতে পারব না আপনাকে। তবে যা শুনেছি, ব্যাপারটা একটু গোলমেলে। রমা বলে একটি মেয়ে ছিল নন্দাদির কোঠিতে, সিদ্ধিটা নাকি সে-ই খাইয়েছিল।

—রমা। কিন্তু সে কেন খাওয়াতে গেল?

—জানি না। আমিও কোনও কারণ খুঁজে পাই না।

—আচ্ছা, সুধাবাবু কি বরাবর ওখানেই ছিলেন তা হলে?

—তাই তো মনে হয়। নন্দাদি যতদিন, ততদিন তার 'বুদ্ধুভাইও' থাকবে।

—আই সি।

হঠাৎ মনে পড়ল দেবদত্তর, ডেডবডির সামনে দাঁড়িয়ে টেলার পাল মশায়ের সেই কথাটা, 'বিডোন স্ট্রিটের আশেপাশেই আমি অরে দেখছি। মুখটা যেন চিনা চিনা লাগে…অরেই দেখছি'…

নীলার দিকে ফিরে বলল, নন্দাবাইয়ের ঠিকানাটা একটু দেবেন আমাকে।

—ঠিকানা নয়, জায়গাটাই চিনিয়ে দিচ্ছি আপনাকে…বিডন স্কোয়ার বাঁদিকে রেখে দক্ষিণ মুখে আসছেন তো, পার্কটা ছাড়িয়ে আর একটু এগোলেন··

দেবদত্ত নির্দেশটা বুঝে নিতে থাকে ভাল করে।

রাতুল ততক্ষণে ডায়েরিটা মুড়ে খোলা থেকে ক্যামেরা বের করেছে। বলল, যদি কিছু মনে না করেন, দু-একটা ছবি…আপনার…

নীলা তাকালেন চোখ তুলে, ও নিশ্চয়ই।

পর পর পোজ দিলেন কয়েকটা প্রোফেশানাল অভিনেত্রীর মতো।

রাতুল হাসল মাথা নেড়ে, থ্যাঙ্ক য়্যু ম্যাডাম।

দেবদত্তও উঠে দাঁড়াল এবার, থাঙ্ক য়্যু এগেইন। রিয়েলি আয়াম গ্রেটফুল ট্যু য়্যু নীলা দেবী। এতটা সময় আপনি আমাদের জন্যে দিলেন!

নীলা হাত জোড় করলেন, ও কথা বলে আর লজ্জা দেবেন না প্লিজ। যদি কখনও দরকার হয়, আবার আসবেন। আপনাদের জন্যে আমার সময়ের অভাব হবে না।

বাইরে স্যূর্যাস্তের আয়োজন শুরু হয়ে গেছে আকাশে। শেষ বিকেলের মায়াবী আলোয় আকাশ, সমুদ্র, ঝাউবন সব অন্যরকম দেখতে লাগছে এখন।

সাগরকন্যা ছবির শ্যুটিঙের তোড়জোড় চলছে এদিকে। ইউনিট পুরো তৈরি। বিচের ওপর স্যূর্যাস্তের দিকে তাকিয়ে নায়ক-নায়িকা দুজন হাত ধরাধরি করে ধীরে ধীরে হাঁটছে। ডিরেক্টর একবার কাছে গিয়ে হাতমুখ নেড়ে কী বুঝিয়ে এলেন চট করে। তারপর এসে ক্যামেরায় চোখ রাখলেন। শ্যুটিং শুরু হয়ে গেল…

সেই বাচ্চা ছেলেটা হাঁ করে বালির ওপরে বসে সব দেখছে।

ব্যাপারটা নজর করে রাতুল। কিন্তু ছেলেটাকে আর ডাকল না। ওর সঙ্গে কথা বলার মতো মন নেই। তাদের দুজনের কারওরই মন নেই এখন। ঘাটে একটা নৌকো দাঁড়িয়ে আছে। সোজা সেখানে গিয়ে বসে পড়ল।

ব্যাকওয়াটারের এপারে এসেই নামল আবার। সূর্য ডুবে যাচ্ছে। সেই দুরন্ত ঝোড়ো হাওয়াটা আর নেই। সমুদ্র শান্ত অনেক। পায়ে পায়ে ওরা সি-বিচের দিকে উঠতে থাকে।

একেবারে ফাঁকা এদিকটা। মাছ ধরতে আসা লোকগুলোও চলে গেছে কখন। নির্জন সি-বিচের ওপর পর পর শুধু কয়েকটা ভাঙা জেলে নৌকো। মেরামতের জন্যে দাঁড় করানো।

হঠাৎ নজরে আসে কে যেন দাঁড়িয়ে ওখানে। নৌকোর আড়ালে চুপচাপ দাঁড়িয়ে নিস্তব্ধ দুটি মূর্তি! এবার আরও স্পষ্ট দেখা যায়। একজন পুরুষ ও একজন মহিলা। দুজনেরই পরনে বিচ প্যান্ট। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখছে। বিকেলের লাল সমুদ্র। কেউ কোনও কথা বলছে না। একদম চুপ…

কেমন যেন খটকা লাগে একটু। সঙ্গে সঙ্গেই থেমে গেল ওরা। পাশে সরে গিয়ে নজর করে আরও ভাল করে।

রাতুল বলে উঠল চুপি চুপি, আরে! এ যে আমাদের ক্ষিতিবাবু আর শৈলী দেবী! শালির সঙ্গে হাওয়া খেতে ভদ্রলোক এখানে চলে এসেছেন! কী ব্যাপার দাদা! ঝিন্‌চ্যাক মনে হচ্ছে যেন!

—ইয়েস রাতুল, ঘটনাটা খুবই অদ্ভুত! ভদ্রলোকের এখন ভাইজ্যাগ থাকার কথা। আর শৈলীর খড়্গপুরে। কিন্তু তার বদলে দুজনে মিলে এই নির্জন সি-বিচে দাঁড়িয়ে? ঠিক মেলাতে পারছি না যেন…এটা কি প্রেমের ব্যাপার? নাকি অন্য কোনও…

—তার মানে? ওরা কি তবে আমাদের জন্যেই এসেছে নাকি?

—বলা যাচ্ছে না এখনও। কিন্তু ওদিকে আর একপাও নয়। চলে এসো রাতুল—কাম অন দিস ওয়ে··

দেবদত্ত চটপট ঘুরে গেল অন্যদিকে। মুখোমুখি হওয়া এখন কিছুতেই সম্ভব নয় ওদের। পা চালিয়ে অনেক দূরে চলে গেল মুহূর্তের মধ্যে।

মনের মধ্যে তবু কাঁটার মতো প্রশ্নটা বিঁধতে থাকে বারবার, পরিক্ষিৎবাবু ঠিক এই মুহূর্তে এখানে কেন? কেন?…

২০

আজ দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ঘুমিয়ে পড়ল দেবদত্ত। লম্বা টানা একটা ঘুম।

শরীর মন দুইই খুব ক্লান্ত। গত কয়েকদিন শুধু ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। তার ওপর ট্রেনজার্নির ধকল। ভেবেছিল, কলকাতায় ফিরেই রাতুলকে নিয়ে একবার বিডন স্কোয়ারে হানা দেবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। কিন্তু প্ল্যানটা বদল করতে হল আপাতত।

শরীর যেন আর বইছিল না। বাড়িতে পৌঁছে আগে চান করল অনেকক্ষণ ধরে। শাওয়ারের নীচে চুপচাপ দাঁড়িয়ে চিন্তা করল নতুন কাজের রুটিনটা। রাত-জাগার ক্লান্তিটাও যেন ধুয়ে মুছে নেয় তার সঙ্গে।

তারপর সকাল সকাল দুপুরের খাওয়া শেষ করে খবরের কাগজটা নিয়ে বিছানায় গড়ায়। কাগজে চোখ বুলোতে বুলোতেই কখন ঘুমে চোখ ঢলে এল।

ঘুম ভাঙল যখন, তখন বিকেল প্রায় শেষ। সনাতনই চায়ের কাপ এনে ঘুম ভাঙাল তার।

দেবদত্ত লাল চোখ দুটো রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, ইস! তুই এতক্ষণ আমায় ডাকিসনি? বেলা যে শেষ হয়ে গেছে, রে!

সনাতন লাজুক হাসে একটু, আপনার যে জমানো ঘুম। খুব ঘুমোচ্ছিলেন। তাই আর জাগাইনি…।

দেবদত্ত হাই তুলল, আ-আহ্। জমানো ঘুম! বেশ বলেছিস বটে।··· দে, চা-টা আমার হাতে দে···।

চা দিয়ে সনাতন বলল, দাদা, রাতুলবাবু বসে আছেন ও ঘরে।

—রাতুল! কখন এল?

—অনেকক্ষণ। আপনাকে ডাকতে মানা করল। বসে বসে বই পড়ছেন···।

—ডাক্, ডাক্। এইখানে ডাক্। চা দিয়েছিস তো?

—একটু আগেই দিলাম।

—আর এক কাপ দে, আমার সঙ্গে।

রাতুল এ ঘরে উঠে এল। চান করে সাদা পাটভাঙা প্যান্টশার্ট পরে একেবারে ঝকঝকে হয়ে এসেছে। বেশ তরতাজা আর স্মার্ট লাগছে তাকে দেখতে। এখনই তৈরি যেন নতুন অভিযানে বেরিয়ে পড়তে।

দেবদত্ত চোখ কুঁচকে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, কী ব্যাপার, রাতুলবাবু। এসে চুপচাপ বসে আছ! ডাকনি কেন আমাকে? রাতুল হাসল, ঘুমটা বোধ হয় দরকার ছিল আপনার, দাদা। তাই আর ডিসটার্ব করিনি। গোপালপুরের ডায়েরি থেকে কয়েকটা নোট নিচ্ছিলাম বসে বসে।

—ভালই করেছ। নীলা দেবীর স্টেটমেণ্ট এখন সবচেয়ে জরুরি গাইড লাইন আমাদের। অনেক কিছু বেরিয়ে আসবে এর থেকে। বেরিয়ে আসবে অন্ধকার হানাবাড়ির গোপন ইতিহাস...জটপাকানো অনেক জটিল সূত্র···

সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে দেবদত্ত কথাটা ভাবে যেন দূরের দিকে তাকিয়ে।

রাতুল বলল, চলুন দাদা, আমরা বেরিয়ে পড়ি তাহলে।

অলসভাবে মাথা নাড়ল দেবদত্ত, না, রাতুল। এখন দুদিন পুরো রেস্ট আমাদের। সবদিকগুলো আর একটু ভাল করে ভেবে নিতে দাও। তারপর এগোনো যাবে আস্তে আস্তে। পিছনে একটা ফেউ লেগেছে আমাদের, খেয়াল আছে?

—সে কী! তার জন্যে আমরা হাত পা গুটিয়ে বসে থাকব?

—নিশ্চয় নয়। আপাতত সে-ই ঘুরুক পথে পথে। আর আমরা দুদিন রেস্ট নিয়ে প্ল্যানটা সাজাই আরও আঁটোসাটো করে—এই আর কি! দেবদত্ত হাসল মজা করে!

রাতুল যেন অশাহত হল একটু। পরে বলল, সুখেন্দুদাকে ফোন করি একবার? গোপালপুরের ঘটনাটা জানলে নিশ্চয়ই ছুটে আসবেন—

—না, রাতুল। আপাতত গোপনই থাক কথাটা। তোমার সুখেন্দুদা নিজের সমস্যা নিয়েই যথেষ্ট নাজেহাল এখন। তার সঙ্গে জুটেছে এই খুনের তদন্ত নিয়ে

একটা মানসিক চাপ। বেশ বুঝতে পারছি, রীতিমতো অশান্তিতেই আছেন ভদ্রলোক···

—কী বলছেন দাদা! রাতুল অবাক তাকায় দেবদত্তর মুখের দিকে।

—কেন, তোমার নিজেরও তো একসময় তাই মনে হয়েছিল! গোড়া থেকেই এক অদ্ভুত ট্র্যাজেডির নায়ক এই সুখেন্দুবাবু। আর তার নায়িকা পল্লবী দত্ত। দত্তভিলার সঙ্গে তাঁর সব সম্পর্কের মূলে হচ্ছে পল্লবী। তার জন্যেই দু হাতে পয়সা, সময়, সব ব্যয় করে চলেছেন ভদ্রলোক। অবশ্য পল্লবী একা নয়। পরিবারের সবার জন্যেই সমান দরাজ হাত তাঁর। অথচ···

—ওঁদেরই দোষ তাহলে। সব বুঝেও চুপচাপ ব্যাপারটা মেনে নিচ্ছে কেন সবাই ?

—সেখানেই তো সমস্যা! বড় ঘরের ব্যাপার যে! আর সুখেন্দুও বলতে পারছেন না তাঁর আসল কথাটা। যাকে বলবেন সে সব বোঝে, অথচ অদ্ভুত উদাসীন। তাঁর চোখের সামনেই একজনের পর একজনের সঙ্গে প্রেমে পড়ে যাচ্ছে। আবার কাটিয়েও উঠছে সুখেন্দুবাবুরই হাত ধরে···এ এক অদ্ভুত জটিল সমস্যা!

—কিন্তু সুখেন্দুদার যে অনেক বয়েস। এই বয়েসে পল্লবী দত্তর···

—হ্যাঁ সেটাই একটা বড় ফ্যাক্টর, নিঃসন্দেহে! কিন্তু এখন এ ছাড়া আর কোনও উপায়ও নেই। না পল্লবীর, না সুখেন্দুবাবুর। কথাটা প্রায় সবাই বোঝে, জানে। কিন্তু খোলাখুলি ভাবে স্বীকার করতেও পারছে না। দত্তভিলার আরও অনেক গোপন কথার মতো এটাকেও রেখে-ঢেকে আড়াল করে আছে।

—আশ্চর্য ব্যাপার তো! সুখেন্দুদাকে এই জন্যেই মাঝে মাঝে এত অন্যমনস্ক দেখায়।

—বুধু পাগলাকে নিয়ে সুখেন্দুর যে এত মাথা ব্যথা, সে-ও কিন্তু অনেকটা পল্লবীর জন্যে। পল্লবীর কান্নাই তাকে দুর্বল করে দিয়েছে।

—না দাদা, সুখেন্দুদা নিজেও খুব পছন্দ করতেন লোকটাকে, একটা জেনুয়িন ফ্যাসিনেশান ছিল ওঁর।

—অস্বীকার করছি না, তোমার কথা। কিন্তু পল্লবীর জন্যেই যে বিশেষ ভাবে জড়িয়ে পড়েছেন, এটা বোঝা যায়। দেখছ না, দত্তবাড়ির আর কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না যখন, তখন সুখেন্দুবাবু একা শক্ত হাতে হাল ধরে আছেন ইনভেস্টিগেশানের। এটা কেন ? হয়তো এর জন্যে দত্তবাবুদের সঙ্গে একটা চাপা মন কষাকষিও চলছে ভদ্রলোকের—বেশ অনুমান করতে পারছি আমি ঘটনাটা। তবুও কিন্তু হাল ছাড়ছেন না তিনি···রিয়েলি এ ওয়ান্ডারফুল ক্যারেকটার!

কথার মধ্যেই ফোন বাজার শব্দ পাশের ঘরে। রিং হয়েই যাচ্ছে। এবার তুলল সনাতন। কথা বলছে কার সঙ্গে। দেবদত্ত কান পেতে থাকে।

সনাতন এসে বলল, দাদা সুখেন্দুবাবু।

রাতুল বলল, আরে! কী আশ্চর্য! অনেকদিন বাঁচবেন তো ভদ্রলোক!

—এর আগেও দুদিন ফোন করেছিলেন। বলেছি, বাবুরা পুরী গেছেন। কবে ফিরবেন, জানি না।

—বাঃ বেশ। কাজটা তো তুই সেরেই রেখেছিস দেখছি, তাহলে। দেবদত্ত উঠতে উঠতে বলল, পুরীর নামটা বলতে গেলি কেন হতভাগা?

সনাতন কাচুমাচু হয়ে তাকায় বাবুর মুখের দিকে।

—হেলো মিঃ বোস। বলুন কি খবর?

—খবর তো মশাই আপনার কাছে। কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ দুম করে পুরী চলে গেলেন। ব্যাপারটা কী?

—আর কী! সেই 'মহাসিন্ধুর ওপারে' চলে যাওয়া লোকটা! তারই ঠিকানার খোঁজে।

—তার জন্যে শেষে পুরীতে!

—বলুন, পুরীর সিন্ধুতীরে। দেবদত্ত হাসল শব্দ করে, হ্যাঁ সেখানেই—আত্রেয়ী-আলপনার সূত্র ধরে সেখানেই হাজির হতে হয়েছিল একটু।

—কাজ হল কিছু?

—মনে হচ্ছে তো হয়েছে। এখন দেখা যাক বাকি তথ্যগুলো যাচাই করে।

—এখনও সঠিক কোনও হদিশ পাচ্ছেন না, আপনি?

—হত্যাকারী কে? ব্যস্ত হবেন না, সুখেন্দুবাবু। আর একটু ধৈর্য ধরুন। সব জানতে পারবেন।

সুখেন্দু চুপ করে থাকেন একটু। তারপর বললেন, এদিকে যে আর একটা কান্ড হয়েছে। সেটা জানাব বলেই আপনাকে ফোন করেছিলাম।

—আবার কী হল? বলুন, বলুন—

—রাজেশ আর ভুট্টা একদিন ভোরে এসে চক্কর দিয়ে গেছে দত্তবাড়ির সামনে। পুরন্দর ছাদ থেকে দেখেছে।

—সে কী! রাজেশের তো এখন সহেলি সমাদ্দারকে নিয়ে ঘোরার কথা। তার বদলে আবার দত্তভিলায়। সঙ্গে ভুট্টাকে নিয়ে? খুবই গোলমেলে লাগছে যেন ব্যাপারটা।

—ওর যে কী মতলব কিছুই ধরতে পারছি না আমি, মিঃ চ্যাটার্জি। কথার সঙ্গে একটা নিশ্বাস পড়ে সুখেন্দুর।

—ঠিক কী ঘটেছিল, বলুন তো! পুরোবাবু কী বলেছে আপনাকে?

—খুব ভোরবেলায় · একটা গাড়ির শব্দ রাস্তায়। গাড়িটা এসে যেন থেমে গেল—আর কোনও শব্দ নেই। সদর দরজাটা তখনও বন্ধ। সরকারমশাই দুগ্গা

দু'পা বলে সবে পাল্লাটা টেনে খুলছেন···খুলেই কাকে দেখে যেন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, চিৎকার করে কী বলতে লাগলেন, খুব কথা কাটাকাটি কার সঙ্গে···তারপরই আবার দড়াম করে বন্ধ করে দিলেন বিশাল পাল্লা দুটো···।

পুরো তখন ব্যায়াম করছে ছাদে···শব্দ পেয়ে তাড়াতাড়ি ঝুঁকে পড়ে দেখল নীচে···গাড়িতে বসে সেই ভুট্টা আর রাজেশ···। সঙ্গে সঙ্গে তেড়ে উঠল পুরো। হুঙ্কার দিয়ে বলল, কে ? কে ওখানে ? অ্যাই স্কাউণ্ড্রেল ! আবার এসেছিস তুই···

সঙ্গে সঙ্গেই রাজেশের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল···একটা তীব্র আক্রোশ-ভরা দৃষ্টিতে সে তাকাল ওপরের দিকে···চোখটা যেন জ্বলছে ধক ধক করে···মুখটা বিকৃত। সেইভাবেই দাঁত কিড়মিড় করে কী বলল যেন শাসিয়ে···তারপরই হঠাৎ দুম করে স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে গেল গাড়িটা। পুরো থ হয়ে তাকিয়ে দেখে সব।...

—আশ্চর্য ! এটা কী করে সম্ভব ··। নিজের মনেই যেন বলল দেবদত্ত।

—কী জানি। আমি তো একটু ঘাবড়ে গেছি শুনে। কদিন আগে মার্ডারের ব্যাপারটা নিয়েও আলোচনা চলছিল ওদের মধ্যে, মনে আছে ? অপকর্মের জালটা যে ওদের কোথায় কতদূর ছড়ানো সেটা ধরা যাচ্ছে না কিন্তু।

দেবদত্ত একটু ভাবল কথাটা। পরে বলল, ঠিকই, কে যে কোথায় জড়িয়ে আছে ! আমাকেও ভাবাচ্ছে সেটা। কিন্তু আপনি এ নিয়ে আর চিন্তা করবেন না। আমি দেখছি ব্যাপারটা খতিয়ে।

—থ্যাংক য়ু। আপনি দত্তবাড়িতে কবে আসছেন তাহলে ! রামদয়ালকে একবার দেখবেন বলেছিলেন।

—হ্যাঁ দেখা দরকার লোকটাকে।

—ক্ষিতির সঙ্গেও তো বলতে চান, আর একবার ?

—ক্ষিতিবাবু ফিরেছেন ভাইজ্যাগ্ থেকে ?

—আজ-কালের মধ্যেই ফিরবে মনে হয়।

—ও তাই ! আমিও যাচ্ছি দু একদিনের মধ্যে।

—আপনারা কি আজই ফিরলেন, পুরী থেকে ?

—হ্যাঁ। আজ সকালে।

—বিকেলের দিকে কী করছেন ! প্রোগ্রাম আছে কিছু ?

—স্রেফ ঘরে বসে চা পান আর রাতুলের সঙ্গে আড্ডা। ভীষণ টায়ার্ড। পুরো দিনটাই আজ আলসেমি করে কাটাচ্ছি।

—একসেলেণ্ট। ঠিক আছে, আমি পরে খবর নেব।

—থ্যাংক য়ু মিঃ বোস। ব্যাপারগুলো সব আমাদের ওপরই ছেড়ে দিন। অ্যাণ্ড নো টেনশান, প্লিজ—।

—থ্যাঙ্ক য়ু মিঃ চ্যাটার্জি। আই ট্রাস্ট য়ু—

ফোনটা রেখে দিলেন সুখেন্দু।

দেবদত্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে। আলোটা ম্লান হয়ে আসছে বিকেলের। হঠাৎ বলল, রাতুল তোমার ছবিগুলোর প্রিন্ট কবে পাওয়া যাবে? মানে নীলা দেবীর ছবিগুলো।

—আশা করছি কাল বিকেলেই।

—গুড। তার মানে পরশু সকালেই আমরা বেরুচ্ছি। তোমার ফোটোগ্র্যাফির আরও একটা বড় মিশন অপেক্ষা করে আছে।

—কোনটার কথা বলছেন?

—আমাদের নতুন টার্গেট! নন্দাবাই। সুধাকান্তর ছবি একটা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। সুধাকান্ত, আলপনা বা তাদের মেয়ে। কোনওটাই কিন্তু মিস্ করবে না, সুযোগ পেলে। পুরোপুরি ইউটিলাইজ করতে হবে সুযোগটা।

—ও শিওর, দাদা! সে আর বলতে! মুখটা চকচক করে ওঠে রাতুলের।

ট্যাক্সিটা এবার অনেক দূরেই ছেড়ে দিল ওরা। তারপর আগে পিছনে হয়ে এগোতে থাকে। উদ্দেশ্য, যদি কোনও ফেউ লেগে থাকে পিছনে, তাকে চিনে নেওয়া। দুজনেরই সতর্ক নজর। কিন্তু না, তেমন কাউকে নজরে পড়ে না এবার।

নির্দেশমতো ঠিক খুঁজে পাওয়া গেল বাড়িটা। পুরনো আমলের মোটা থাম-ওয়ালা থমথমে চেহারার একটা বাড়ি।

সামনেই একটা পালোয়ান চেহারার লোক বসেছিল। তাদের দেখে বলল, কিধার যানে মাংতা আপলোগ্?

রাতুল বলল, আমরা একটু নন্দাদির কাছে যাব ভাই। বহুত জরুরি কাম আছে।

—আইয়ে। ভিতরে এসে বসুন আপনারা। আমি মালকিনকে খবর দিচ্ছি।

ভেতরে বড় একটা ঘরের মধ্যে এসে অপেক্ষা করে ওরা। সাজগোজের মধ্যে চারদিকে যেন পুরনো আমলের আমেজ। ফুলপাতা কাটা দেয়াল, নানা ধরনের ছবি, ফটো, পাথরের নগ্ন নারী মূর্তি। কারুকাজ করা পেতলের দেয়ালগিরি···। রাতুল অবাক হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে।

প্রাচীন আমলের একটা কুচকুচে কালো লম্বা দেয়াল ঘড়ি একপাশে। অদ্ভুত একটা শব্দ। টক্ টক্-টক্ টক্! ফরাসের সামনে প্রকাণ্ড পেতলের ফুলদানি। অন্যদিকে সাজানো পর পর নানারকম গান-বাজনার সরঞ্জাম।

কে জানে, এখানেই একদিন সুধাকান্তর গানের আসর বসত কিনা! দেবদত্ত মনে মনে ভাবল একবার।

ভেতরে একটা কাকাতুয়া ডেকে উঠল যেন। তারপরই আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকলেন তিনি। নন্দাবাই! চেহারার মধ্যে অদ্ভুত একটা গাম্ভীর্য। বেশ বয়েস।

মনে হয় পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গেছে। মাথায় রূপোলি চুল। চোখে কালো মোটা ফ্রেমের চশমা।

নমস্কার করে বললেন, আপনারা ?

দেবদত্ত অবাক হয়ে দেখে, ইনিই বন্ধু পাগলার সেই নন্দাদি! এঁরই আশ্রয়ে হাজার রকম ঝড়-ঝাপটার মধ্যেও, জীবনের শেষ দিনগুলো কাটিয়ে গেলেন সুধাকান্ত। দত্তভিলার জমিদার সুধাকান্ত দত্ত! রাজপুত্রের মতো যার চেহারা! সুকণ্ঠ গায়ক, নাটক-মঞ্চ-সঙ্গীতকে যিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন···

নন্দাবাইও তাকিয়ে আছেন। কৌতূহলভরা এক অদ্ভুত ফ্যালফেলে দৃষ্টি। একটুক্ষণ পরে আবার বললেন, কী চাই আপনাদের বললেন না তো ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ নমস্কার। আমি দেবদত্ত চ্যাটার্জি। আর এর নাম রাতুল সেন। আমরা এসেছি একটা তদন্তের কাজে।

—তদন্ত ?

—হ্যাঁ, নন্দাদি। আপনি কি জানেন, আপনার 'বন্ধুভাই' সুধাকান্ত খুন হয়েছেন ?

—আমি সব জানি— সব ! গলাটা যেন কেঁপে গেল মহিলার। নিশ্বাস পড়ল একটা। কিন্তু আপনারা আমার কথা জানলেন কী করে ?

দেবদত্ত এবার বিস্তারিত করে গোড়া থেকে সব কথা খুলে বলতে থাকে মহিলাকে। নন্দাদি অবাক হয়ে শোনেন। তাঁর বন্ধুভাইয়ের কথা, আলপনার কথা। ছবিও দেখেন অনেক। রাতুলের তোলা পাগলার মৃতদেহের ছবি। গোপালপুরে সাগরকন্যাবেশে নীলা দেবীর ছবি। দেখতে দেখতে চোখে জল এসে যায়···

আর মনের আবেগ চেপে রাখতে পারেন না নন্দাবাই। দেবদত্তকে যেন নিজের লোক মনে হয়। খোলা মনে এক এক করে তার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকেন। বলতে বলতে চোখে জল আসে বারবার। কেমন করে তাঁর বন্ধু এমন হয়ে গেল দিনের পর দিন···কেন সে রাত্তির হলেই ছুটে যেত দত্তভিলায়, পাগলের মতো ছুটে যেত।···কেন বা সকাল হলেই আবার ফিরে আসত এখানে·

ফোঁস করে নিশ্বাস ফেললেন একটা, হা— ! আমারই দোষ···তখন বাধা দিইনি পাগলকে ! তখন কি জানতাম···শেষে কপালে এই ছিল ওর···

আবার চোখে আঁচল চাপা দিলেন নন্দাবাই।

রাতুল চুপচাপ ডায়েরি লিখে যাচ্ছে। বিশাল বড় বাড়িটায় যেন কোনও শব্দ নেই। শুধু কালো লম্বা ঘড়িটার একটানা—টক্-টক, টক্-টক !

ঢং ! ঢং ! করে ঘর কাঁপিয়ে দশটার ঘণ্টাও বেজে গেল এক সময়।

কে যেন দরজার বাইরে থেকে একবার উঁকি দিল ভিতরে। কোটরে ঢোকা

রাতজাগা কালো দুটো চোখ। রাতুলের সঙ্গে একবার চোখাচোখি হতেই নিঃশব্দে সরে যায়। ও কে? মনে মনে ভাবে রাতুল।

দেবদত্তর কোনও হুঁশ নেই। একভাবে কথা চলছে দুজনের। নন্দবাইও থামছেন না। এক দুর্বল মুহূর্তে যেন নিজের সব কথা আজ উজাড় করে দিচ্ছেন দেবদত্তর কাছে।

দেবদত্ত হঠাৎ রমার কথাটা তুলল, সেই যে মেয়েটি বিষ খাইয়েছিল সুধাবাবুকে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, রমা কয়াল! ভাল বলেই জানতাম বরাবর। তবু কেন যে এমন কাজটা করতে গেল! ডাক্তার ডেকে শেষে যমে-মানুষে টানাটানি। কী কাহিল হয়ে পড়েছিল বন্ধু! তবু মেয়েটা কিছু স্বীকার করে না।

না, সঠিক উত্তরটা এখানেও পাওয়া গেল না।

দেবদত্ত বলল, একবার দেখা করা যায়, তার সঙ্গে?

—সে তো আর নেই। সেই ঘটনার পরই আমি তাকে চলে যেতে বলি। শুনেছি তার কোন এক রাঙাবাবু নাকি তাকে ফ্ল্যাট দিয়েছে নতুন। সেখানেই থাকে এখন।

—রাঙা-বা-বু! আই সি! লোকটা কে, দেখতে কেমন, কিছু জানেন?

—না না, সে সব কিছু জানি না।

—এখানে কখনও আসেননি?

—এলেও আমার নজরে পড়েনি।

—রমার নতুন ঠিকানাটা জানেন?

—শুনেছি বউবাজার আর সেনট্রাল অ্যাভিনিউয়ের মোড়ে, গৌরীকুঞ্জ বলে যে ফ্ল্যাট বাড়িটা, তার তিনতলায় না চারতলায় থাকে।

—গৌরীকুঞ্জ! রমা কয়াল! নামটা বলতে বলতে রাতুলের দিকে তাকায় দেবদত্ত। চোখে চোখে নিঃশব্দ এক ইঙ্গিত খেলে গেল যেন দুজনের!

রাতুলের ডায়েরি লেখা শেষ। ক্যামেরা নিয়ে ব্যস্ত আপাতত। পর পর ছবি তুলে যাচ্ছে। নন্দবাইও বাদ যান না। তাদের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত তাঁর একটা বড় ছবির অ্যালবামও বার করে দিলেন।

অ্যালবামটা পেয়েই রাতুল প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে তার ওপর। দেবদত্তও মনোযোগ দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে ছবিগুলো।

২১

সকাল সকালই তৈরি হয়ে নিল দু'জনে। দম ফেলবার সময় নেই এখন।

সবার প্রথমে ছুটতে হবে বউবাজারের মোড়ে। সেই ফ্ল্যাটবাড়িটার খোঁজে। অনেক রাত পর্যন্ত ডায়েরি ঘাটাঘাটি করে দুজনে মিলে ছকটা সাজিয়েছে।

আর দেরি চলবে না। প্রতিপক্ষের কাছে খবর পৌঁছে গেলেই সাবধান হয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গেই গা ঢাকা দিতে পারে আসল কালপ্রিট।

এখন দরকার রমা কয়ালের সঙ্গে আগে একবার কথা বলা। মোটিভটা কী ছিল তার? বহু নারীর সঙ্গে জড়ানো সুধাকান্তর জীবনকাহিনী। তার মধ্যে এই মহিলার ভূমিকাই বলতে গেলে সবচেয়ে সাংঘাতিক! কী ছিল মনে, ঈর্ষা না প্রতিহিংসা? নাকি অন্য কোনও ষড়যন্ত্র!

ভাল করে বুঝে নেওয়া দরকার ব্যাপারটা।

কিন্তু বেশিক্ষণ সময় দেওয়া যাবে না। তারপরই ছুটতে হবে দত্তভিলায়। ভূপাল সরকারকে ধরা চাই। সোজা চেপে ধরতে হবে লোকটাকে। ছবিগুলো এবারও কাজে আসবে। মুখে কুলুপ এঁটে থাকা আর চলছে না। হাঁড়ির মুখের সরাটা এবার ভাঙছেই দত্তভিলার।

আশ্চর্য! লোকটা এতদিন ভিজে বেড়াল সেজে কীভাবে গোপন করে গেছে কথাগুলো! কিন্তু আর নয়। আলপনা সুধাকান্তর নতুন ছবিগুলোই হবে প্রধান অস্ত্র। মুখ না খুলে, আর পার পাচ্ছে না ভূপাল সরকার।

তারপর ড্রাইভার রামদয়াল সিং। দত্তবাবুদের অনুগত, মহাবীরের চেলা রামদয়াল! জরুরি তার সঙ্গেও একবার ভেট হওয়া। আশ্চর্যভাবে লোকটা চোখ এড়িয়েই গেছে। ঠিক ঠিক কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভাল করে যাচাই করতে হবে তাকে।

অবশেষে সেই বাড়িটা।

নন্দাবাইয়ের নির্দেশ অবশ্য পুরোপুরি মিলল না। বউবাজারের ক্রসিং ছাড়িয়ে এসপ্ল্যানেডের দিকে অনেকটা গিয়ে তবে হদিশ মিলল গৌরীকুঞ্জের। নাম করতেই দেখিয়ে দিল রিকশাওয়ালা।

বাড়িটা ঠিক রাস্তার ওপরও নয়। গলির মধ্যে ঢুকে। পথটা দু'ভাগ হয়ে গেছে সামনে এসে। অন্ধকার অন্ধকার পরিবেশ। বিচিত্র ধরনের পাঁচমিশেলি সব লোকের বাস চারদিকে। এমন পাড়ার মধ্যে এই নামের একটা ফ্ল্যাটবাড়ি! কেমন যেন বেমানান লাগে!

দেবদত্ত দাঁড়িয়ে নজর করে চারদিক। কেউ কোথাও তেমন বসে আছে কিনা ওত পেতে। একটা লোক ময়দা ঠাসছে সামনের দোকানে। খালি গা, মাথায় গামছা জড়ানো। সে-ই কেবল দেখছে তার দিকে। নিতান্তই কৌতূহল হয়তো নতুন মানুষ দেখে।

বাড়িটার নীচের তলা প্রায় পুরোটাই নানারকম দোকানঘরে ভরা। আর একপাশে কোণাচে এক ফালি গ্যারাজ। ফুটপাথ জুড়েও দোকান। চা-তেলেভাজার রমরমে ব্যবসা। জল-কাদায় থিক থিক করছে রাস্তা।

হঠাৎ একটা ট্যাক্সি বেরোল। গ্যারাজ থেকেই সওয়ারি বসিয়ে নিয়ে ডান দিকে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই জল কাদা ছিটকোল রাস্তার। সামনে বড় একটা শরবতের গাড়ির আড়াল। তবুও দেবদত্ত আর রাতুল প্রায় লাফ দিয়ে উঠে পড়ে ফুটপাথে। বিশ্রীভাবে একটা ঝাঁকুনি খেয়ে যেন ছুটে গেল ট্যাক্সিটা। পিছনে বসা এক মহিলা। পিঠভর্তি এলো চুলের ঢাল···

দেবদত্ত বাড়িটার দিকেই দেখতে থাকে আবার। ওপরের তলার ঘরগুলো। পুরনো আমলের মতো টানা ঝুল বারান্দা। রং-বেরঙের খোপ খোপ পার্টিশান তার মধ্যে। পাখির খাঁচাও ঝুলছে দু'একটা ঘরের সামনে। ময়না, টিয়া, চন্দনা, বড় একটা ঝাড়ালো তুলসী গাছ। চন্দ্রমল্লিকার টব। চেহারা দেখেই বাসিন্দারের সম্বন্ধে একটা আন্দাজ করা যায় যেন।

দেবদত্ত বলল, এ তো দেখছি ফ্ল্যাটবাড়ির বস্তি একটা!

—যা বলেছেন। নামেই শুধু বাহার। রাতুল ঝোলা থেকে ক্যামেরা বার করতে করতে বলল।

দেবদত্ত বাধা দিল, নো রাতুল, নো। ওয়েট। কারও চোখ থাকতে পারে এখন আমাদের দিকে। আগে ভাল করে বুঝে নিতে দাও এরিয়াটা।

রাতুল সঙ্গে সঙ্গেই আবার ঝোলার মধ্যে চালান করে দিল ক্যামেরা। দেখল, লেমনেড-সোডার দোকানের লোকটা তাকিয়ে আছে তার দিকেই।

বিড় বিড় করে বলল, ছাড়া যাবে না। বাড়িটার চেহারা কিন্তু দারুণ ইণ্টারেস্টিং!

—অফকোর্স! যাবার সময় মোড় থেকে টেলিতে তুলে নিয়ো চুপচাপ। ভালই ছবি আসবে।

—ঠিক আছে। চলুন তাহলে এবার ঢুকে পড়ি ভেতরে—।

সিঁড়ির মুখেই বসে আছে একটা বুড়ো মতো লোক। খৈনি টিপতে টিপতে গল্প করছে অন্য আর একজনের সঙ্গে।

দেবদত্ত তার কাছেই এগিয়ে গেল।

বলল, ভাই, এই কোঠিতে রমা কয়াল নামে এক মহিলা থাকেন, তাঁর কাছে এসেছি আমরা। আপনি চেনেন তাঁকে, কোন নম্বর ফ্ল্যাটে থাকেন···

খৈনি টেপা বন্ধ হয়ে যায় লোকটার। হাঁ করে দেখে দেবদত্তর মুখের দিকে। একবার রাতুলের দিকে।

—এক বাবু তাঁকে ফ্ল্যাট দিয়েছেন এখানে···দেবদত্ত বলতে থাকে আবার।

—হাঁ, হাঁ, মালুম হ্যায়। রমাজি; সামনে বসা লোকটাই মাথা দোলাল আগে, চারতলা-ওয়ালি আউরত আছে। কিন্তু সে তো আভি বেরিয়ে গেল, সাহাব।

—বেরিয়ে গেল এই সকালেই! কখন বেরোলেন?

বুড়ো লোকটা এইবার মাথা ঝাঁকাল, আপনি দেখলেন না? আপনার সামনে দিয়েই তো ট্যাক্সিটা বেরিয়ে গেল।

—আই সি! ওর মধ্যেই ছিলেন তিনি?

—হাঁ বাবুজি। ও তো রমাজির নিজের ট্যাক্সি আছে।

—কোথায় গেলেন এখন?

—কেয়া পতা!

—গঙ্গায় চানটান করতে নয় তো?

—মালুম নেহি।

—ক'টা নাগাদ ফিরবেন মনে হয়?

—সো ভি কোই বলতে পারবে না। কুছু ঠিকানা নেই।

—আচ্ছা, ঠিক কখন এলে ওঁর সঙ্গে দেখা করা যেতে পারে? সেটা বলতে পারেন?

বুড়ো লোকটা আবার ভাল করে দেখল দেবদত্তর দিকে।

পরে মাথা নেড়ে বলল, দেখা হবে না।

—সে কী!

—কোই আনজান আদমির সঙ্গে দেখা করে না রমাজি। এখন তো অরভি করবে না।

—কেন?

—বহুত ঝামেলা হয়ে গেল যে সেদিন! রেসের মাঠ থেকে এক বাবু সাথ সাথ এসে জোর করে ঘুসল রমাজির ঘরে। তো রমাজিও ঘুসতে দেবে না···তাই নিয়ে দু'জনের খুব চেল্লাচেল্লি আর মারামারি—কেলু লাঠি চালাল শেষে। পুলিশ এসে গেল···সারা মহল্লা জুড়ে হাঙ্গামা তখন···

—কেলু! কেলু কে?

—কালাচাঁদ! রমাজির আদমি আছে ও। নোকরি করে।

—ও। তা কেলুবাবুর সঙ্গে দেখা করা যায় না একটু?

—ওভি তো বেরিয়ে গেল রমাজির সঙ্গে। দেখলেন না? সবসময় সঙ্গে থাকে। মালকিনের হুকুম ছাড়া এককদম চলবে না।

—আচ্ছা, রমাজির ঘরে চেনাজানা যে বাবু দেখা করতে আসেন, তাকে তো চেনেন আপনি?

—নায় বাবুজি। এতনা বড়া কোঠি কোন বাবু কোথায় যাচ্ছে, কে বলতে পারবে। রাত্তির বেলায় আমি ডিবটিও করি না।

—কেলুবাবু নিশ্চয় বলতে পারবে!

—হাঁ। লেকিন ও আপনাকে বলবে, তব না?

—হুঁ। সেটাও একটা পয়েণ্ট ···। ঠিক আছে ভাই, অনেক ধন্যবাদ। চলে এসো রাতুল, আর নয়—।

বলেই সোজা পিছনমুড়ে চলতে শুরু করল দেবদত্ত। আপাতত সময় নষ্ট করে কোনও লাভ নেই এখানে।

রাতুল চটপট তার মধ্যেই ক্যামেরার শাটারটা টিপে নিল দু'বার।

তারপর হাঁটতে হাঁটতে বলল, রমা কয়ালের কেসটা তাহলে কী হবে দাদা?

—যা হওয়া উচিত। মহীতোষবাবুর সঙ্গে সোজা ফোর্স নিয়ে এসে হানা দেব। মহিলা যে একটি কোয়েশ্চনেবল ক্যারেক্টার সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দরকার হলে ফ্ল্যাট সার্চও করতে হতে পারে।

—ওহ্ ভেরি গুড? তার মানে রিয়েল অ্যাকশান! পুরোপুরি শো ডাউন একটা। কেলুবাবু ভার্সেস মহীতোষবাবু! কেসটা ভালই জমবে মনে হচ্ছে···ট্যা-ক্সি! রোকো, রোকো···

কিন্তু ওরা খেয়াল করল না, যে ঠিক তখনই একজন চোখ পাকিয়ে দেখছে ওদের দিকে। অদ্ভুত হলদেটে দুটো চোখ! লোকটা সারাক্ষণ দু'জনকে নজর রাখছিল, অন্ধকার গ্যারাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে। দেয়ালে সেঁটে কথা শোনারও চেষ্টা করছিল। এইবার অন্ধকার ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। তাকিয়ে দেখল, দু'জনে একটা চলন্ত ট্যাক্সিকে দাঁড় করিয়ে উত্তর দিকে কোথায় চলে গেল।—

দত্তভিলার কাছে এসেই ট্যাক্সিটা দাঁড়াল।

আপনা থেকেই জঙ্গলের দিকে চোখ চলে যায় আগে। খাঁ খাঁ করছে সেই নিস্তব্ধ পোড়ো বাড়িটা। কোনও শব্দ নেই। আর আসবে না সেই পাগল! গান গেয়ে উঠবে না আর কখনও হঠাৎ হঠাৎ গলা তুলে······

কিন্তু তার বদলে পল্লবীর গান শোনা যায়। তার আদরের লাবি! সকালের রিওয়াজটা এখনও চলছে পল্লবীর ঃ

আমার সকল রসের ধারা!

তোমাতে আজ হোক না হারা……

সুন্দর সুরেলা গলা। একটু শুনতেই হয় যেন কান পেতে। ভারী গম্ভীর গলায় পরক্ষণেই সঙ্গে সুর মেলাচ্ছেন অন্ধ মথুরামোহন ঃ

জীবন জুড়ে লাগুক পরশ…… ভুবন ব্যেপে জাগুক হরষ…

সবমিলিয়ে এক স্নিগ্ধ মধুর পরিবেশ এখন দত্তভিলায়। তাপ জুড়িয়ে আনে মনের। তার মধ্যে এভাবে ঢুকে রসভঙ্গ করতে প্রবৃত্তি হয় না যেন। কিন্তু উপায় নেই আজ দেবদত্তর। কোনও উপায় নেই।

দরজার মুখেই পরিক্ষিৎবাবু। শর্টস আর গেঞ্জি পরা। ছোপ ছোপ জলের দাগ। নিজের হাতেই গাড়ি ধুয়ে বেরোচ্ছেন গ্যারাজ থেকে। দেবদত্তকে হঠাৎ সামনে দেখে চমকালেন!

বললেন, আরে! মিঃ চ্যাটার্জি, আপনি! কী ব্যাপার?

—গুড মর্নিং মিঃ দত্ত। একবার খোঁজ নিতে এলাম আপনাদের।

—ওহ্! সো নাইস অফ য়ু। গুড মর্নিং ইনডিড্! আসুন—আসুন। ভেতরে আসুন।

—আপনি বাইরে গিয়েছিলেন— ?

—হ্যাঁ, ভাইজ্যাগ। কালই ফিরেছি। সুখেন্দুর কাছে টেলিফোনে কাল খবর নিচ্ছিলাম আপনাদের—।

—আচ্ছা! আপনাদের সব ঠিকঠাক চলছে তো?

—চলে যাচ্ছে। কিন্তু আপনাদের তদন্তের কাজ কতদূর? কিছু বুঝতে পারলেন?

—তাহলে তো হয়েই গেল সব। দেবদত্ত হাসল, তবে অনেকটাই এগিয়েছি মনে হচ্ছে।

—বাহ! তাহলে তো ভালই। আমাকে আবার বেরোতে হবে একটু পরেই, বুঝলেন। আপনাদের জন্যে চা দিতে বলি আগে……

—আমরাও বসব না, তবে একবার রামদয়ালের সঙ্গে কথা বলে যাব একটু।

—কী বললেন?

—আপনাদের ড্রাইভারকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাই।

—রামদয়াল, স্ট্রেঞ্জ! ওই নিরীহ লোকটাকেও আপনার সন্দেহ? ঠিক আছে কথা বলুন। ও এখন পুজো করছে হয়তো।

—আর সরকারমশাইকেও একবার চাই।

—বলেন কী? তার সঙ্গে তো অনেকবার কথা বললেন! আবার!

—সরি! দু'একটা জিনিস আমাদেরই ভুল হয়ে গেছে…তাই…

গোঁফঅলা মুখটা বাড়িয়ে সরকারমশাই ঠিক তখনই উঁকি দিচ্ছেন ভেতরে। ভদ্রলোকের মাথায় বোধ হয় টেলিগ্রাফের তার আছে। অথবা হয়তো গন্ধেই টের পান, নতুন মানুষ কেউ পা দিয়েছে বাড়িতে।

ক্ষিতিবাবু দেখতে পেয়ে বললেন, ওই তো বলতে বলতেই হাজির তিনি। আসুন, ভেতরে আসুন সরকারমশাই।

ভেতরে ঢুকে নমস্কার করেন দেবদত্তকে তিনি।

পরিক্ষিৎ বললেন, এঁরা আবার কী সব জানতে চান আপনার কাছে, দেখুন। আপনার তো এখন উল্টোডাঙার দিকে বেরোবার কথা না, সকালে বলছিলেন?

—আজ্ঞে, সরকার মাথা চুলকে বললেন, তার আগে একবার আশুবাবুর বাড়িতে যেতে হবে। উল্টোডাঙায় ও-বেলা যাব।

—ঠিক আছে। মিঃ চ্যাটার্জি আমি রেডি হয়ে নিচ্ছি তাহলে। আপনি কথা বলে নিন। ক্ষিতিবাবু পা বাড়ালেন বাইরের দিকে।

—ও শিয়োর, থ্যাঙ্ক য়ু! একবার রামদয়ালকেও পাঠিয়ে দিন প্লিজ!

দেবদত্ত বলল, সরকারমশাই, আপনি সেদিন কিন্তু অনেক কথা বলেননি আমাদের।

—না স্যার, আমি তো আর কিছু জানি না। পা দু'টো কাঁপছে সরকার বাবুর।

—যদি একটা ছবি দেখাই আপনাকে? আপনার খুবই পরিচিত লোকের! তাহলে কিছু বলবেন তো, তাঁর সম্বন্ধে?

—ছবি! কই একবার দেখি স্যার। কার ছবি?

—দেখবেন, দেখবেন, ব্যস্ত কি। তার আগে একটু রামদয়ালের সঙ্গে কথাটা সেরে নি।

সরকার পাংশু মুখে ঘাড় গুঁজে বসে থাকেন।

রামদয়াল এসে ঘরে ঢুকল এবার। সঙ্গে চা-জলখাবারের প্লেট সাজিয়ে শ্রীমন্ত। রামদয়াল গম্ভীর মুখে সেলাম জানাল বাবুদের।

দেবদত্ত হাতজোড় করে বলল, বসুন, বসুন।

রামদয়াল বসে পড়ল ভূপালবাবুর পাশে।

দেবদত্ত কিছু বলতে গেল রামদয়ালকে। কিন্তু তার আগেই কর্তা পন্নগভূষণ এসে হাজির। পিছনে মেজো পুরন্দর। ওপর থেকে খবরটা পেয়েই দু'জনে হন্তদন্ত হয়ে নেমে এসেছেন।

পুরোবাবু বললেন, কী আশ্চর্য! আপনি এসে চুপচাপ এখানে বসে আছেন। আমি তো দাদার কাছে শুনলাম। কোনও খবর-টবর আছে নাকি, বলুন? কী-ভাবে যে দিন কাটছে আমাদের—

দেবদত্ত হাসল, খবরের সন্ধানেই তো ঘুরে বেড়াচ্ছি সকাল-সন্ধে পথে পথে।

আমাদেরও খুব সুখে কাটছে না দিন……। তবে অসময়ে এসে বোধ হয় আপনাদের একটু ডিসটার্ব করলাম……

—না না, এ কী বলছেন! আপনি নিশ্চয়ই আসবেন।

পন্নগবাবু বললেন, আপনাদের কাজের কী হল? ধরতে টরতে তো পারলেন না কাউকে।

—আজ্ঞে খুবই চেষ্টা করছি। হয়ে যাবে ঠিক।

—কোথায় চেষ্টা মশায় আপনার? ধরে ধরে আমার বিশ্বাসী লোকগুলোকে নিয়েই টানাটানি করছেন। একবার সরকার, একবার রামদয়াল। যত নিরীহ লোকগুলোকে ব্যতিব্যস্ত করা— এর নাম আপনাদের গোয়েন্দাগিরি!

বিরক্তিতে ভ্রু দুটো কুঁচকে উঠল দেবদত্তর। তবু নিজেকে সংযত করে। বলল আজ্ঞে, নিরীহ বলেই তো সত্যি কথাগুলো ওদের মুখ থেকে জানতে চাই।

—দূর মশাই! পন্নগবাবু গজগজ করে চলেন, যারা আসল শয়তান তারা ওদিকে দিব্যি বুক ফুলিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে! বাড়ির সামনে এসে চোখ গরম করে শাসানি দিয়ে যাচ্ছে, খবর রাখেন সে সব কিছু?

দেবদত্ত বলল, আমি সব জানি। আপাতত আমাকে দয়া করে একটু কথা বলতে দিন এদের সঙ্গে। আপনার প্রশ্নের উত্তর আমি পরে দেব। প্লিজ—

পুরন্দর কর্তাবাবুকে সামলান। বললেন, চলো বাবা—ওপরে চলো। কাজ করতে দাও ওঁদের—।

দেবদত্তের দিকে ফিরে বলল, মিঃ চ্যাটার্জি কথা শেষ হলে ওপরে আসবেন একবার। আমরা অপেক্ষা করছি।

দেবদত্ত মাথা নাড়ল, নিশ্চয়ই। থ্যাংক য়ু!

দেবদত্ত এবার রামদয়ালকে দেখে নজর করে। ফোঁটা তিলক কাটা গম্ভীর মুখ। বেঁটেখাটো চেহারার ওপর বেশ মজবুত গড়ন। বয়েস হয়েছে, তবু যাকে বলে পেটানো শরীর একটা। অসম্ভব নয়। এর পক্ষে কাজটা করে ফেলা অসম্ভব নয়। গায়ে রীতিমতো শক্তি আছে মনে হয়……

অন্যদিকে সরকারমশাই নিপাট ভাল মানুষের মতো চুপচাপ। পিট পিট করে দেখছেন। একবার দরজার দিকে, একবার তাদের দিকে। রামদয়ালের দিকেও দেখছেন মাঝে মধ্যে। গতিকটা যেন আন্দাজ করতে পারছেন না কিছুতেই।

দেবদত্ত বলল, সরকারমশাই, আপনাকে যে একটু বাইরে যেতে হবে। বেশিক্ষণ না, এই আধ ঘণ্টাখানেক। তার মধ্যেই রামদয়ালের সঙ্গে কথাটা সেরে নেবো। পরে বসা যাবে আপনার সঙ্গে, কেমন?

—যে আজ্ঞে, হুজুর।

সরকারমশাই উঠে পড়লেন মাথা নিচু করে। দরজাও ভেজালেন বাইরে থেকে।

তারপর দাঁড়িয়ে রইলেন নিঃশব্দে। রাতুল উঠে গিয়ে ছিটকিনিটা লাগিয়ে দিল ঝটপট।

দেবদত্ত আচমকা বলে উঠল, রামদয়ালজি, আপনি চিলেকোঠার ঘরে পুজো করেন।

—জি হুজুর।

—কখন?

—সকালবেলায় যখন টাইম হয়।

—আর রোজ রাত্তিরে ছাতের ওপর পায়চারিও করেন?

—নেহি হুজুর। বিলকুল নেহি। গরমি হলে ছাতের ওপর লেটে যাই বিস্তারা লাগিয়ে দু'চার রোজ। ব্যস অর কুছ নেহি।

—শুতে শুতে তো অনেক রাত হয় আপনার?

—হাঁ। সো তো হয় ······

—আচ্ছা রামদয়ালজি, খুনের দিন রাত্তিরে আপনি কখন ফিরেছিলেন মনে আছে?

—অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল··· করিব্ সাড়ে দশ-এগারো হবে······

—না। আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি··· রাত তখন দশটা···খুব ঝড় বৃষ্টি তুফান চারদিকে··· আপনি গাড়িটা নিয়ে ফিরে এলেন···

পুরো পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে বন্ধ ঘরটা। সরকার পায়চারি করছেন উদ-ভ্রান্তের মতো। কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। একবার ওপরে যেতে গিয়েও ফিরে এলেন। মনের মধ্যে বড় খিঁচখিঁচ করছে যেন।

অবশেষে হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল। ভারী মুখ করে পাশ থেকে বেরিয়ে গেল রামদয়াল। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে এবার সরকার ঢুকলেন।

দেবদত্ত বলল, না, এখানে নয়। চলুন আমরা আপনার ঘরে বসব সরকারমশাই। আরও একটু নিরিবিল চাই—।

—আজ্ঞে আমার ঘরে আপনাদের কষ্ট হবে হুজুর। সিঁড়ির নীচে একটা খুপরি, চারদিকে চাপা······

—সেই ভাল। কোনও কষ্ট হবে না আমাদের! চলুন—

—না হুজুর, অসুবিধে হবে খুব।

—মোটেই না। আপনি চলুন তো—

বৈঠকটা এবার সিঁড়ির নীচে খুপরি ঘরের মধ্যেই বসল। দত্তবাবুদের সম্মতি ছাড়াই দেবদত্ত প্রায় জোর করে ঢুকে পড়ল। সরকারবাবু না না করেও আটকাতে পারলেন না। নার্ভাস লাগে ভীষণ। তোলপাড় করা জেরার মুখে সেখানে বসে এবার তিনি ভেঙ্গে পড়লেন প্রায়।

চারদিকে চাপা গুহার মতো একটা ঘর। দরজা জানলাও বন্ধ ভিতর থেকে। তার মধ্যেই নিভৃতে গোপন আলোচনাটা চলে। কথা হচ্ছে খুব মৃদু গলায়। বাইরে থেকে প্রায় কিছুই শোনা যায় না। মাঝে মাঝে এক আধবার শুধু দেবদত্তর উত্তেজিত কন্ঠস্বর····· আর সরকারবাবুর আতঙ্কিত, ভীত গলায় বলা, না না স্যার ···আর হ্যাঁ···…হ্যাঁ·····

দেড় ঘন্টা কেটে গেল প্রায়। দেবদত্তর চোখে-মুখে উত্তেজনা। সরকার মুখ চুন করে বসে আছেন সামনে। আর কোনও শব্দ নেই। গোটা বাড়িটাই যেন নিস্তব্ধ হয়ে আছে। হঠাৎ তার মধ্যে পা টিপে টিপে কে যেন নামছে সিঁড়ি বেয়ে। ভারী পায়ের শব্দ! শব্দটা থেমে দাঁড়ায় এসে ঠিক দরজার সামনে। আর কোনও সাড়া নেই। চুপ একেবারে।

দেবদত্ত হাসল নিজের মনে। গলা তুলে বলল, ঠিক আছে সরকারমশাই আজ চলি তাহলে। অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে······না না, আর চা নয়······

বলতে বলতেই দরজাটা এক টানে খুলল, কেউ নেই বাইরে। ফাঁকা। দেখল চারদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে। তারপর বলল, কুইক রাতুল, মহীতোষবাবুর সঙ্গে কথা বলতে হবে একবার।

—এখান থেকেই একবার ফোন করে নিলে হত না, দাদা?

—না রাতুল, মুখোমুখি বসা দরকার। থানাতেই যেতে হবে আমাদের। আর নয়, লেটস গো—

—হুজুর, সরকার বললেন পেছন থেকে, কর্তাবাবুরা বসে আছেন আপনাদের জন্য।

—সরি, ভূপালবাবু। আজ আর কোনও মতেই সম্ভব নয়। আপনি বলে দেবেন······

কথাটা বলেই যেন একলাফে বেরিয়ে পড়ল দু'জনে।

২২

সরকারমশাই আর পারলেন না শেষ রক্ষা করতে।

রাত দশটাও বাজেনি। রাস্তাঘাট এ দিকটা ফাঁকা হলেও তখনও লোকজন চলছে। পার্কের আইসক্রিমঅলা রাতের বিক্রিবাটা শেষ করে হাঁড়িটা মাথায় চাপিয়ে ফিরে যাচ্ছে। একটা রিকশাঅলা ঠুনঠুন করে সওয়ারি নামাচ্ছে পানের দোকানের পাশে। তখনই ঘটনাটা ঘটল।

সরকার ঘুণাক্ষরেও কিছু টের পাননি। উল্টোডাঙা থেকে ফিরছেন। বাসে এসে সবে নেমেছেন বটতলার মোড়ে। চারদিকে তাকালেন সতর্ক হয়ে। সঙ্গে বেশ কিছু টাকা। উল্টোপাল্টা লোক দেখলে একটু বসে যাবেন না হয় সত্যভামা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে। তেমন কিছু বললে, সঙ্গে একজনকে দিয়েও দিতে পারেন অক্ষয়বাবু। বহুদিনের চেনা লোক দত্তপরিবারের।

কিন্তু না, তেমন কিছু মনে হয় না। মাঠের মধ্যে কয়েকটা ছোকরা অন্ধকারে বসে নেশাভাঙ করছে যথারীতি। ওটা প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা এদিকের। পার্কের মধ্যেও আবছা অন্ধকারে দু-একজন বসে এখনও। সব কেমন চুপচাপ। কোনও হই-হল্লার আওয়াজ নেই। জলা মাঠের দিকে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকার। ভিতরে কেউ আছে বলেও মনে হয় না। নেশাখোরদেরই গাড়িটাড়ি হবে।

সর্বদিকে ভাল করে দেখেশুনে নিয়ে, সরকারবাবু এগোতে লাগলেন। তাঁর একটু আগেই বেচুবাবুর ছোট ছেলে সাঁ সাঁ করে সাইকেল হাঁকিয়ে চলে গেল। সরকারও পা চালালেন চটপট। আর খানিকটা গেলেই খেয়ালি সংঘের মোড়। দত্তভিলা দেখা যায় দাঁড়ালে। কোনও ভয়ের কিছু নেই তেমন। নগেনবাবুর বস্তিতে লারেলাপ্পা গান বাজছে এখনও।

কিন্তু সেই মুহূর্তেই হঠাৎ কোথা থেকে গোঁ গোঁ করে ছুটে এল একটা জিপগাড়ি। এতক্ষণ ওত পেতে ছিল যেন জলা মাঠের ধারে চুপচাপ। সেই গাড়িটাই এবার ঝড়ের বেগে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর ওপর।

সরকারবাবু অনেক চেষ্টা করলেন লাফ দিয়ে পাশে সরতে। পারলেন না। চোখ দুটো যেন আঁধার হয়ে আসে। বুকের ভেতরটা ফেটে যায়। কারা যেন চিৎকার করল পেছন থেকে — সরকারবাবু-উ-সাবধান-সাবধান···

শেষ মুহূর্তে চেষ্টা করেছিলেন পুরোবাবুর মতোই নর্দমায় ঝাঁপ দিতে। কিন্তু তাও পারলেন না। মুহূর্তের মধ্যে তাঁকে ফেলে প্রায় পিষে দিয়ে গেল গাড়িটা। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দেহটা কাটা ছাগলের মতো ছটফট করতে করতে একেবারে স্থির হয়ে গেল!

লোকজন ছুটছে দু'ধার থেকে। একজন পুলিশকে দেখা গেল তার মধ্যে। চিৎকার করতে করতে তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে সবাই। কিন্তু গাড়িটাকে আটকানো গেল না। চোখের পলকে কাজটা করে সবার সামনে দিয়েই নিমেষে উধাও হয়ে গেল।

সরকারমশাইয়ের অচেতন দেহটা তেমনি মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে রাস্তার ওপর। একটু আগেই দিব্যি গুট গুট করে হেঁটে আসছিলেন ভদ্রলোক। মুহূর্তের মধ্যে কী হয়ে গেল! এখন রক্তের ধারা গড়িয়ে চলেছে তাঁর বুকের পাশ থেকে······প্রাণ আছে কি নেই, কেউ জানে না!······

দেবদত্ত শুয়ে পড়েছিল।

সারাদিন একটানা কাজের পর চোখ জড়িয়ে আসছে ঘুমে। তবু তার মধ্যেও মাথায় দপ দপ করছে নানা রকম চিন্তা। কালকের কাজের ছকটা। খুব চটপট সেরে ফেলতে হবে। মহীতোষবাবুকে নিয়ে রমা কয়ালের ঘরে রেড; আটঘাট বেঁধেই নামতে হবে, তারপর যেতে হবে……

টেলিফোনটা বেজে উঠল হঠাৎ। ক্রিং ক্রিং করে বেজেই চলে গভীর রাতের টেলিফোন।

তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবটা ঝেড়ে ফেলে রিসিভার তুলল দেবদত্ত, হেলো!

মহীতোষবাবুর গলা, স্যার, আমি মহীতোষ বলছি।

—কী ব্যাপার, এত রাতে!

—খুব খারাপ স্যার। সরকারমশাই হাসপাতালে! গাড়ি চাপা দিয়ে খুন করবার চেষ্টা করেছে কেউ। অবস্থা মোটেই ভাল নয়। বাঁচবেন বলে মনে হচ্ছে না।

—ও গড্! দেবদত্ত যেন বিলাপ করে ওঠে, এত তাড়াতাড়িই ঘটে গেল ব্যাপারটা! আমাদের বাঁচানো উচিত ছিল লোকটাকে, মহীতোষবাবু! কিন্তু চাপা পড়লেন কী করে?

—বাড়ি ফিরছিলেন রাত্তির করে বাস রাস্তা থেকে। পিছন থেকে একটা জিপ এসে সোজা চাপা দিয়ে বেরিয়ে গেছে। এ ক্লিয়ার অ্যান্ড ডেলিবারেট অ্যাটেম্পট টু মার্ডার। এতে কারও কিছু করার নেই, স্যার।

—মাই গুডনেস! আপনাকে যে এক জন পুলিশ পোস্টিং করতে বলেছিলাম রাস্তায়?

—পুলিশ তো ছিল দত্তভিলার সামনে। বাড়িটার দিকেই নজর রাখছিল। আর ঘটনা তো ঘটল অনেক দূরে, প্রায় পার্কের কাছাকাছি। কালপ্রিট মোড়ের মাথায় চুপচাপ বসেছিল গাড়ি নিয়ে। এত দূর থেকে বুঝবে কী করে সেটা আমার লোক?

—আরও একটু অ্যালার্ট থাকা উচিত ছিল আপনার অফিসারের। খানিক টহল দিয়ে বেড়ালেও হয়তো এটা ঘটতে পারত না।

—কিন্তু কালপ্রিট যে সরকারবাবুকেই টার্গেট করে বসে আছে, তা কী করে বুঝবে।

—ইঙ্গিত আমি একটা দিয়েছিলাম, আপনি বুঝতে পারেননি, মহীতোষবাবু। এখন বোধহয় দুটো খুনের কেস চাপল আপনার মাথার ওপর…… যাক গে, যা হয়ে গেছে, তার ওপর আর কোনও হাত নেই আমাদের।

—ভেরি সরি স্যার। বুঝলে আমি নিজেই রাউন্ডে বেরোতাম।

—আর ভেবে লাভ নেই ওসব। এখন বলুন ডাক্তার কী বলছে, কোনও আশা নেই?

—না স্যার। অক্সিজেন চলছে। জ্ঞান ফেরেনি, ফিরবে বলেও মনে হচ্ছে না! আপনি কি একবার এসে দেখবেন?

—এখন আর কী লাভ, এত রাতে ছুটোছুটি করে! আপনার কথা শুনে তো মনে হচ্ছে টোটালি লস্ট কেস।

—তা প্রায় একরকম ধরেই নেওয়া যায়। ব্রেনেই চোটটা সবচেয়ে দারুণ। হেমারেজ হচ্ছে ইণ্টারনাল।

—তবে? তার মানে কোনওরকম স্টেটমেণ্টই পাচ্ছি না আমরা। সব কথা মনের মধ্যে নিয়েই চলে যাচ্ছেন সরকারবাবু। মালিকের বিশ্বাস রাখতে নিজের জীবনটাই দিয়ে গেলেন ভদ্রলোক! ভাবা যায় না।

—আপনি সকালে আসছেন কি?

—ও শিয়োর। আর্লি মর্নিঙে চলে যাচ্ছি আমি আর রাতুল। আপনি কিন্তু ফোর্স রেডি রাখবেন। যে কথা হয়ে আছে আপনার সঙ্গে—আধঘণ্টার নোটিশে বেরিয়ে পড়তে হবে কিন্তু।

—মনে আছে স্যার। সব ঠিক ঠিক ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

—আচ্ছা, যে গাড়িটা চাপা দিয়েছে, তার কোনও হদিশ কিছু……

—নম্বরটা নোট করে নিয়েছে স্যার, আমার লোক। কাল বার করে ফেলব মালিকের নাম।

—খেপেছেন আপনি? নাম্বার প্লেটটা কখনও আসল ছিল না! এই রকম একটা অ্যাকশনে প্ল্যান করে বেরিয়েছে যখন, তখন কি আর আসল নম্বরটা নিয়ে বেরুবে আসামি? অসম্ভব।

—সে অবশ্য ঠিকই বলেছেন। সন্দেহটা আমারও হচ্ছে। তবু একবার দেখতে তো হবে।

—নিশ্চয়ই দেখুন। কিন্তু গাড়িটার চেহারা কী রকম, শুনেছেন কিছু?

—বলছে তো মিলিটারি জিপের মতন। রংটাও সেরকম, লেফট হ্যাণ্ড ড্রাইভ। উইণ্ড শিল্ডের সামনে ঝোলানো বড় একটা খেলনা পুতুল— ব্যালেরিনার মতো। ডান্সিং ব্যালেরিনা!

—কোনওটাই পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না। তবুও দেখা যাক। এনিওয়ে, থ্যাঙ্ক য়ু মহীতোষবাবু। কাল সকালে দেখা হচ্ছে আবার। এখন কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিতে দিন।

—উইশ য়ু এ ভেরি গুড নাইট স্যার।

—গুড নাইট মহীতোষ। য়ু অলসো টেক সাম রেস্ট নাও।

টেলিফোনটা নামিয়ে রাখল দেবদত্ত।

সকাল সকালই বেরোবার জন্য প্রস্তুত দেবদত্ত। রাতুলও তার ঝোলা নিয়ে তৈরি হয়ে এসেছে।

তখনই হঠাৎ টেলিফোন বাজল আবার। এবার সুখেন্দু টেলিফোন করছেন। খুবই উদ্বিগ্ন গলা। তাড়া থাকলেও বসে একটু কথা বলতে হয় দেবদত্তকে।

খবরটা পেয়েই ভীষণ আপসেট হয়ে পড়েছেন ভদ্রলোক। সুর পাল্টে গেছে।

বারবার বলতে লাগলেন, এ কী শুরু হয়ে গেল মিঃ চ্যাটার্জি!

আমি তো ভাবতেই পারছি না…কতদিন আর চলবে এ রকম, বলতে পারেন… কী সাংঘাতিক!

দেবদত্ত সংযত হয়ে বলে, মনে হয় না, আর বেশিদিন চলবে। থেমে যাবে এবার, আশা করি।

—আপনি বলছেন! আমি তো ভরসা পাচ্ছি না। শেষে সরকারমশায়ের মতো নিরীহ মানুষেরও এই দশা হল।

—ভেরি স্যাড। ব্যাপারটা সত্যিই খুব দুঃখের, ভাবতে আমার খারাপ লাগছে মিঃ বোস। হয়তো আমরা ঠিকমতো সতর্ক থাকতে পারিনি। অবশ্য জানি না। তাহলেও বাঁচাতে পারতাম কি না!

—কেন, এ কথা বলছেন কেন? আপনি কি কিছু আন্দাজ করেছিলেন?

—ঠিক তা নয়! তবু ভয় তো একটা ছিলই।

সুখেন্দু হঠাৎ চুপ করে গেলেন।

পরে অদ্ভুত গলায় বললেন, এবার তাহলে কার পালা, মিঃ চ্যাটার্জি?

—এখনই কি বলা সম্ভব সেটা? তবে যতোদূর মনে হয়, আর নয়, মিঃ বোস! এই শেষ। জাস্ট, একটু সাবধানে থাকবেন আপনি।

—কী সাবধান হব! কখন যে কী ঘটে যায়! রীতিমতো চিন্তা হচ্ছে আমার! ছোকরা কয়েকদিন আগে এসে একবার থ্রেট করে গেল, তারপরই এই খুনের কাণ্ড! এখানেই কি থামবে ও…নাকি…

—আরে না না, ওর জন্যে এত ঘাবড়াবার কারণ নেই। দেখুন না, কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায় এবার! কিন্তু আপনি সরকারবাবুর খবরটা পেলেন কখন?

—এই তো সকালে উঠেই। আমি দু'তিনদিন ওদিকে যাইনি…টেলিফোনে খবরটা শুনে একেবারে থ হয়ে গেছি…কী আশ্চর্য! শেষ পর্যন্ত সরকারবাবুর মতো একজন মানুষকেও ওরা ছাড়ল না ‥ এর পর কি …

—টেলিফোনটা আপনাকে কে করল, মিঃ বোস।

—কেন, ক্ষিতি। বলল, রাত্তিরে ইচ্ছে করেই আর ডিসটার্ব করেনি আমাকে। গিয়ে লাভও কিছু হত না। বাড়িসুদ্ধ ওরা কেউ কাল ঘুমোয়নি ভাল করে। গোটা রাত ভয়ে ভয়ে কাটিয়েছে…

—স্বাভাবিক। এমন একটা বিপদ ঘটে গেল, ঘুম না হবারই তো কথা। ঠিক

আছে মিঃ বোস, তাহলে এখন রাখছি। একবার হাসপাতালের দিকে যেতে হবে আমাদের।

—সরকারমশাইকে দেখতে ?

—হ্যাঁ একবার ব্যাপারটা দেখে আসা দরকার। যদি কোনও আশা থাকে।

—নিশ্চয়ই। আমিও যাব। একটু অপেক্ষা করুন না, প্লিজ। আমি তুলে নিচ্ছি আপনাদের দুজনকে।

অগত্যা আর কী করা। একটু অপেক্ষা করতেই হয় দেবদত্তকে। ব্যস্ত হয়ে ঘড়ির দিকে দেখল। নতুন করে সময়ের হিসেবটা করে মনে মনে। মহীতোষবাবুকে নিয়ে বেরোবার আগে, দত্তবাবুদের বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। কার কী রকম রি-অ্যাকশন ? বুঝতে হবে ভাল করে! কে কে বাইরে ছিলেন তখন!

লোকাল এনকোয়ারিতেও যেতে হবে একবার। ভাল করে স্টাডি করতে হবে স্পট্‌টা। রক্তের দাগগুলো ; টায়ারের চিহ্ন-টিহ্ন সব। কোন দিক থেকে কীভাবে এসে বেরিয়ে গেল গাড়িটা ? ভিতরে ক'জন ছিল। ডান্সিং ব্যালেরিনা! সত্যিই কি ছিল পুতুলটা সামনে ? প্রত্যক্ষদর্শীর স্টেটমেন্ট চাই, দু-একজনের। ঠিক সেই মুহূর্তে সামনাসামনি গাড়িটাকে দেখেছে এমন কেউ।

বডিটা কতক্ষণ পড়েছিল রাস্তায় ? দত্তবাড়ি থেকে কে এল প্রথম ? কারা গেল হাসপাতালে নিয়ে—খুঁটিনাটি অনেকগুলো কাজ পরপর। তারপর শুরু আসল অভিযান।

সেই অভিযানের চিন্তাটাই কাল থেকে ঘুরছে মাথায়। সব সময় ঘুরছে। আর দেরি করা যায় না। আজকের মধ্যেই যা হোক একটা কিছু হেস্তনেস্ত করে ফেলতেই হবে। না হলে অনেক কিছু ওলটপালট হয়ে যেতে পারে।

অশুভ বা অমঙ্গলের জন্য কাল হরণ হয়তো শাস্ত্রের নির্দেশ। কিন্তু দোষীদের সন্ধান পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়া সঙ্গে সঙ্গে—অপরাধ বিজ্ঞানের নিয়ম। সাবধান হওয়ার কোনও সুযোগ না দেওয়া তাকে। এই নিয়মটাকেই মেনে চলতে হবে এখন···

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে মুখটা কী এক কঠিন সংকল্পে দৃঢ় হয়ে ওঠে দেবদত্তর। আর একবার অধৈর্য দৃষ্টিতে হাতঘড়িটার দিকে দেখল।

রাতুল চুপচাপ বসে ছিল। ডায়েরিটা ওল্টাচ্ছিল নিজের। পড়তে পড়তেই হঠাৎ মুখ তুলে বলল, একটা ঘটনা কিন্তু অদ্ভুত লাগছে আমার!

—কোনটা বল তো ? দেবদত্ত সজাগ হয়ে তাকাল।

—দত্ত ফ্যামিলিতে এমন একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়ে গেল, আর সুখেন্দু বোস এখনও হাজির হননি স্পটে। ব্যাপারটা আশ্চর্য না ?

—ও ইয়েস! আই এগ্রি উইথ য়ু। দেবদত্ত মাথা নাড়ল।

—আসলে বলতে গেলে তিনিই তো ওবাড়ির সবার ফ্রেণ্ড, ফিলজফার অ্যাণ্ড গাইড। ইকোনমি থেকে ইমোশান সব রকম সমস্যাই তিনি কণ্ট্রোল করেন দত্ত-ভিলার, তাঁর কাছেই খবর পোঁছল না। তিনি এখনও দেখতে গেলেন না তাঁর একান্ত অনুগত আর বিশ্বাসী সরকারমশাইকে। এটা কিন্তু ভাবা যায় না দাদা। নিশ্চয়ই কোথাও একটা গণ্ডগোল হ্যাজ।

দেবদত্ত মৃদু হাসে, সেটাই তো ঘটনা রাতুল! তোমার সুখেন্দুদা সত্যিই যেন একটু অ্যালুফ হয়ে পড়ছেন দিনে দিনে। কিছুটা আপসেটও!

—আলাদা হয়ে যাচ্ছেন বলছেন?

—ঠিক আলাদা নয়, একটু যেন বিরত আর নিরাসক্ত।

—কিন্তু কারণটা কী? সুখেন্দুদার মতো ব্যক্তিত্বের মানুষের পক্ষে এটা তো স্বাভাবিক নয়।

—জটিল প্রশ্ন। বোঝার চেণ্টা করছি এখনও।

—পল্লবী দত্তের জন্যে ফ্রাস্‌ট্রেশান? কিন্তু সেটা নতুন কিছু নয়।

—না, তা নয়।

—তবে? তাঁর মতো এমন একজন বুদ্ধিমান, করিতকর্মা আর প্রভাবশালী লোক হঠাৎ এতদিন পরে এভাবে মুসড়ে পড়বেন, ঠিক বিশ্বাস করতে পারি না।

—আমিও না রাতুল। দেবদত্ত রহস্য করে তাকায় তার দিকে।

ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরে সুখেন্দুর গাড়ির হর্ন শোনা যায়।

দেবদত্ত বলল, ওই যে তোমার অদ্ভুত আর জটিল চরিত্রটি এসে গেছেন। চলো আর দেরি নয়, কুইক—

পোঁছোতে তবু দেরিই হয়ে গেল বেশ। সরকারমশাই মৃত্যুর সঙ্গে তখনও লড়াইটা চালিয়ে যাচ্ছেন। সঙ্কটজনক অবস্থা! বুকে পিঠে ব্যাণ্ডেজ। ড্রিপ চলছে, চোখ দুটো বোজা! বিকৃত মুখে অক্সিজেন মাস্ক লাগানো। নিশ্বাস পড়ছে কি পড়ছে না, বোঝা যায় না।

মরণ যেন শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে। ফিরবেন আর, এমন মনে হয় না। তবু চেণ্টাটা চলছে যতক্ষণ টিকিয়ে রাখা যায়। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।

সুখেন্দু চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন। চোখ দুটো করুণ। বহুদিনের পরিচিত লোকটি বিদায় নিচ্ছেন এভাবে। যেন সহ্য হয় না। দেবদত্তের দিকে একবার তাকিয়ে মাথা নিচু করে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন কেবিন থেকে।

দেবদত্তরও মনটা খারাপ লাগে। ভদ্রলোক অনেক নিগ্রহ সহ্য করেছেন! কতভাবে না বোঝার চেণ্টা করেছে তাঁকে! এখন তিনি সব বোঝাপড়ার বাইরে। আপনা থেকেই একটা নিশ্বাস পড়ে।

ডাক্তারবাবু সকালের রাউণ্ডে এসে ঘুরে গেছেন। রিপোর্টগুলো খুঁটিয়ে

সিস্টারের কাছেই জেনে নেয় দেবদত্ত। ইনজুরিটা কোথায় এবং কী ধরনের সে সম্বন্ধেও তথ্যগুলো জোগাড় করে। তারপর রাতুলকে নিয়ে ঘর ছেড়ে বাইরে আসে।

মহীতোষবাবুর থাকার কথা ছিল। নেই আশেপাশে। দেবদত্ত চিন্তা করে একটু।

টুলের ওপর ওধারে পুলিশ বসে আছে একজন। তার কাছে গিয়েই খোঁজ নেয়।

শুনল, অপেক্ষা করে করে নাকি, একটু আগেই চলে গেছেন তিনি। জরুরি একটা কাজে। এক ঘণ্টার মধ্যেই আবার ফিরবেন।

রোগী দেখতে দত্তবাড়ির সায়েবরাও সব এসেছিলেন তখন। এখন আছেন শুধু বুড়োকর্তা আর তাঁর স্ত্রী।

দেবদত্ত দেখতেই পাচ্ছিল, বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসে আছেন দুজনে। সঙ্গে সুখেন্দুও আছেন। পুলিশের লোকটি তবু আঙুল দিয়ে দেখাল, ওই যে স্যার, ওঁরা।

দেবদত্ত আস্তে আস্তে কাছে এসে দাঁড়াল।

পন্নগভূষণ আর সুবর্ণময়ী দুজনের চোখেই জল। সবচেয়ে প্রিয় আর পুরনো লোকটিকেই হারাতে বসেছেন তাঁরা। কোন সর্বনেশে এক খুনির চক্রান্তে।

দুঃখটা যেন পন্নগভূষণেরই বেশি। দেবদত্তর হাতটা ধরে কেঁদে ফেললেন হঠাৎ, এ কী হল মিঃ চ্যাটার্জি! এ কী সর্বনাশ হয়ে গেল! সরকার আমাদের কী দোষ করল, বলুন! কত দিনের আপদ-বিপদের বন্ধু আমার—ওহ্! হো-হো!

দুঃখটা খুবই আন্তরিক কর্তাবাবুর। দেবদত্ত হাতটা চেপে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে একটুক্ষণ। যেন এভাবেই কষ্টের ভার কমিয়ে দিতে চেষ্টা করে তাঁর।

পরে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, আমাদেরও খুব খারাপ লাগছে, মিঃ দত্ত। কেউ ভাবতে পারিনি এমন একটা সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটে যাবে। তবে আমি কথা দিচ্ছি আপনাকে, এই খুনের পিছনে যারা আছে তাদের আমি হাজির করবই আপনার সামনে—আই মাস্ট ব্রিং দেম টু বুক।

কর্তাবাবু নিঃশব্দে মাথা নাড়তে নাড়তে চোখের জল ফেলতেই থাকেন। বললেন, কিন্তু আমার মনের কথা বলার, একটা পরামর্শ দেবার লোক আর কেউ রইল না··· আমি যে···

সুখেন্দুবাবু এবার শান্ত করতে চেষ্টা করেন তাঁকে।

মহীতোষ হাজির হয়ে গেলেন একটু পরেই। চানটান করে বেশ তাজা হয়েই এসেছেন। পরনে নতুন পাটভাঙা ইউনিফর্ম। কোমরের চকচকে পালিশ করা রিভলভার হোলস্টার, বুকের পাকানো হুইসিল কর্ড—সব কিছুর মধ্যেই যেন একটা আসন্ন অ্যাকশনের প্রস্তুতি।

দেবদত্ত হাত বাড়িয়ে দিল, গুড মর্নিং মিঃ ঘোষাল।

—গুড মর্নিং স্যার। উচ্ছ্বসিত হয়েই যেন হাতটা ধরে ঝাঁকালেন মহীতোষ, একটু দেরি করে ফেললাম বোধহয় আমি।

—নো নো। নট অ্যাট অল। চলুন বেরিয়ে পড়া যাক—।

—শিয়োর স্যার।

সুখেন্দুর দিকে ফিরল দেবদত্ত, যাবেন নাকি আমাদের সঙ্গে, মিঃ বোস? স্পটু এনকোয়ারিতে যাচ্ছি আমরা। আপনিও আসুন না, সব কিছু দেখে নেবেন ভাল করে।

সঙ্গে সঙ্গেই সুখেন্দু উঠে পড়লেন। পন্নগবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলেন সঙ্গে।

বাইরে গাড়ি ভর্তি পুলিশ। পাশে মহীতোষবাবুর জিপ। দেবদত্ত মহীতোষবাবুর পাশেই বসল। রাতুল সুখেন্দুবাবুর সঙ্গে। তারপর একটা কনভয়ের মতো চলে যেন পুরো বাহিনী। মহীতোষবাবুর গাড়িটা লিড করে আগে আগে।

দেখেশুনে একটু যেন অবাক লাগে সুখেন্দুর। এত প্রস্তুতি কীসের জন্য! তবু কোনও প্রশ্ন করেন না। গম্ভীর হয়েই বসে থাকেন আগাগোড়া।

ভিড় জমে গেল লোকের। দত্তভিলার আশেপাশে চারিদিকে পুলিশ এখন। কয়েকজন মাপজোখ করছে জায়গাটা, অ্যাকসিডেন্টের। হাঁকডাক করা ইন্টারোগেশনও চলছে মহীতোষবাবুর। একবার টুঁ করলেই পেটের কথা টেনে বার করছেন সব।

রাতুল ব্যস্ত তার ক্যামেরা নিয়ে। আপাতত টেলি লাগিয়ে দত্তবাড়ির দিকেই ফোকাস করল। পল্লবী দাঁড়িয়ে বারান্দায়। আস্তে আস্তে সেন্টারে আনে ফিগারটা…

সুখেন্দু চুপি চুপি দেবদত্তকে বললেন, মিঃ চ্যাটার্জি। স্পটটা কিন্তু একই। এখানেই রাজেশের দল পুরোকে মার্ডারের অ্যাটেম্পট নিয়েছিল। খেয়াল করেছেন সেটা! আর যাকে বলেন 'মোডাস অপারেন্ডি'—তাও একেবারে এক ধরনের। ভুট্টা এই স্টাইলেই অ্যাটাক করেছিল পুরন্দরকে…

—রাজেশ ঠাকুর, না? ইয়েস, মিল, একটা আছেই। দেবদত্ত ভাবে গম্ভীর হয়ে।

—তা ছাড়া, কয়েকদিন আগেই ও শাসিয়ে গেছে সরকারবাবুকে খতম করে দেবে বলে। তারপর এই কাণ্ড! নিশ্চয় এই খুনের পেছনে ওই শয়তানটার মাথাই আছে। আপনি মিলিয়ে নিন।

—থ্যাঙ্ক য়ু মিঃ বোস। আপনার ভাবনাটা নিখুঁত। কিন্তু আমি আরও একটু ভেতরে যেতে চাই এবার—।

ঘড়ি দেখে মহীতোষের দিকে কী ইঙ্গিত করল দেবদত্ত। সঙ্গে সঙ্গেই লাফিয়ে জিপে উঠে স্টার্ট দিলেন তিনি। দেবদত্ত আর রাতুলও উঠে পড়ল চটপট। পিছনে আর্মড ফোর্স।

সুখেন্দু অবাক হয়ে বললেন, এ কী। কোথায় চললেন আপনারা!

—খুব কাছেই মুখ ফিরিয়ে বলল দেবদত্ত, কিন্তু আর কিছু জানতে চাইবেন না।

—মানে?

—মাত্র দুটো দিন, সুখেন্দুবাবু। তারপর সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন।

গাড়ি দুটো ঝড়ের বেগে ছুটল বড় রাস্তার দিকে। সুখেন্দু কিছুই বুঝতে পারেন না। ভারী মনে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন একদৃষ্টিতে।

২৩

অপারেশন জি. কে.— অর্থাৎ অপারেশন গৌরীকুঞ্জ! ভালই সাকসেসফুল হল শেষ পর্যন্ত।

দেবদত্ত যতটা আশা করেছিল, তার চেয়েও যেন বেশি। অনেকগুলো অনুমানই মিলে গেল তার! অবশ্য ছকটাও সাজানো হয়েছিল বেশ আটঘাট বেঁধে।

সকাল থেকেই একটা থমথমে পরিবেশ চারদিকে। কেউ ঘেঁসতে পারে না জি. কে.-র মধ্যে। বেরোতেও না। চ্যাঁ-চ্যাঁ করে বিশ্রী গলায় একটা টিয়া পাখি চেঁচায়। ঝুল বারান্দায় বেরিয়ে আসে এক মোটাসোটা মহিলা। আলুথালু পোশাক। পেশাদারি চোখ ঘুরিয়েই বোঝে বাইরে হাওয়া গরম। হেবোর দোকানের দিকে নজর করে। হ্যাঁ যা ভেবেছিল তাই, পুলিশ! একটু দেখেই আবার ভিতরে ঢুকে যায়।

ভোরবেলাতেই দুজন ফোর্স পোস্টিং হয়ে গেছে, লোকাল থানার। পিছনে গলির মুখে একজন ওয়াচার। তখনও পুরো ঘুম ভাঙেনি ফ্ল্যাটবাড়িটার। তার মধ্যেই জোর কদমে কাজ শুরু হয়ে গেছে। ছকটার মধ্যে কোনও ফাঁক রাখতে চায়নি দেবদত্ত। প্রতিপক্ষ অত্যন্ত হুঁশিয়ার। যে কোনও মুহূর্তে চোখে ধুলো দিয়ে চম্পট দিতে পারে।

সেই জন্যেই আগে থেকে পাহারার ব্যবস্থা।

গ্যারাজ থেকে ট্যাক্সি বের করতে ড্রাইভার আজ বাধা পায়। বলা হল, স্টার্ট বন্ধ করে সেখানেই বসে থাকতে! যতক্ষণ না সাহেবরা এসে পৌঁছচ্ছেন। তারপর দেখেশুনে তাঁরা ঠিক করবেন যা করার।

একটু পরে কেলুকে নিয়ে রমা কয়ালও বেরিয়ে এল। সেই সন্দেহজনক মহিলা! চারদিকে দেখেশুনে পা টিপে টিপে নামল সিঁড়ি বেয়ে। কিন্তু পুলিশ তাকেও আটকায়।

বলল, নেহি জি। আভি নেহি। পহেলে সাব্‌লোক কো আনে দিজিয়ে। উসকো বাদ, যাঁহা মর্জি যা না—

কেলু তেড়ে আসে সঙ্গে সঙ্গে বুক ফুলিয়ে, কাঁহে নেহি—।

দু একজন সাঙ্গোপাঙ্গরাও মুখ বাড়ায় পাশ থেকে, এই দিনের বেলায় কেন ঝামেলা পাকাতে এসেছ বাওয়া! কেটে পড়ো, কেটে পড়ো—

ঢুলু ঢুলু চোখে সব দুলছে এখনও কথা বলতে বলতে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর এগোতে সাহস পায় না কেউ। পুলিশের ভাবভঙ্গি যেন আজ একেবারে অন্যরকম। বন্দুক কাঁধে পাথুরে মুখে দাঁড়িয়েই আছে। কোনও মতলব আছে নিশ্চয়ই।

রমা কয়াল ওপরে উঠে গেল। কেলুর সঙ্গেই শলাপরামর্শ চলে ঘরে বসে। কী করা যায় এখন? চারদিকে পুলিশ। বাথরুমের পাইপ বেয়ে এক নামা যায় পিছনের গলিতে। অন্তত কেলু যদি বেরিয়ে যেতে পারে সেই পথে। পিঠে বস্তার মধ্যে কিছু মাল ঢুকিয়ে? তাহলে? আর কিছু না হোক, কেলু তো জালের বাইরে চলে যাবে। ও থাকা মানে আরও বিপদ! মাথা ঠিক রাখতে পারে না। কী বলতে কী বলে শেষে সবাইকে ফাঁসাবে।

অনেক ভেবে শেষে কালাচাঁদ উঠল। বাথরুমের জানলা দিয়ে পেছনের গলিটা দেখতে থাকে। এই চারতলার ওপর থেকে চটপট পাইপ বেয়ে নামা চাট্টিখানি কথা নয়। পুরনো পাইপ। জায়গায় জায়গায় জং ধরে এসেছে। ঢিলেও হয়ে গেছে অনেক। আগের দিনে এসব কাজ হামেশা করেছে সে। এখন অভ্যেসটা যেন চলে গেছে।

তবু জানলা দিয়ে মাথাটা গলিয়ে ভাল করে দেখতে থাকে নীচের চেহারা। হা হা খোলা জানলা পশ্চিমের। কোনও শিক বা গ্রিল কিছু নেই। নীচে সরু জমাদার খাটার গলি। ডাঁই করা রাজ্যের নোংরা, ময়লা। মাথাটা গলিয়ে অনেকটা ঝুঁকে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে কালাচাঁদ।

আর তখনই চোখে পড়ে গলির মুখে রাস্তার ওপর একটা লোক। এই দিকেই তাকিয়ে আছে। প্রায় চোখাচোখি হয়ে যায় কেলুর সঙ্গে। আই শ্বাস্! নিঘ্যাত খোঁচড়! জানলাটা ঝপ করে বন্ধ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

একটু পরেই আরও তিন চারজন পুলিশ এসে নামল। আগাম বাহিনী মহীতোষবাবুর। একজন একজন করে দাঁড়িয়ে গেল। বাড়ির সামনে পিছনে, চার-

তলায় রমা কয়ালের ঘরের সামনেও একজন। আঁটোসাঁটো পাহারা। আগাম দলটা পাঠিয়ে প্রায় ঘেরাও করা হয়ে গেল গৌরীকুঞ্জ!

চারদিকে অদ্ভুত একটা আতঙ্কের ভাব। যে যেখানে আছে সেখানেই বসে থাকে চুপচাপ। একমাত্র রমা কয়ালই অস্থির। ভয়ঙ্কর একটা কিছুর আঁচ পেয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ঘরময়! টানছে এটা ওটা ধরে। চালান করছে ঠেলে ঠেলে খাটের তলায়। দড়াম করে একটা ফুলদানি ভাঙল মেঝেতে পড়ে⋯ঝন্ ঝন্ শব্দ⋯

ভীষণ উত্তেজনা-ভরা একটা পরিবেশ। পাখিটাও আবার চেঁচাল ট্যাঁ ট্যা করে! আর তখনই পর পর দুটো গাড়ি এসে থামল বাড়ির সামনে। একটা জিপ, একটা ভ্যান। দেবদত্ত আর রাতুল প্রায় লাফিয়েই নামল সামনের জিপ থেকে। সঙ্গে মহীতোষবাবু।

অন্য গাড়িটা থেকে নামল আরও একদল ফোর্স। নেমেই পজিশান নিয়ে নেয় যে যার।

অ্যাকশান শুরু হয়ে গেল। দেবদত্ত আর মহীতোষবাবু গটগট করে এগিয়ে চলেন ওপরে। থমথমে গম্ভীর মুখ। পিছনে কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে রাতুল। উঠতে উঠতে চারদিকে চোখ রেখে দ্রুত দেখে নিচ্ছে আশপাশ⋯

ঠিক যেন একটা নাটক। ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছোনো নাটক।

প্রায় ঝাড়া দু ঘন্টা ধরে চলল অপারেশন জি. কে.। কিন্তু তারপরও ইনভেস্টি-গেশান থামে না দেবদত্তর। ঝড়ের মতো শুরু হয় নতুন অভিযান।

প্রথম দফায় চলে তন্ন তন্ন করে সার্চ। তারপর জেরার পালা। নরমে গরমে একের পর এক জেরা। সেখান থেকেই বেরিয়ে এল এক নতুন সূত্র! তার জন্যেই আবার ছুটতে হয় হাওড়ায়। এক বস্তিতে গিয়ে হানা দিতে হয়।

দিনভর ঠাসা প্রোগ্রাম। একটার পর একটা। খাওয়া দাওয়ার কোনও অবকাশ মেলে না। মহীতোষবাবুরও সে সব দিকে আজ আর হুঁশ নেই। অদ্ভুত উৎসাহে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন দেবদত্তর সঙ্গে। মনে মনে উত্তেজিতও খুব। কখন কী হয় আবার, কখন কী হয়! রহস্যের জটটা যেন একটু একটু করে খুলে যাচ্ছে তাঁর চোখের সামনে। ভাবতেও পারেননি এমন সব অদ্ভুত কান্ডকারখানা!

ইতিমধ্যে আসামি গ্রেফতার হয়ে গেছে একজন। আরও দুজন রাঘব বোয়ালকে ধরার ব্যবস্থা প্রায় পাকা। শুধু একটু সময়ের অপেক্ষা। কালকের মধ্যেই হয়ে যাবে।

সারাদিনের হা-ক্লান্ত শরীরেও তাই উৎসাহের কমতি নেই মহীতোষবাবুর। বিকেলে দেবদত্তর ঘরে বসে নতুন প্ল্যানটা নিয়ে আলোচনা করতে থাকেন আবার। মনোযোগ দিয়ে পরামর্শগুলো শোনেন দেবদত্তর। ডিটেক্শানের পর পর ছকটা। তার সঙ্গে জড়ানো খুচরো কিছু কাজ।

চায়ের সঙ্গে গরম লুচি ভেজে আনল সনাতন। সঙ্গে সাদা আলুর তরকারি।

আহ্! গন্ধেই জিভে জল এসে গেল যেন! সারা দিনের উপোসের পর হঠাৎ কেমন চনমন করে ওঠে মন। একটুও দেরি হয় না এই ছোট কাজটায় হাত লাগাতে কারও।

খাবারটা পেয়ে খুবই তৃপ্তি করে খেতে থাকেন মহীতোষ। খিদের সঙ্গে আপোস করার অভ্যেস নেই তাঁর। কিন্তু আজ সবই অন্যরকম। খিদে তেষ্টা ভুলে যাওয়ার মতো অবস্থা। খেতে খেতেই আলোচনাটা করতে থাকেন আবার। পেটে রসদ পড়ে মাথাটা খুলে যাচ্ছে আরও—।

দত্তভিলা-নাটকের শেষ দৃশ্যটা চোখের সামনেই যেন দেখছেন তিনি। এই সেই খুনি। …'দেবতার গ্রাস' কবিতার মৈত্র মহাশয়ের মতো ডিটেকটিভ চ্যাটার্জি আঙুল তুলে দেখাচ্ছেন, এই সে-ই…

ঘরের টেলিফোনটা বেজে উঠল। তার মধ্যেও যেন শব্দটা শোনা যাচ্ছে, এই… এই…। এই সেই…

রাতুল চটপট উঠে গিয়ে লাইনটা ধরল। সুখেন্দুবাবু ফোন করছেন।

তার গলা চিনতে পেরে বললেন, রাতুল?

—হ্যাঁ, সুখেন্দুদা, কী খবর আপনার?

—খুবই দুঃসংবাদ! ভূপাল সরকার ইজ ডেড!

—গড! কখন মারা গেলেন?

—এই তোমরা যাওয়ার একটু পরেই। কর্তাবাবুর চোখের সামনেই শেষ নিশ্বাস ফেললেন। পুয়োর সোল! পারলেন না আর ধকলটা সামলে উঠতে।

—অ্যাবসার্ড। সেটা বোধ হয় আর সম্ভব ছিল না সুখেন্দুদা। যা দেখে এসেছি—

—মিঃ চ্যাটার্জি কোথায়?

—আছেন, আপনি ধরুন, আমি দিচ্ছি—।

সুখেন্দু লাইনটা ধরে থাকেন।

রাতুল কিছু বলার আগেই দেবদত্ত উঠল। মাথা নাড়াতে নাড়াতে বলল, এ তো প্রায় জানা কথা। একটু আগে বা পরে—

মহীতোষ বললেন, ইস্! সকালেই দেখে এলাম লোকটাকে। এর মধ্যেই সব শেষ!

—পড়ে পড়ে কষ্ট পাওয়ার চেয়ে এই ভাল, মহীতোষ। বরং তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করুন এখন।

সঙ্গে সঙ্গে তার হাত দুটো কপালে ঠেকালেন মহীতোষ। বোধ হয় পরলোকগত সরকারমশাইকে সম্মান জানালেন।

রিসিভার তুলল দেবদত্ত, হেলো, মিঃ বোস।

—শুনেছেন তো সব ?

—হ্যাঁ শুনলাম। খুবই দুঃখের ব্যাপার। নিজেকেই যেন অপরাধী মনে হচ্ছে। লোকটা হঠাৎ এভাবে খুনির শিকার হয়ে যাওয়ায়—

—না না, সে কী! আপনি তো আপনার যথাসাধ্য করছেন। আর বুঝবেনই বা কী করে এটা, আগে ?

—তাহলেও সুখেন্দুবাবু। যাক, বাড়ির কর্তাদের সব খবর কী ?

—বড়কর্তা একেবারেই ভেঙে পড়েছেন। খুব একচোট কান্নাকাটি করলেন হাসপাতালের মধ্যেই। খবর পেয়ে ক্ষিতি পুরো ওরাও সব চলে এল। আস্তে আস্তে সামলায় শেষে বাবাকে।

—ও। তা তো হবেই। এতদিনের একটা সম্পর্ক। তা এখন মোটামুটি স্বাভাবিক তো ?

—দারুণ টেনস্ হয়ে আছেন। সবারই এক অবস্থা। একদিকে শোক, একদিকে ভয়। কাঁটার মতো বিঁধছে মনে, এবার কার পালা, কার ? ইন ফ্যাক্ট আমারও সেই এক কথা! আপনি তো সবই জানেন—

—আই সি।

—কর্তামশাই তখনই খবরটা দিতে বলেছিলেন আপনাকে। কিন্তু আপনি ছিলেন না। আসছেন, একবার ?

—কাল সন্ধেবেলায় যাব। এবং সঙ্গে সরকারবাবুর খুনিকে নিয়েই।

—সে কী, ধরা পড়েছে খুনি ? কে, কোথায় ধরলেন তাকে ?

সুখেন্দুর গলা সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত হয়ে ওঠে যেন। কাঁপছেন বুঝি থরথর করে।

—না, মিঃ বোস। এখন নয়। অনেক কথা বলার আছে আমার। কিন্তু ভীষণ—ভীষণ টায়ার্ড আমি এখন। সব কাল সন্ধেবেলায়।

—রিয়েলি! সুখেন্দু থমকে গেলেন হঠাৎ। পরে বললেন, আর বুধু পাগলার হত্যাকারী ? তার কোনও হদিশ মিলল ?

—ইয়েস। কাল তাও জানতে পারবেন।

সুখেন্দু চুপ।

—হ্যাঁ, একটা কাজ করবেন আপনি কাইন্ডলি ?

—বলুন।

—কর্তাদের কাল সবাইকে হাজির থাকতে বলবেন বৈঠকখানা ঘরে—ঠিক ছটার সময়। কথাগুলো সেখানেই হবে! দু-একজন বাইরের অতিথিও সঙ্গে থাকতে পারেন আমাদের। আশা করি, আপনি নিজেও উপস্থিত থাকবেন মিঃ বোস।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। কিন্তু দত্তভিলার আশেপাশে পুলিশের লোক এখনও ঘুরছে ···এটা কেন, যা হবার তা তো হয়েই গেছে···

—সিকিউরিটির ব্যবস্থা আর কি। সব ঠিক হয়ে যাবে। ও নিয়ে কিছু ভাববেন না।

—কী জানি। সবই এখন একটা ধাঁধার মতো লাগছে আমার।

—কাল সমাধান হয়ে যাবে। আজ রাখছি। আয়াম ডগ টায়ার্ড, মিঃ বোস।

ফোন ছেড়ে দিল দেবদত্ত। তারপর চুপচাপ চোখ বন্ধ করে বসে থাকে কিছুক্ষণ।

পরদিন বিকেল। কাঁটায় কাঁটায় ছটা বাজে। সবাই তাকিয়ে দেখল ঘড়িটার দিকে। একটু ফাস্ট আছে কি?

বৈঠকখানার ঘরে গম্ভীর মুখে বসে আছেন সবাই। পন্নগভূষণ, পরিক্ষিৎ, পুরন্দর—সবাই খুব উদ্বিগ্ন। সুখেন্দুও আছেন এদিকে। মৃদু গলায় কথা বলে চলেছেন ডাক্তার ব্যানার্জির সঙ্গে। ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান ডাক্তার বিজয় ব্যানার্জি।

মেয়েদেরও ইচ্ছে ছিল এখানে আসার। কিন্তু কর্তামশাই চান না। সুবর্ণময়ী হয়তো আসতে পারতেন। কিন্তু মন ভাল নেই তাঁর। শোকের ধাক্কাটা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেন নি।

ভুলতে পারছেন না, এই রকম একটা ব্যাপারে সবার আগে যে এগিয়ে আসত, মাথা পেতে দিত; যাকে ছাড়া কোনও কিছুই চলত না দত্তবাড়ির, সেই লোকটি আজ আর নেই! মনটা সত্যিই ভার হয়ে আছে তার জন্যে।

ঘরের মধ্যে একা বসেছিলেন চুপচাপ। এবার পল্লবীও শুকনো মুখে গুটি গুটি তাঁর পাশে এসে বসল।

এদিকে নীচে সিংহাসন আর শ্রীমন্ত সমানে ছুটোছুটি করছে। সঙ্গে রামদয়ালও আছে। বাবুদের কখন কী মর্জি হয়! চা-পান-তামাক-জলখাবার। তদারকি করতে হয়। বাড়তি একগাদা চেয়ারও পাততে হল ঘরের মধ্যে।

পিছনের জানলাটা খোলা। ষণ্ডা নকুল উঁকিঝুঁকি মারছে। চোখে পড়তেই ক্ষিতিবাবু বন্ধ করে দিলেন সেটা।

বৈঠকখানার ঘড়িতে ছটা বেজে পাঁচ। বিকেল ফুরিয়ে সন্ধে নেমে আসছে। সবাই উন্মুখ হয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে। তবে কি অন্যরকম কিছু ঘটে গেল?

তখনই গাড়ির শব্দ দরজার বাইরে। ওই এলেন তাহলে! টান টান উত্তেজনায় নিস্তব্ধ ঘরটা।

সুখেন্দু ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে গেলেন। সামনেই দেবদত্ত আর রাতুল। হাসিমুখে নামছে গাড়ি থেকে। সঙ্গে আর কেউ নেই। রাতুলের কাঁধে একটা কিট্‌স ব্যাগ।

একবার দেখে নিয়ে হাত বাড়ালেন সুখেন্দু, আসুন মিঃ চ্যাটার্জি—আসুন। সবাই অপেক্ষা করে আছেন আপনাদের জন্য।

—ধন্যবাদ। আশা করি, খুব দেরি হয়নি আমাদের। পথে একটা ছোট কাজ সেরে আসতে হল…

—না, না, দেরি কোথায়? কিন্তু আর লোকজন আপনার?

—আসবে। ঠিক সময়েই এসে পড়বে।

নকুলবাবু তখনও মুখ বাড়াবার চেষ্টা করে যাচ্ছেন দরজার পাশ থেকে। খুবই কৌতূহল যেন।

দেবদত্ত বলল, বাইরে কেন নকুলবাবু? আপনিও আসুন—!

—আজ্ঞে…আমি আবার…নাকি মেয়েলি গলায় আমতা আমতা করতে থাকেন ভদ্র-লোক।

পন্নগবাবু বলে উঠলেন, এর মধ্যে আবার বাইরের উটকো লোক ঢোকানো কেন, মিঃ চ্যাটার্জি। যা বলার আমাদের বলুন।

—মিঃ দত্ত, এটা আর আপনাদের ঘরের ব্যাপার নয়, এখন। বহু লোক জড়িয়ে গেছে এর সঙ্গে। জানাজানি হতেও কিছু বাকি নেই। কতকাল আর বন্ধ ঘরে বসে থাকবেন, ঘরের দরজাটা একটু আলগা করুন এবার …

কর্তাবাবুর মুখটা গোঁজ হয়ে যায়।

—তাছাড়া, নকুলবাবু তো নিকট প্রতিবেশী। আপনার, বুধু পাগলার, সন্দেহও করেছি আমরা ওঁকে অনেকবার। পাগলার সঙ্গে ওঁর একটা সম্পর্কও ছিল, যদিও সেটা অহি-নকুল সম্পর্ক। থাকুন না, ভদ্রলোক। ক্ষতি কি—

বলতে বলতে মৃদু হাসল দেবদত্ত।

তারপর ক্ষিতিবাবুর দিকে ফিরে বলল, পিছনের জানলাটা খুলেই দিন না, প্লিজ। আজ একটু খোলামেলা হয়েই কথা বলি আমরা। মেয়েরা সবাই উপস্থিত থাকলেও ভাল হত। কিন্তু আপনাদের হয়তো মত নেই, এনিওয়ে…

পুরোবাবু যেন আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না, কিন্তু আপনার আসামি কই মিঃ চ্যাটার্জি?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আসল ব্যাপারটার কী হল? কর্তাবাবু যেন লুফে নিলেন কথাটা, খালি ব্যাজর ব্যাজর করে বকে চলেছেন, সে কই, যাকে হাজির করবেন বলেছেন…

—সব হবে, মিঃ দত্ত, ব্যস্ত হবেন না। একটা কথা কিন্তু আপনারা সবাই গোপন করেছেন। এবং সরকারমশাইকেও বাধ্য করেছিলেন গোপন করতে।

—এসব আবার কী কথা বলছেন? কর্তামশাই বিরক্ত হয়ে তাকালেন।

—ঠিকই বুঝতে পারছেন আপনি। কথাটা বলতে দিলে কিন্তু সরকারের এই অবস্থা হত না আজ। সুতরাং তাঁর খুনের জন্যে পরোক্ষভাবে আপনিও দায়ী মিঃ দত্ত।

—শাট আপ! পন্নগভূষণ মেজাজ হারিয়ে বললেন, আপনার বিরুদ্ধে আমি মান-হানির মামলা আনতে পারি জানেন?

—অবশ্যই। দেবদত্ত হাসল শান্ত মুখে, আমার সব কথা শুনে আনবেন, যদি পারেন। মাথা নিচু করে থাকে একটু সে।

পরে সুখেন্দুর দিকে ফিরে বলল, হ্যাঁ, রাজেশকে নিয়ে আমাদের আর দুর্ভাবনার কিছু নেই, মিঃ বোস। সে এখন পুলিশ কাস্টডিতে। মথুরাবাবুকে ভয় দেখাচ্ছিল কদিন ধরে, পল্লবীর কাছে চিঠি পেঁছিতে। অন্ধ গায়কের অভিযোগ পেয়েই পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে তাকে। ছাড়া পাওয়া খুব মুশকিল এবার।

—বলেন কী! কিন্তু কদিন আগেই যে এ বাড়িতে এসে থ্রেট করে গেল সে সরকারবাবুকে।

—না। কথাটা বোধ হয়, সত্যি নয়। সরকার বা পুরোবাবু কাউকেই সে থ্রেট করতে আসেনি এখানে।

পুরোবাবু বললেন, আমি নিজের চোখে দেখলাম যে...

—আপনি বোধ হয় একটু ভুল দেখেছেন, পুরোবাবু। ওপর থেকে ভোরবেলায় আবছা অন্ধকারের মধ্যে ওটা হতেই পারে। রাজেশ আসেনি।

—তা কী করে হবে, তা হয় না,...পুরোবাবু বিড় বিড় করতে থাকেন।

—হ্যাঁ, তবে রাজেশের একটা অবদান আছে এখানে। ঠিক যে স্টাইলে সে আপনাকে মার্ডার করতে চেয়েছিল, এখানেও সেই একই ধরনে ধেয়ে এসেছিল, গাড়িটা। পার্থক্য শুধু, আপনি বেঁচে গেলেন, সরকার পারলেন না। খুনি বুঝে-সুঝেই প্ল্যানটা সাজিয়েছে, যাতে সন্দেহটা রাজেশের ঘাড়েই পড়ে, তারপর পাকা হাতে কাজটা করে বেরিয়ে গেছে—

বাইরে তখনই একটা পুলিশের গাড়ি এসে থামল। মস্ত বড় একটা ভ্যান। ভেতরে মহীতোষবাবু। সিপাই বসে আছে পাশে। পেছনের দরজাটা খুলে গেল। লোক নামল পরপর। আর তার সঙ্গে সঙ্গেই সোজা মহীতোষবাবু ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে হাতকড়া লাগানো বিদঘুটে মুশকো চেহারার দুটো লোক। চোখ দুটো যেন জ্বলেছে ভাঁটার মতো।

পুরোবাবু বিরক্তিতে লাফিয়ে উঠলেন, দিস ইজ টু মাচ! এ কী! এসব লোককে ঘরের মধ্যে ঢোকাচ্ছেন কেন?

দেবদত্ত বলল, ভয় নেই, এখনই থানার লক্ আপে পোরা হবে এদের। তার আগে দেখে নিন ভাল করে। সুখেন্দুবাবু, এই এরাই সরকারমশাইকে চাপা দিয়েছিল। পিছনে মাথাটা অবশ্য অন্য আর একজনের। সে কথায় পরে আসছি...

ক্ষিতি বললেন, পরে কেন? এখনই পরিষ্কার করে বলুন—।

—নিশ্চয়ই বলব। তার আগে পরিচয় করিয়ে দিই এই স্বনামধন্য ব্যক্তিদের।

এই ইনি হচ্ছেন শ্রীমান কালাচাঁদ ওরফে কেলু। খুন-রাহাজানি, বোমা-পিস্তল-ছুরি, সব ব্যাপারেই বিস্তর অভিজ্ঞতা…একেবারে পাকা হাত, যাকে বলে।

—আই বাঁপ্। মুখ ফসকে হঠাৎ ছেলেমানুষের মতো বলে উঠলেন নকুলবাবু।

—হ্যাঁ, আর এই বেবুনমুখো মহাশয়ের নাম মইনু ওরফে ছেনু ওরফে টোটা। কেলুর উপযুক্ত সাগরেদ। আমার পিছনেও লাগানো হয়েছিল কয়েকদিন। নিবাস পিলখানা, হাওড়া। স্টিয়ারিঙে টোটাই বসেছিল সে রাত্রে। এসব কাজের একেবারে ওস্তাদ লোক…

—কিন্তু এরা ?…একটু যেন সন্দেহ দেখান ক্ষিতিবাবু।

—হ্যাঁ। এরাই। নির্দেশমতো জলামাঠের ধারে চুপচাপ অপেক্ষা করছিল অন্ধকারে। খবর ছিল সরকার ফিরছেন উল্টোডাঙা থেকে। কেলুই চিনিয়ে দিল টার্গেট সময়মতো। আর সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের বেগে ছুটে আসে টোটা।

—কিন্তু এদের কখনও এ পাড়ায় দেখেছি বলে তো মনে হয় না। সুখেন্দু মাথা নাড়লেন।

—অসম্ভব! কখনও দেখিনি এদের। পুরোবাবুও সমর্থন করলেন।

—আমি দেখেছি। নকুলবাবু হঠাৎ আবার বলে ফেলেন।

—অ্যাই চোপ্। পন্নগবাবু ধমকে উঠলেন, আর একটি কথা বললে ঘাড় ধরে বের করে দেব—

—না মিঃ দত্ত। সবাই থাকবেন। এই ঘর এখন পুলিশের এক্তিয়ারে, চারদিক থেকেই নজর আছে। বিনা হুকুমে কেউ ঘর ছেড়ে বেরোবে না এখন।

—পুলিশের এক্তিয়ারে! হোয়াট ডু য়ু মিন ?

—উপায় নেই আমাদের। কারণ, বুধুপাগলার খুনিও যে উপস্থিত এখানে।

ঘরের মধ্যে যেন একটা বোমা ফাটল সঙ্গে সঙ্গে। চমকে গিয়ে সবাই মুখ চাওয়াচায়ি করেন, কোথায় সে ? কে সে ?

২৪

ঘরভর্তি লোকগুলো একেবারে চুপ। টুঁ শব্দটি যেন নেই মুখে। নিস্তব্ধ হতবাক। দেখছে ফ্যালফেলে দৃষ্টিতে সবাই সবার দিকে।

অপেক্ষা করছে মোক্ষম কথাটি শুনবে বলে। এখানেই নাকি সে বসে আছে। কে সে, কে ? আবার একটা কী বোমা ফাটে বুঝি। তটস্থ সবাই তার জন্যে।

ক্রুদ্ধ পন্নগবাবুর মুখে আতঙ্কের ছায়া। বিমর্ষ মলিন সুখেন্দুর মুখ। ভড়কে গিয়ে নকুল আচার্য দম বন্ধ করেই আছেন প্রায়। ফোঁস করে একটা নিশ্বাসের শব্দ। কার, ধরা গেল না।

ইতিমধ্যে মহীতোষ আসামী দুজনকে বাইরে গাড়িতে বসিয়ে আবার ফিরে এলেন। গম্ভীর মুখে এসে বসলেন দেবদত্ত আর রাতুলের মাঝখানে। তিনজনের মধ্যে মৃদু গলায় দ্রুত কী আলোচনা যেন। মহীতোষ ঘাড় নাড়লেন। রাতুলের চোখ দুটো চকচক করে উত্তেজনায়।

দেবদত্ত আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। প্রায় নায়কের মতো। বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা। সবার চোখ এখন তার দিকে। সুখেন্দুর চোখে চোখ পড়তেই সে মাথা দোলাল, হ্যাঁ, মিঃ বোস, এইবার আমাকে করতে হবে সেই অপ্রিয় কাজটা। আপনাদের মধ্যে থেকেই টেনে বের করতে হবে সেই খুনিকে। বধু পাগলাকে যে নৃশংসভাবে খুন করেছিল। সরকারমশাইকে, মারার জন্যে যে কেলু আর টোটাকে লেলিয়ে দিয়েছিল…

—ভনিতা রেখে আসল কথাটা বলুন না মশাই। ক্রুদ্ধ পন্নগবাবু বলে উঠলেন, কে সে ? কার কথা বলছেন ?

—নিশ্চয়ই মিঃ দত্ত। সেই জন্যেই তো এসেছি এখানে। কিন্তু টপ করে লোকটাকে দেখিয়ে দিলেই তো চলবে না। যুক্তি প্রমাণ চাই তার জন্যে। তবেই না হাতে-নাতে তাকে ধরা যাবে।

—বেশ তো, তাই করুন। কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি, কতক্ষণ বসে থাকব এভাবে ? তাছাড়া মন মেজাজ কারু ভাল নেই আজ—।

—জানি মিঃ দত্ত। কিন্তু তাড়াতাড়ি তো করা সম্ভব নয় কিছু। আমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে অনেক কথা। কেন কীভাবে এবং কে এই কাজটা করল ? এবং তারপর কী অদ্ভুতভাবে সবার চোখে ধুলো দিয়ে দিব্যি ভালো মানুষটি সেজে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বলতে বলতে একবার থামল দেবদত্ত। হাতঘড়িতে সময় দেখল। পরে সুখেন্দুর দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল, মিঃ বোস, আপনার নিশ্চয় মনে আছে আমার তদন্তের প্রথম ধাপটা ছিল, খুনি নয়, আগে কে খুন হয়েছে—তাকে শনাক্ত করা। তারপরে বের করা, হত্যাকারী কে ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আপনি বলেছেন কথাটা অনেকবার।

—তার জন্যেই দেরি হয়ে গেল একটু পুরো ব্যাপারটা জানতে। অবশ্য এত দেরি হবার কথা নয়। প্রথম দিনেই মিটে যেত সব। যদি দত্ত পরিবার একটু সাহায্য করতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ওঁরা তা কেউ করলেন না। লোকটাকে চিনেও বললেন, চিনি না। বেচারা সরকারবাবুর মুখটাও ভয় দেখিয়ে চাপা দিয়ে রাখলেন। কিন্তু সত্যকে কতদিন চাপা দিয়ে রাখবেন ওঁরা। তা কি যায় কখনও ?

—না না, এসব কী আজেবাজে কথা বলছেন আপনি বাড়িতে এসে ? পুরন্দর প্রতিবাদ করে উঠলেন।

—আজেবাজে কথা নয় পুরোবাবু। ডেড্‌বডিটা দেখে সেদিন ভালই চিনেছিলেন আপনারা, যে বুধুপাগলাই স্বয়ং সুধাকান্ত দত্ত। আপনাদের এই পরিবারেরই অন্যতম শরিক, পোড়ো বাড়িটার মালিক। ছেলেবেলায় নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলেন যিনি একদিন বাড়ি ছেড়ে, সেই তিনিই।

ঘরের মধ্যে যেন আর একটা বিস্ফোরণ ঘটল। চারপাশে আলোড়ন। সে কী! কথাটা কি সত্যি। পাগলা সুধাবাবু?

পন্নগবাবু গলা চড়িয়ে বলেন, রাবিশ! কিসের ভিত্তিতে আপনি এসব আজগুবি গল্প ফাঁদছেন, জানতে পারি?

—মিথ্যে লুকোবার চেষ্টা করবেন না, মিঃ দত্ত। প্রমাণ আমার সঙ্গেই আছে। পাড়ার লোক সন্দেহ করে গেল সেদিন ডেডবডিটা দেখে, আর আপনি বুঝতে পারলেন না? আশ্চর্য! দেখি রাতুল ছবিটা—

ঝোলার ভেতর থেকে একখানা বাঁধানো ফোটো বের করে দেয় রাতুল। দেবদত্ত ছবিটা দেখায় সবাইকে।

বলল, এই ইনি হচ্ছেন সুধাকান্ত দত্ত। যৌবন বয়সের এই ছবিটা ভাল করে দেখুন। পরে চেহারাটা পাল্টে গেছে অনেক।

আর একটা ছবি বার করল টেনে দেবদত্ত, আর ইনিই হলেন থিয়েটারের অভিনেত্রী আলপনা দেবী। সুধাকান্তবাবুর বিবাহিত স্ত্রী। আর এই শিশুটি দেখছেন, এ হল তাদের একমাত্র সন্তান। মেয়েটি অবশ্য এখন আর নেই। আর এই দেখুন, অন্য আর একটা ছবি—দাড়িওয়ালা পাগলা সুধাকান্ত—অনেক পাল্টে গেছেন, রংটাও জ্বলে গেছে—তবু চেষ্টা করলে চেনা যায় অবশ্যই। আর এটা হল খুন হওয়া বুধু পাগলার ছবি। আপনারা মিলিয়ে দেখুন এবার সন্দেহ হলে···

—কিন্তু সুধাকান্ত বুধু পাগলা সেজে ছিলেন কেন? তিনি তো সোজাসুজিই এসে থাকতে পারতেন এখানে। ডাক্তার ব্যানার্জি প্রশ্ন করলেন।

—ডাক্তারবাবু, সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। সবটা বলা হয়তো সম্ভব নয় আমার পক্ষে। তবু যেটুকু জানি, সংক্ষেপে বলছি। [···সবাই জানেন, দত্তভিলা ছেড়ে এক দিন নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন সুধাকান্ত। কিন্তু কেন? কারণটা আজও অজানা। আর জানাও যাবে না কোনওদিন···যাই হোক, নিরুদ্দেশ যুবক সুধাকান্তর পরবর্তী ঠিকানা হল লখনউয়ের এক নামকরা উস্তাদের বাড়ি। বরাবর গান শেখার শখ। সেখানে বেশ কিছুকাল গান-বাজনার চর্চায় মশগুল হয়ে রইলেন। পুরোপুরি খেয়ালি মনের মানুষ। স্বভাবটা হয়তো তাঁর পিতৃসূত্রেই পাওয়া। মেজাজটাও। হঠাৎই তারপর কলকাতায় ফেরা একদিন ··কিন্তু দত্তভিলায় নয়। মনে হয়তো অনেক ক্ষোভ আর অপমানের স্মৃতি জমেছিল। এবার আস্তানা হল উত্তর কলকাতায় নন্দাবাইয়ের কোঠিতে। সেখানেই গান শেখানোর ওস্তাদ হলেন তিনি। [···নন্দাবাই

নিজেও একজন শিল্পী। এই অল্পবয়েসি ভাবুক আর আত্মভোলা মানুষটিকে খুবই পছন্দ হল তাঁর। নিজের ভাইয়ের মতো স্নেহ করতেন আদর করে ডাকতেন, 'বন্ধু ভাই।'

--কিন্তু তিনি পাগল হলেন কী করে ?

—সেও এক অদ্ভুত কাহিনী। সুখেন্দুবাবু মনে আছে পাগলার, 'ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে' গান ? বারবার বলা চন্দ্রগুপ্ত নাটকের সেই সংলাপ, শুনেছ কাত্যায়ন, বলেছে আত্রেয়ী! আত্রেয়ী!

—হ্যাঁ মনে আছে। আরও অনেক কথা মনে পড়ছে আমার!

—এর সঙ্গেই জড়িয়ে আছে পাগলার জীবনেরও এক করুণ কাহিনী। আত্রেয়ীর ভূমিকায় আলপনা নামে এক কিশোরী অভিনেত্রীকে দেখে একদিন পাগল হয়ে গিয়েছিলেন সুধাকান্ত। নাটক দেখা ভুলে শুধু তাকেই দেখছিলেন। তার রূপ! তার গানের গলা। সম্মোহিত সুধাকান্ত এরপর অনেকবার তার অভিনয় দেখেন বক্সে বসে। রাতের পর রাত। সেই থেকেই পরিচয়, প্রেম এবং আচমকা একদিন কালীঘাটে গিয়ে তাঁদের বিয়ে। পর পর নাটকের মতো ঘটে গেল···

—বলেন কী! সেই থিয়েটারের মেয়ের সঙ্গে ? ডাক্তারবাবু বললেন।

—হ্যাঁ সেই থিয়েটারের মেয়ে। খুব উঁচু পরিবার থেকে আসেনি মেয়েটা ঠিকই, কিন্তু তবু তো সম্ভ্রান্ত দত্ত পরিবারের সন্তান সুধাকান্ত দত্তর স্ত্রী। তাই স্বামীর পরিচয়েই মাথা উঁচু করে বাঁচতে চেয়েছিল। কিন্তু সে বোঝেনি বনেদি পরিবার কাকে বলে!

—কেন, কী হল তার ?

—স্বামীর ঘরে এসে সংসার পাতার স্বপ্ন দেখতে লাগল আলপনা। স্বপ্নটা সুধাকান্তই দেখিয়েছিলেন। দুজনে মিলে তারপর একদিন সন্ধেবেলায় চুপি চুপি ঢুকে পড়লেন দত্তভিলায়। বুক দুরু দুরু করে দুজনেরই। প্রণাম করে আশীর্বাদ নিতে গেলেন জোড়ে, পিতৃতুল্য জ্যাঠামশাই পন্নগভূষণের কাছে···আর তখনই নেমে এল সেই অভাবনীয় আর অমানুষিক আঘাত। আশীর্বাদের বদলে দরজা বন্ধ করে দত্তবাবুরা প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েন চারদিক থেকে। রীতিমতো মারধর অপমান আর কুৎসিত সব ইঙ্গিত। তার মধ্যেই প্রচণ্ড জোরে হাণ্টারেরও বাড়ি পড়ল সুধাবাবুর মাথায়। মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন সুধাকান্ত···কাঁদতে কাঁদতে আহত স্বামীকে নিয়ে সেই মুহূর্তেই আলপনাকে ছেড়ে যেতে হল দত্তভিলা। সেই প্রথম আর সেই শেষ···

—কী সর্বনাশ। আহা রে···! নকুলবাবু বলে উঠলেন হঠাৎ বেখেয়ালে।

কর্তা পন্নগভূষণের মুখটা ঝুলে পড়েছে। তবুও বলে উঠলেন মাথা ঝাড়া দিয়ে, কক্ষনো না······কক্ষনো না······। আপনি জানলেন কী করে এসব ? আপনি কি উপস্থিত ছিলেন সেখানে ?

—আমাকে জানতে হয়েছে মিঃ দত্ত। আলপনা দেবীর মুখেই পুরোটা শোনা আমার।

—বাহ্! সেই নষ্ট চরিত্রের একটি মেয়ের মুখে শুনেই আপনার সব বিশ্বাস হয়ে গেল। বলিহারি আপনার তদন্ত! পুরন্দর বিদ্রূপ করলেন মুখ বিকৃত করে।

—আজ্ঞে বিশ্বাসটা আরও দৃঢ় হল সরকারবাবুর মুখেও হুবহু এক বর্ণনা শুনে।

—সরকার?

—ইয়েস মিঃ দত্ত। আপনাদের বিশ্বস্ত লেট ভূপাল সরকার।…হ্যাঁ, তারপর যা বলছিলাম ডাক্তারবাবু, সুধাকান্তর মাথায় সেই হান্টারের বাড়িই কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ উঠল। সেই চোট আর সহজে রেহাই দিল না। বরাবরের ভাবুক আর খেয়ালি মানুষ। তারপর থেকে আরও বিগড়ে গেলেন যেন!

—চিকিৎসা হয়নি কোনও?

—হয়েছিল বলেই শুনেছি। কিন্তু পুরো স্বাভাবিক আর হতে পারেননি। হওয়া সম্ভবও ছিল না। তারপর থেকে একটার পর একটা আঘাত জীবনে। প্রথমে চলে গেলেন আলপনা। তাঁর সাধের আত্রেয়ী। সব সম্পর্ক ছেদ করেই ছেড়ে গেলেন তিনি। তারপর গেল তাঁর একমাত্র মেয়েটি। মাত্র কয়েকদিনের জ্বরেই সব শেষ। আর সহ্য করতে পারছিলেন না সুধাকান্ত। পাগল হওয়া ছাড়া যেন আর উপায় ছিল না। মাথাটা আরও বিগড়োল তারপর থেকে। নিজের মনেই বিড়বিড় করেন সারাদিন…

—তার মানে, মানসিক ভারসাম্যটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

—ঠিক বলেছেন। কিন্তু সেটা সেরেও যেতে পারত হয়তো। কিন্তু হতভাগ্য সুধাকান্তর মুখে এবার বিষের গ্রাস ধরা হল—

—সে কী! সেটা আবার কে করল?

—ওই বাইজি কোঠিরই এক বাসিন্দা। রমা কয়াল নামে একটি মেয়ে। তার জনৈক রাঙাবাবুর প্ররোচনায় সরবতে বিষ মিশিয়ে খাইয়েছিল সে। সেই কিন্তু প্রথম সরাসরি খুনের চেষ্টা সুধাকান্তকে।

—আশ্চর্য। আপনি জানলেন কী করে এসব?

—অনেকদিনের চেষ্টায়, ডাক্তারবাবু। তবে এবারও বেঁচে গেলেন সুধাকান্ত। যমের মুখ থেকেই ফিরে এলেন। ধীরে ধীরে সুস্থও হয়ে উঠলেন তাঁর নন্দাদির সেবায়, যত্নে। কিন্তু মাথার দোষটা গেল না। বাড়ল বরং একটু। স্বাভাবিকও হয়ে যেতেন কখনও কখনও। বুদ্ধি বিবেচনারও পরিচয় দিতেন। তারপর আবার যে কে সেই বুদ্ধু পাগলা। বিড় বিড় করে বকতেন নিজের মনে, গান গেয়ে উঠতেন, কখনও নাটকের সংলাপ…বিশেষ করে সন্ধেবেলায়, একা বসে থাকলে…

—পাগলাও তাই করত এখানে, রোজ…কথাটা বলতে গিয়েও নকুলবাবু চুপ হয়ে গেলেন।

—হ্যাঁ ঠিক তাই। সুখেন্দুবাবু, আপনিও অনেকবার শুনেছেন তাঁর অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কথা। কী যেন ভর করত মানুষটাকে তখন। সেই অবস্থায়ই হাজির হতেন তাঁদের পোড়ো বাড়িতে।

—গা ছম ছম করে এখনও সেই কথাগুলো ভাবলে আমার ঃ পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ? সুখেন্দু বললেন, কিন্তু তিনি এখানে আসতেন কেন রোজ?

—হয়তো তাঁর হারানো দিনগুলোর খোঁজে। উদভ্রান্তের মতোই এসে ঢুকে পড়তেন এই হানাবাড়িতে··তাঁর ছেলেবেলার ঘরে। অন্ধকারে একা একা সেই ভাঙাচোরা আবর্জনার মধ্যে···মাথার ওপর ফরফর করে উড়ছে ঘরের দখলদার, বাদুড় আর চামচিকের দল। বাগানে দমকা ঝোড়ো হাওয়ার শব্দ, ঝিমঝিম বৃষ্টি। তার মধ্যে রাতভর নিজেকে খুঁজে বেড়ায় পাগল। কোথায় গেল সব। তার আত্রেয়ী। সেই ছোট্ট এক বছরের ফুটফুটে মেয়েটি তাদের। তার মা, বাবা···কেউ নেই। [···কখনও বা থিয়েটারের স্টেজ চোখের সামনে। হঠাৎ, ভেসে উঠত গানে অভিনয়ে জমজমাট একটা নাটকের দৃশ্য। পাগলাও যোগ দিত সেই অভিনয়ে, গান গেয়ে উঠত গলা ছেড়ে মধ্যরাতে]···কখনও বা হঠাৎ লাবির গান ওধার থেকে। তার ছেলেবেলার আদরের লাবি। হঠাৎই চুপ হয়ে যেত পাগলা। দুটো কথা বলতে ইচ্ছে যেত লাবির সঙ্গে। ডাকলেই সঙ্গে সঙ্গে সে এই একজনকে সাড়া দিত। আর ছিল জুঁই। লাবির কি কখনও সন্দেহ হয়নি মনে? হয়তো হয়েছে···কিন্তু বলতে পারেনি কাউকে···

সারারাত এইভাবে প্রায় যুদ্ধ করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়ত পাগল। ভোরের দিকে আবার যেন স্বাভাবিক মানুষ। বাগানে উড়ে আসা বসন্তের প্রথম পাখির দিকে চেয়ে বসে থাকে। ভাবে কী নিজের মনে। তারপর আবার ঝোলাটা কাঁধে ফেলে নন্দাদির কাছে ফিরে যায়।

—কী অদ্ভুত ব্যাপার! এটা কি আপনার কল্পনা, মিঃ চ্যাটার্জি?

—বলতেও পারেন। কিন্তু ঘটনাটা সত্যিই অদ্ভুত। নন্দা বাইয়ের মনে হচ্ছিল এতে করেই যেন একটু একটু করে ভাল হয়ে উঠছে তাঁর বন্ধুভাই। সারাদিন বেশ ভাল হয়ে থাকে। গান করে নিজের মনে। কিন্তু সন্ধ্যে হলেই যেন অন্য মানুষ। নেশার মতো টানে হানা বাড়িটা! আর কোনও দিকে হুঁশ নেই বুধুর। কারা যেন সব অপেক্ষা করে আছে সেখানে তার জন্যে। সে গেলেই পর্দাটা উঠবে মঞ্চের। আলো জ্বলবে, কনসার্ট বাজবে···নাটক শুরু হয়ে যাবে রোজকার মতো···বিহ্বল হয়ে ছুটে যায় পাগল···

—তিনি হ্যালুসিনেশান দেখছিলেন বলছেন?

—হতে পারে। ব্যাখ্যাটা জানা নেই আমার। তবে যেটা জানি, সে হল সন্ধে হলেই সুধাকান্ত অন্যরকম হয়ে যেতেন। প্রচণ্ড টান অনুভব করতেন এখানে ছুটে আসার। সেটাই শেষ পর্যন্ত কাল হল তাঁর।

—কেন, কীভাবে ?

—সেই চন্দ্রগুপ্ত নাটকের মধ্যেই একদিন হঠাৎ আবির্ভূত হল তাঁর অদৃশ্য ঘাতক। পাগলা তখন গলা ছেড়ে গাইছে, ঐ মহাসিন্ধুর ওপর থেকে কী সঙ্গীত ভেসে আসে···বাইরে তখন তুমুল বৃষ্টি, ঝড়, বজ্রপাত, তার মধ্যেই হঠাৎ দৈত্যের মতো সেই ঘাতক দুহাতে তার গলা টিপে ধরে মোটা কর্ড বেঁধে ফাঁস লাগিয়ে দেয়··· [তুমুল ধস্তাধস্তি দুজনের, নখ বিঁধিয়ে বুকের মাংস খুবলে নেয় পাগলা আততায়ীর তবু রেহাই পায় না। শক্ত দড়িটা লোহার মতো চেপে বসেছে গলায়···মঞ্চের সব আলো নিবে গেল যেন। ঠেলে বেরিয়ে আসা চোখের সামনে শুধু একটা কালো ···যবনিকা নেমে এল ধীরে ধীরে···।] খুনি আর দেরি করে না। চটপট ফাঁস লাগানো শরীরটা টেনে নিয়ে ঝুলিয়ে দিল কড়িকাঠে। কৃষ্ণচূড়ার ডালেই প্রথম চেষ্টা করেছিল, কিন্তু মড়মড় করে ভেঙে পড়ল সেটা। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার দৃশ্যটা সাজানো হল, খুব নিখুঁত ভাবে। তারপরই সে ঝড়ের মধ্যে বেরিয়ে গেল। ট্যাক্সিটা স্টার্ট নিয়েই দাঁড়িয়েছিল রাস্তায় তার জন্যে···

—খুনি, ট্যাক্সি করে এসেছিল ? ডাক্তারবাবু বললেন।

—হ্যাঁ। সন্ধে থেকেই প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি দেখে সে, প্ল্যানটা সেভাবেই সাজিয়েছিল। রাস্তাঘাটও সব ফাঁকা তখন। ভেবেছিল খুব সহজেই গা ঢাকা দিয়ে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু হল না···একজন ঠিক দেখে ফেলল।

—কে সে ? সুখেন্দু চমকে বললেন।

—আর কে ! সেই সরকারমশাই। এ বাড়ির কোনও ব্যাপারই অজানা ছিল না যাঁর। অন্ধকার আর অঝোর বৃষ্টির মধ্যেও দেখলেন, লোকটা বুধুর ঝোলাটা কাঁধে ফেলে দ্রুত ট্যাক্সিতে উঠে ঝড়ের বেগে অদৃশ্য হয়ে গেল। দেখলেন এবং চিনে ফেললেন। কিন্তু কথাটা পরদিন কিছুতেই স্বীকার করলেন না ভদ্রলোক। করলে, হয়তো এ ভাবে অপঘাতে প্রাণটা হারাতে হত না···পুয়োর সেল !

হঠাৎ দুদ্দাড় করে কে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে ওপর থেকে। রামদয়াল ! ঘরে ঢুকে পুরোবাবুকে বলল, হুজুর টেলিফোন। এক ভদ্র মহিলা আছেন। বহত জরুরি বাত আপনার সঙ্গে। বলছেন এক মিনিট···।

—তাই ? পুরোবাবু বললেন, এক্সকিউজ মি, মিঃ চ্যাটার্জি, একবার শুনে আসি কথাটা।

—নো, সরি পুরন্দরবাবু ! এই ঘর ছেড়ে তো এখন বেরোতে দিতে পারব না।

—সে কী ? হোয়াই নট ? হাও ডেয়ার ইউ, গলা চড়ালেন পুরোশবাবু, দেখছেন জরুরি একটা টেলিফোন···

—খুব জরুরি নয় টেলিফোনটা। আমার কাছে শুনুন, নিশ্চয়ই রমা কয়াল ফোন করছে পুলিশ কাস্টডি থেকে। কী বলবে তাও জানি···

—এর মানে কী? কী বলতে চান আপনি?

—আর কিছু নয়। এই মুহূর্তেই আপনাকে সুধাকান্ত দত্তর খুনের অভিযোগে গ্রেফতার করতে চাই আমরা। য়ু আর আণ্ডার অ্যারেস্টে, পুরোবাবু। দেবদত্ত গলা চড়াল এবার।

—ইম্‌পসিবল! আপনি তা পারেন না। কক্ষনো না—সঙ্গে সঙ্গেই লাফিয়ে ঘর থেকে বেরোতে গেলেন পুরোবাবু।

কিন্তু পারলেন না। তার আগেই রাতুল আর মহীতোষ দুদিক থেকে জাপটে ধরেছে তাঁকে। সামনেও একজন বন্দুকধারী পুলিশ। বাধ্য হয়েই হার মানতে হয়। অন্য আর একজন পুলিশ মহীতোষের ইঙ্গিতে সহজেই হাতকড়া পরিয়ে দিল এবার।

ঘরের মধ্যে সহসা বাজ পড়ল যেন একটা! ষণ্ডাবাবু হাঁ। চোখ দুটো ফেটে পড়ছে উত্তেজনায়। ডাক্তারবাবুও চুপচাপ। ক্ষিতিবাবু ফ্যাল ফ্যাল করে দেখছেন। মুখটা নিচু করে আছেন সুখেন্দু! কেউ কোনও কথা বলতে পারছেন না···

তার মধ্যেই পন্নগবাবু হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, দিস ইজ ইম্‌পসিব্‌ল্‌! শেষে পুরোকে খুনি সাব্যস্ত করলেন? কী প্রমাণ আছে, আপনার হাতে? আমি মানহানির মামলা আনব আপনার নামে···

—এক্‌স্‌ট্রিমলি সরি মিঃ দত্ত। আমার নিজেরও খুব খারাপ লাগছে ব্যাপারটায়। মানী লোকের মান নষ্ট করতে এভাবে। কিন্তু কোনও উপায় নেই। আর প্রমাণ দেখতে চান? সবচেয়ে বড়টাই দেখুন তাহলে; রাতুল—

কী ইঙ্গিত করল সেন দেবদত্ত। সঙ্গে সঙ্গেই রাতুল হাতবাঁধা পুরোবাবুর জামা গেঞ্জি গুটিয়ে তুলে ধরল। বাধা দিতে একবার চেষ্টা করেন পুরন্দর। ক্রুদ্ধ জ্বলন্ত চোখে ধাক্কা দিতে চান রাতুলকে। পারেন না। সবার সামনেই খুলে দেওয়া হয় তাঁর বুক। কর্তা পাথর হয়ে দেখতে থাকেন।

চওড়া বলিষ্ঠ লোমশ বুকের পাটা। নিয়মিত শরীরচর্চা করে তৈরি গড়ন। চোখে পড়ে বাঁ দিকের ওপরে শুকিয়ে যাওয়া ঘায়ের দাগ একটা। দুপাশে ছিট ছিট সাদা আঁচড়। মধ্যিখানে দড়া পাকিয়ে ফুলে আছে শুকনো চামড়াটা···

দেবদত্ত টর্চ ফেলল। জোরালো আলোয় আরও স্পষ্ট করে দেখতে থাকে দাগটা। মাথাটা নেড়ে বলে, ইয়েস দেয়ার ইট ইজ—ডাক্তারবাবু, আপনিও দেখুন ভাল করে। ভেবেছিলাম হয়তো অনেকটাই মিলিয়ে যাবে। কিন্তু না, এখনও যায়নি—

সুখেন্দুর দিকে তাকিয়ে বলল, পাগলা নিজের হাতেই খুনির বুকে তার এই শেষ চিহ্নটা বসিয়ে দিয়ে গেছে। আমাদের আর কিছুই করার নেই। এই মাংস,

রক্ত আর লোমের ফোরেনসিক রিপোর্টও জমা হয়ে আছে পুলিশের দফতরে। আর একে কী করে গোপন করবেন, দত্তবাবু? না, কোনও উপায় নেই।

—ওহ্ গড! সুখেন্দু নিশ্বাস ছেড়ে বললেন।

—আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে মিঃ বোস, খুনের পর দিন সকালে পুরোবাবু গরমের মধ্যেও একটা চাদর জড়িয়ে ছিলেন। উদভ্রান্ত চেহারায় মাথা গুঁজে বসেছিলেন চুপচাপ। অথচ পাগলার জন্যেও কোনও মাথাব্যথা ছিল না। শরীর খারাপ বলে উঠতেই চাইলেন না জায়গা ছেড়ে। মনে আছে?

সুখেন্দু চুপ হয়ে থাকেন।

—তারপর একদিন পরে যখন জেরা করতে এসেছিলাম, তখনও পুরোবাবুর জ্বর, শরীর খারাপ। বললেন, ইনফ্লুয়েঞ্জা-মতো হয়েছে। গরমের মধ্যেও ঠিক চাদরটা জড়ানো ছিল। পাগলার নখের মধ্যে রক্ত মাংসের দলা দেখে একটা সন্দেহ তখন ভীষণভাবে ঘুরছে আমার মাথায়…কিন্তু ঠিক শিওর হতে পারছি না। অথচ…খটকাটা থেকেই গিয়েছিল মাথায়। পরে আস্তে আস্তে আরও অনেকগুলো সম্ভাবনা মিলে যেতে লাগল…

—কিন্তু একটা কথা মিঃ চ্যাটার্জি, পুরো, হঠাৎ পাগলাকে খুন করতে যাবে কেন? কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে? সুখেন্দু বললেন।

—ইয়েস মিঃ বোস, থ্যাঙ্ক য়ু। কেন এই খুন? সেটাই সবচেয়ে বড় পয়েণ্ট। অর্থাৎ মোটিভটা কী? এবার সে কথায় আসছি আমি। […সুখেন্দু উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে থাকেন।]

২৫

অঘটনই বলতে হবে। তাছাড়া আর কী। শেষে দত্তভিলায় এই রকম একটা কাণ্ড। এতদিনের মান, মর্যাদায়, বংশ-গৌরবে বিখ্যাত পরিবারের ভিতরে এমন বিশ্রী ব্যাপার!

কেউ কল্পনা করতে পারে না যেন। ডাক্তার ব্যানার্জির চোখ দুটো প্রায় কপালে উঠে গেছে। থমথমে এক আতঙ্ক নকুলবাবুর মুখে। সুখেন্দু অতীব বিমর্ষ।

সবাই তাকিয়ে আছেন দেবদত্তের দিকে। আসল কারণটা জানতে চান। কেন, এই বীভৎস আর বেপরোয়া কাজ পুরোবাবুর। কী চেয়েছিলেন তিনি?

কিন্তু দেবদত্ত একটু সময় নেয়। কিট্সব্যাগটা টেনে সামনে রাখল পায়ের কাছে। চুপি চুপি কী বলল যেন মহীতোষকে। তাতেই আরও বেড়ে যায় টেনশানটা সবার। আবার কী!

ঘরের এদিকে কর্তা পন্নগভূষণ ঝিম ধরে আছেন। মাথা তুলে কোনওদিকে

তাকাতেও পারছেন না। মুখটা দেখলে দুঃখ হয়। সেখানে রাগ, দুঃখ না অনুশোচনা, কী হচ্ছে কিছুই বোঝা যায় না।

ক্ষিতিবাবুর ভরাট মুখটাও বড় ফ্যাকাশে দেখায়। মাথা নাড়তে নাড়তে গভীর নিশ্বাস ফেললেন। হঠাৎ মুখ তুলে একবার তাকালেন পিছনের খোলা জানলাটার দিকে।

একটু আগেও আলো ঝলমল করছিল ওপর তলার ওদিকটা। এখন অন্ধকার। সব কেমন নিস্তব্ধ। • ক্ষীণ একটা কান্নার শব্দ ভেসে আসছে যেন। খবরটা কি তাহলে ওপরেও পৌঁছে গেছে এর মধ্যে? নিশ্বাস ফেলে আবার মাথা নাড়লেন ক্ষিতিবাবু।

দেবদত্ত উঠে দাঁড়াল হঠাৎ।

সুখেন্দুর দিকে তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ, মিঃ বোস, খুনের মোটিভটা। শুনলেই বুঝবেন, কেন বারবার এত চেষ্টা হয়েছে সুধাকান্তকে শেষ করে দেবার। তবে পন্নগবাবু নিজে কখনও এটা ভাবেননি। পরিক্ষৎবাবুও না। সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। অন্য আর সব ব্যাপারে জড়িয়ে থাকলেও, খুনের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই কারও। এ বিষয়ে এঁরা দুজনেই নির্দোষ।

ক্ষিতিবাবু মাথা নাড়লেন, না মিঃ চ্যাটার্জি, দোষ আমাদেরও আছে। সুধাকে চিনেও, সত্যি কথাটা বলতে পারিনি সেদিন। উই ফিল রিয়েলি সরি ফর দ্যাট।

—হ্যাঁ, বললে হয়তো কাজটা সহজ হত। কিন্তু গোপন করে আরও একটা বড় চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিলেন। অ্যান্ড উই অ্যাকসেপটেড্ দ্যাট। জানবেন, রহস্য যেখানে যত বেশি জটিল, সেখানে কাজের মধ্যেও তত বেশি থ্রিল আর অ্যাডভেঞ্চার। আমার যে সহকারী তরুণ বন্ধুটিকে দেখছেন, রাতুল সেন। সে কিন্তু এই কাজগুলো পেলেই তেতে ওঠে বেশি। যাকে বলে জেদ চেপে যায় আর কি—।

রাতুলের মুখে লাজুক হাসি ফোটে এক টুকরো। মাথাটা নামিয়ে নিল সে।

—কিন্তু আপনার নিজের কি কোনও সন্দেহ হয়েছিল, ডেডবডিটা দেখে।

—না সুখেন্দুবাবু। এ পাড়ার রঞ্জনবাবু, 'আমাদের সুধা নয় তো?' মন্তব্যটা শুনেই প্রথম খটকা লাগে আমার। কিন্তু পরে তিনিও পিছিয়ে গেলেন। বললেন, 'না না হয়তো ঠিক বুঝতে পারছি না আমি। আপনারা বরং ন-দিদাকে আনবার ব্যবস্থা করুন।' আনানো হল তাঁকে। কিন্তু ভদ্রমহিলা হতাশ করলেন। তাঁর চোখে গোটা পৃথিবীটাই বদলে গেছে এখন। সবই ঝাপসা দেখেন। নিশ্চিন্ত হওয়া গেল না—

—তারপরই কাগজপত্র ঘেঁটে কি আলপনাদেবীর ঠিকানা পেলেন?

—একজ্যাক্টলি! রাতুলেরই আবিষ্কার এটা। তবে আপনিও আমাদের কাছে একটা সত্য গোপন করে গেছেন সুখেন্দুবাবু।

—আমি? কী বলছেন!

—হ্যাঁ আপনিই।

—পোড়ো বাড়ির বাগানের মধ্যে সেদিন রাত্তিরে কুয়াশার ভিতর ঝাপসা যে লোকটা মিলিয়ে গেল, মনে আছে? আপনার চোখের সামনেই মিলিয়ে গিয়েছিল, মুখ ঢাকা, মাথায় হ্যাট···ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলেন যাকে দেখে···

—খুব মনে আছে। সেটা কি ভুলে যাবার?

—তাকে দেখে আপনার মনেও একটা সন্দেহ উঁকি দিয়েছিল। কিন্তু বলতে পারেননি আমাকে। খামোকা রাজেশ ঠাকুরের দলের মধ্যে সেই চেহারাটা খোঁজার চেষ্টা করেছেন···

—না না, বিলিভ মি, সত্যি আমি বুঝতে পারিনি কিছু স্পষ্ট করে।

—ইয়েস আই নো। কিন্তু সন্দেহ একটা এসেছিল আপনার। পিছন থেকে আদলটার সঙ্গে যেন পুরোবাবুরই মিল···মনে হয়নি?

বলতে বলতে সামনের ব্যাগ থেকে একটা টুপি বের করে, দেবদত্ত বলল, এই টুপিটা। মাথায় ছিল সেই ছায়ামূর্তির! দেখুন ভাল করে। আর এই হল স্কার্ফটা। কান গলা, মুখ সব ঢাকা দেবার জন্যে যেটা ব্যবহার করা হয়েছিল। রমা কয়ালের ঘরে এরকম আরও অনেক জিনিস পাওয়া গেছে পুরোবাবুর। সেটাই ছিল তাঁর গোপন ডেরা।

—ইজ ইট? কিন্তু আমি এত সব কী করে জানব, বলুন?

—ঠিকই। আসলে আপনি রাজেশকে নিয়ে এত বিব্রত তখন, পল্লবীকে নিয়ে এত দুশ্চিন্তা আর ভয় মনে, যে আর কোনও দিকে নজর দিতে পারছেন না। বুঝি খুবই স্বাভাবিক সেটা। তার মধ্যে সন্দেহটা একবার উঁকি দিলেও, আপনি চেপে গেছেন। কিন্তু পাগলা যখন খুন হয়ে গেল? তখন মিঃ বোস। নিশ্চয় কথাটা মনে এসেছিল আপনার? অথচ আপনি কিছুই বলেননি।

—মানে, আমি ঠিক···। একটু যেন আমতা আমতা করেন সুখেন্দু।

—আই নো, খুবই স্বাভাবিক। দত্ত পরিবারের বন্ধু আপনি! কী-ই বা করবেন! না পারছেন আমাকে নিরস্ত করতে, না পারছেন আপনার সন্দেহের কথাটা খুলে বলতে। কী জটিল পরিস্থিতি!

—না না, মিঃ চ্যাটার্জি, আমার সে সব মনে হয়নি। আসলে রাজেশকে নিয়েই ভয় ছিল বেশি। তাছাড়া সবকিছুই এক ধোঁয়াটে রহস্যের মতো মনে হচ্ছিল যেন····

—নাহ্! আপনাকে দোষ দিতে পারি না। গোড়া থেকে আপনিই সব সময় আন্তরিকভাবে সাহায্য করে গেছেন আমাদের। বুধুপাগলার জন্যে পল্লবীর সঙ্গে সঙ্গে আপনারও একটা টান তৈরি হয়ে গিয়েছিল মনে।

—এসব কি সুধাবাবুর খুনের আগের ঘটনা ? ডাক্তার ব্যানার্জি বললেন।

—হ্যাঁ, বেশ অনেকদিন আগের। পোড়ো বাড়ির জঙ্গলে তখন অনেক সন্দেহ-জনক চরিত্রকে ঘুর ঘুর করতে দেখা গেছে।

—সে কী! তারা আবার কারা ?

—অনেকজনই ছিলেন। যেমন, এক সরকারমশাই, দুই নকুলবাবু। তিন কালাচাঁদ ওরফে কেলু ; আর স্বয়ং পুরোবাবু তো আছেনই…

—না স্যার, আমি না। একদিন খালি গিয়েছিলাম…। ভয় পাওয়া গলায় বলে ওঠেন নকুলবাবু।

—একদিন না, দুদিন গিয়েছিলেন।

—কিন্তু পাগলাকে পাইনি স্যার।

—জানি। যথার্থই অহি-নকুল বন্ধুতা ছিল আপনাদের, পেলে যে কী করতেন কে জানে। হাতে কাটারিও ছিল। বউ-পাগল লোক একবার খেপে উঠলে, প্রলয়কান্ড করতে পারে! কী বলেন ?

নকুলবাবুর মুখে আর কথা নেই।

—তবে আপনার স্ত্রী কিন্তু অনেক ডাকাবুকো আর সাহসী আপনার চেয়ে। সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে মুখোমুখি পাগলার সঙ্গে একমাত্র ছুটকিদেবীই কথা বলেছেন এ বাড়িতে। খুব অদ্ভুত লেগেছিল নাকি তাঁর লোকটাকে দেখে। চোখে পড়ার মতোই চেহারা…

এলোমেলো ঝাঁকড়া চুল, রুক্ষ তামাটে…গোঁফদাড়ির জঙ্গলে ঢাকা বড় একটা মুখ …লাল বড় বড় চোখে যেন এক ভাবুক দৃষ্টি…দেখছেন গাছের ডালে পাখি বসল কোথায়, সোনা বউ পাখি! ডাক শুনছেন তার উদাসীন হয়ে…অথচ মুখে যেন কী এক চাপা যন্ত্রণার ভাব…না, দীর্ঘদেহী বলিষ্ঠ চেহারার মানুষটাকে দেখলে পাগল বলে মনেই হয় না…

শুনতে শুনতে তখনই মনে নতুন করে খটকা লাগল আমার। দেন, হু ইজ দিস ম্যান ? বুধু পাগলা তাহলে কে ?

—সেটা তো আমরা জানলাম। কিন্তু খুনের আসল কারণটা ?

—ইয়েস। তারও একটা পুরনো ইতিহাস আছে মিঃ বোস। কর্তা পন্নগভূষণই দায়ী যার জন্যে অনেকটা। বালক পুরন্দরকে দত্তক নিতে তিনিই একসময় রাজি করিয়েছিলেন ভাই শৈলভূষণকে। বুদ্ধিটা তাঁরই। দিনক্ষণও সব ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখনই হঠাৎ অবোধ সুধাকান্তের আসার সময় হয়ে গেল এই পৃথিবীতে। ভেস্তে গেল সব পরিকল্পনা পন্নগবাবুর। এমন একটা বড় প্রাপ্তিযোগ যেন মুখের ওপর থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল কেউ। তাও এক ফোঁটা এক দুধের বাচ্চা! সহ্য করতে পারেন না কিছুতেই।

পন্নগবাবু মুখ তুলে একবার কটমট দৃষ্টিতে তাকালেন দেবদত্তর দিকে।

দেবদত্ত বলতে থাকে, সেই থেকেই শুরু একটা চাপা বিদ্বেষ আর আক্রোশ সুধাবাবুর ওপর। কালক্রমে যেটা পুরন্দরের মধ্যেও বাসা বাঁধল। তাঁরও মনে হতে থাকে, এই ছেলেটাই তাঁর হকের ধন কেড়ে নিল এসে। কত সব গয়না, গিনি, টাকাকড়ি···জড়োয়ার মুকুট···ধানের জমি, মাছের ভেড়ি, পাথুরেঘাটার দোতলা বাড়িটা···সব হিসেব করলে মাথাটা গোলমাল হয়ে যায়। ছেলেটাকে তাই চক্ষুশূল মনে হয় যেন। শেষ করে দিতে ইচ্ছে করে।

বন্দি পুরন্দর একবার হতাশ দৃষ্টিতে তাকালেন চোখ তুলে। কিছু বলার থাকলেও আর বলতে পারেন না এখন।

—তারপর অকালেই মা এবং বাবাকে হারালেন সুধাকান্ত। পরে আর থাকা সম্ভব হল না তাঁর এ বাড়িতে। হয়তো চাপও আসছিল নানারকম। যাতে বাধ্য হন তিনি। শেষে অভিমান করেই একদিন কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন! আর কোনও খোঁজ নেই। ব্যাস! আনন্দে ডগমগ পুরোবাবু তখনই দখল করে নিতে চাইলেন তাঁর হকের সম্পত্তি। কিন্তু বাদ সাধলেন কর্তাবাবু। সরকারও বোঝালেন অনেক করে, এখন নয়। আরও কয়েকটা বছর দেখতে হবে অন্তত। [রফা হল, সুধা না ফিরলে, বা মৃত্যু হলে, আইন মোতাবেক এ সবই হবে যথারীতি পুরন্দর দত্তর সম্পত্তি।]

—সে কী! সম্পত্তির জন্যে এই কাণ্ড! পুরোর তো নিজের ব্যবসা আছে বিরাট। ভালই চলছে···।

—না মিঃ বোস। মোটেই ভাল নয়। চারদিকে দেনায় ডুবে আছেন পুরন্দর। লাখখানেক তো আপনার কাছেই ধার। এ ছাড়াও বাজারে আরও আছে। সরকার-খবরটা রাখতেন। কিন্তু তা বলে ফুর্তিটুর্তির কোনও কমতি হয়নি কখনও সেটা ঠিকই চলছে যেমন চলত···

—আই সি! সুখেন্দু বিড়বিড় করেন নিজের মনে।

—ভাবলেন, এ থেকে বাঁচার একমাত্র পথ সুধাকান্তর সম্পত্তিটা নিজের করে নেওয়া। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। মনে মনে এরকম যখন চিন্তা করছেন পুরোবাবু ঠিক তখনই একদিন নিরুদ্দেশ সুধাকান্ত একেবারে বউ নিয়ে হাজির দত্তভিলায়। বিনা মেঘেই বাজ পড়ল যেন। ভাবা যায় এমন ঘটনা! পুরোবাবুর চোখ দুটো জ্বলে উঠল। সুধার মাথা ফাটিয়ে সমস্যাটা তখনই মিটিয়ে ফেলতে চাইলেন আর কি···

—আঁই বাপ্। নকুলবাবুর মুখ থেকে যথারীতি এক অদ্ভুত শব্দ।

ঘৃণার দৃষ্টিতে একবার কটমট করে তাকান কর্তাবাবু। কিন্তু সবই নিষ্ফল!

—পুরন্দর অবশ্য হাল ছাড়লেন না। অনেক পাত্তা লাগিয়ে শেষে আবার নন্দাবাইয়ের বাড়িতে সুধাবাবুর খোঁজ পেলেন। সেখানেই রমা কয়ালের সঙ্গে যোগাযোগ। গোপন চুক্তি হয়ে গেল দুজনের মধ্যে। হোলির দিনে বিষ-সরবতের

গ্যাস ধরাতে হবে সুধাবাবুকে। বদলে সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ে একটা আলাদা ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা রমা কয়ালের জন্যে। নিয়মিত মাসোহারা এবং আরও কিছু ছোট বড় টোপ। কিন্তু আপনারা জানেন তাতেও কোনও কাজ হল না। শেষ পর্যন্ত বেঁচেই গেলেন সুধাকান্ত। আর পুরোবাবু প্রায় ক্ষিপ্ত তখন···যে করে হোক সরিয়ে দিতেই হবে ওকে এই পৃথিবী থেকে···

—ওহ্, কী সাংঘাতিক! ডাক্তারবাবু মন্তব্য করে ওঠেন।

—হ্যাঁ। এদিকে পাগলা ততদিনে প্রায় নিয়মিত হানা দিতে শুরু করেছে তার বাড়িতে। রাত্তির হলেই চলছে তার গান, নাটক। সকাল হলেই সব ফাঁকা। আর কেউ নেই।

পুরোবাবু কিন্তু ঠিক চিনে ফেললেন। মাথাটা পাগলার যেন আগের চেয়ে ভাল হয়ে আসছে আরও। খুবই ভয়ের ব্যাপার। ঠিক করলেন, যা করার এখানেই করে ফেলতে হবে এবার। এবং খুব তাড়াতাড়ি। দেরি করলেই বিপদ।

···আর বিপদ তো কখনও একা আসে না। অন্যদিকে রমা কয়াল তো একটা রাঘব বোয়াল হয়ে উঠছে দিনে দিনে। তার জন্যে জেরবার হয়ে চলেছেন পুরোবাবু। নিত্যি নতুন বায়না তার। কোথায় পাবেন খাঁই মেটানোর অত টাকা···আপনার কাছেই হাত পাতলেন পর পর দুবার···

সুখেন্দু মাথা নাড়লেন, সরি, জানলে কখনওই টাকা দিতাম না আমি। সাবধান করে দিতাম পুরোকে—

—নাহ্। আর বোধ হয় ফেরার পথ ছিল না। নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে পড়েছেন পুরন্দর। আজ ট্যাক্সি কিনে দিচ্ছেন, কাল জিপ, চাকর-বাকর, ড্রাইভার, রেস···আবদারের আর শেষ নেই। টাকা চাই আরও টাকা···কিন্তু সুধাকান্ত জীবিত থাকতে মোটা টাকার তবিলটাও পাওয়ার পথ বন্ধ। মরিয়া হয়ে তখন পথের কাঁটা সরাতে কেলুকেই লাগালেন। নকুলবাবু, আপনিই তাকে দেখেছিলেন একদিন রাত্তিরে, মনে আছে? নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে গাছের সঙ্গে মিশে অন্ধকারে?

—হ্যাঁ, এখনও গাঁয়ে কাঁটা দেয় আমার, স্যার—।

—কিন্তু কেলুও পারল না কাজটা সারতে। বাধ্য হয়ে পুরোবাবুই এবার আসরে নামলেন। মাথা খাটিয়ে প্ল্যান সাজালেন। গলা টিপে খুন করে আত্মহত্যার মতো সাজিয়ে দিতে হবে কেসটা! যাতে কেউ কোনও সন্দেহ না করে। পুলিশ এলেও একটা অচেনা পাগলকে নিয়ে কে-ই বা মাথা ঘামাতে যাবে।

···সব ঠিকঠাক করে সুযোগ খুঁজতে লাগলেন উপযুক্ত। প্রথমে চেষ্টা করলেন ছাতের কৃষ্ণচূড়ার ডালটা ধরেই একটা পথ করতে। গভীর রাতে পায়চারি করতে করতে কয়েকদিন ধরে রিহার্সালও চলল। না, সুবিধা হল না ঠিক। মনে আছে মিঃ বোস, ছাদের ওপর ছড়ানো সেই কৃষ্ণচূড়ার ডালগুলোর কথা?

—ও ইয়েস! খুবই অদ্ভুত লেগেছিল ঘটনাটা।

—হ্যাঁ, তারপরই ঘটে গেল আসল কাণ্ডটা। সন্ধে থেকেই তুমুল ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে সেদিন…ঘন ঘন মেঘের ডাক, বাজ পড়ছে…থামার কোনও লক্ষণ নেই। রমা কয়ালের বাড়িতে আসর বসিয়েছেন পুরন্দর। বাইরের আকাশের চেহারাটা দেখে মনে করলেন, এই বোধ হয় সেই উপযুক্ত মুহূর্ত কাজের। আর দেরি নয়। প্ল্যানটা তো ছকাই ছিল মনে। ঝটপট কেলুকে সঙ্গে নিয়ে সোজা ট্যাক্সি চেপে এসে থামলেন সেই দুর্যোগের মধ্যে। একটু দূরেই দাঁড়িয়ে রইল গাড়িটা। ফাঁকা রাস্তা, ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি…নির্ভুলভাবে কাজটা সারা হতে থাকে তার মধ্যে এদিকে…দু হাতে গলা টিপে, ফাঁস আটকে রীতিমতো মল্লযুদ্ধ করতে হয় পুরন্দরকে…

পাগলার শরীরেও যেন অসুরের শক্তি…দিল তাঁর বুকে নখ বিঁধিয়ে; খামচে তুলেই নিল এক খাবলা মাংস…। তবুও হাল ছাড়েন না পুরোবাবু। ঠাণ্ডা মাথায় কাজটা শেষ করে টানতে টানতে ঠিক ঝুলিয়ে দিয়ে গেলেন শরীরটা…

—ওহ্ গড! কী নৃশংশ কাণ্ড! একটি পাগল লোককে…

—হ্যাঁ, সব নাটক শেষ হয়ে গেল পাগলার! শেষ হল পুরোবাবুর বহুদিনের জমানো রাগ, আক্রোশ…আর বিদ্বেষ।

ঝুলি থেকে একটা দড়ি বের করল দেবদত্ত এই দেখুন, ডেডবডি ঝোলানোর সেই দড়িটা। প্রয়োজনের তুলনায় একটু ছোট। আসলে এটা একটা স্কিপিং রোপ ছাড়া আর কিছুই নয়। পুরোবাবুর জিমন্যাসিয়ামে গেলে এরকম আরও অনেক দড়ি দেখবেন আপনারা। রমা কয়ালের ঘরেও ছিল। আর এবার দেখুন, সেই পোশাক গুলো, খুনি অ্যাকশানে নেমেছিল যেগুলো পরে…

কিট্‌স ব্যাগ থেকে বের করে পরপর সাজাতে থাকে রাতুল, একজোড়া গামবুট, কালো রেইনকোট, টুপি, হলুদ গ্লাভস, নীল রঙের স্কার্ফ…বুক ফালা ফালা করে ছেঁড়া, চেক শার্ট একটা…

ক্ষিতিবাবু আর পারলেন না। দেখতে দেখতে ভাঙা গলায় বলে উঠলেন, থাক থাক, মিঃ চ্যাটার্জি। প্লিজ, আর দেখতে চাই না—আর পারছি না আমি—

চোখে জল এসে গেছে ভদ্রলোকের। মাথা নিচু করে লাল চোখ দুটো মুছলেন।

বাড়ির ভেতর থেকেও চাপা কান্নার শব্দ। আরও স্পষ্ট এবার। দরজার বাইরে ভিড় বাড়ছে ক্রমশ। পুলিশ একজনকেও আসতে দিচ্ছে না। তাদের কোলাহল। কর্তামশাই মুখ নামিয়ে পাথর হয়ে বসে আছেন।

দেবদত্ত একটু থামল। পরে সান্ত্বনা দেবার মতো করে বলল, যা ঘটে গেছে তা তো আর ফেরাবার কোনও পথ নেই, ক্ষিতিবাবু। আমি শুধু দায়িত্বটা পালন করে যাচ্ছি আমার…

—আই নো, আই নো। য়ু হ্যাভ ডান ইয়োর জব পারফেক্টলি ওয়েল।

—থ্যাঙ্ক য়ু। একটা কথা বলি আপনাকে। এই খুনের কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী

কেউ নেই। সবই সারকামস্টানশিয়াল এভিডেন্স। কোর্টে এই পয়েন্টে ঠিকমতো লড়তে পারলে, সাজাটা হয়তো কিছু কম হতেও পারে পুরোবাবুর।

—তা কী আর সম্ভব এখন? আপনি যে ছবির মতো সব সাজিয়ে দিয়ে গেলেন পুলিশের সামনে।

—শক্ত, কিন্তু একেবারেই সম্ভব নয়। সুখেন্দুবাবু আছেন, অভিজ্ঞ লোক। ভাল উকিল-ব্যারিস্টারদের পরামর্শ নিন। চেষ্টা করতে ক্ষতি কী?

—চেষ্টা নিশ্চয়ই করব। যখন বলছেন।

—আর একটা কথা ক্ষিতিবাবু, দেবদত্ত একটু ইতস্তত করে যেন।

—বলুন?

—আলপনা দেবীকে তাঁর স্বামীর সম্পত্তির একটা অংশ অন্তত ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন। সুধাবাবুর আত্মা হয়তো কিছুটা শান্তি পাবে তাহলে! তাঁর সাধের আত্রেয়ীকে তো তিনি কোনওদিন ভুলতে পারেননি! শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মুখে লেগে ছিল নামটা···

—ও শিয়োর! মাথা নাড়লেন ক্ষিতি, কিন্তু কোথায় খোঁজ পাব আমি এখন তাঁর?

—বললে, খোঁজ আমিই দেব! তিনি এখন বিখ্যাত চিত্রাভিনেত্রী নীলা দেবী।

—নীলা দেবী! সে কী, আমি তো ছবি দেখেছি তাঁর।

—হ্যাঁ তিনিই। আজকে এখানে আসার জন্যে আমি তাঁকেও অনুরোধ জানিয়েছিলাম। কিন্তু এলেন না। হয়তো সম্পত্তির অংশ নিতেও রাজি হবেন না। প্রচণ্ড ঘৃণা আর অভিমান জমে আছে তাঁর এই দত্তভিলার পরে। তবু মনে হয়, স্বামীর স্মৃতি হিসেবে কোনও উপহার পেলে যদি গ্রহণ করতে রাজি হন। হতেও পারেন হয়তো।

—আমি নিশ্চয় যাব, মিঃ চ্যাটার্জি। আপনি নিয়ে চলুন আমাকে।

—বেশ, তাই হবে। দেবদত্ত আবার থামল। সুখেন্দুর দিকে দেখল একটুক্ষণ।

পরে আস্তে আস্তে বলল, পরিক্ষিৎবাবু, আর একটা সাজেশান আছে আমার। যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে বলি—।

—মনে করার মতো মুখ কি আর আছে আমাদের, মিঃ চ্যাটার্জি? আপনি স্বচ্ছন্দেই বলতে পারেন, যা বলার।

—বলছিলাম সুখেন্দুবাবুর কথা।

—সুখেন্দুদা! হ্যাঁ বলুন।

—আপনাদের প্রিয় পারিবারিক বন্ধুটিকে এবার নিজের আত্মীয় বানিয়ে নিন না।

—মানে ? আপনি কী মিন করছেন, ঠিক…

—আই মিন একজ্যাক্টলি, হোয়াট আই সে। যেটা নিয়ে একটা অদ্ভুত টেনশান আর অশান্তি আপনাদের সবার মধ্যে। এইটেই তার সবচেয়ে ভাল সমাধান। এ ছাড়া আর কোনও রাস্তা নেই এখন। ঠাণ্ডা মাথায় কথাটা ভেবে দেখবেন একবার।

কর্তা পন্নগভূষণ হঠাৎ চমকে মুখটা তুললেন এবার। ঝাপসা চোখের দৃষ্টিটা যেন অন্যরকম হয়ে আসে আস্তে আস্তে। শান্ত আর বিমর্ষ।

ক্ষিতিও তাকিয়ে আছেন বড় বড় চোখে অবাক হয়ে। কপালে ভাঁজ। কী বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না।

পরে বিড়বিড় করেন নিজের মনে, আপনি বলছেন…

—হোয়াই নট— ? দিস ইজ দ্য ওনলি সলিউশান নাউ। দুজনেই এতে সুখী হবেন ওঁরা। পল্লবী এবং সুখেন্দু দুজনেই—।

ক্ষিতি মাথা নামালেন।

ওপর থেকে সুবর্ণময়ীর কান্নার শব্দটা আরও তীব্র এবার। সঙ্গে পল্লবীও কাঁদছে। অঝোরে কেঁদে চলেছে। একবারও থামছে না।

কেন যে এই মুহূর্তে এমন গভীর হয়ে হু হু করে বেরিয়ে আসতে চায় তার সব কান্না! পল্লবী জানে না সে কথা।

বাইরে তখন প্রথম বর্ষার বৃষ্টি নামল কলকাতায়। ঝিরঝির শব্দ তার একটানা।

———